প্রকাশক

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫এ রামকৃষ্ণ বাগচী লেন,

কলিকাতা।

মুদ্রাকর

শ্রীহরিচরণ মান্না

কাত্তিক প্রেস

২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সোদরপ্রতিম

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

সুহৃদ্‌বরেষু

এই গল্পের প্লটের মূল ধারাটি পরম পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্নেহের দান। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১৫ আশ্বিন ১৩২৫ চারু।

হেরফের

এক

সেদিন কলেজে একজন প্রফেসার আসেন নাই। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা সেইজন্ত ছুটি পাইয়া ছোট ছোট মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়া গল্প করিতে করিতে একটু বেশী রকম মাতিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ তাদের উল্লাস দমন করিয়া সেই ক্লাসে অপর একজন অধ্যাপক উপস্থিত হইলেন। তাঁকে দেখিয়াই গোলমাল হঠাৎ থামিয়া গেল। তিনি এই ঘণ্টায় পড়াইবেন মনে করিয়া সকল ছাত্র যে-যার জায়গায় উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতে লাগিল। কিন্তু প্রফেসারটি দরজার কাছে দাঁড়াইয়াই শুধু বলিলেন—Gentlemen, less noise please, we cannot proceed with our work in the next room.

প্রফেসারটি চলিয়া যাইতেই ঘরে আবার একটি গুঞ্জনরোল উঠিল; কিন্তু আগের সে জমাট ভাব আর রহিল না।

সবচেয়ে ভিড় হইয়াছিল যে জায়গাটিতে, তার কেন্দ্র হইয়াছিল যে ছেলেটি তার নাম রজত। সে যে বেশ ধনশালী লোকের ছেলে তা তার বেশভূষার পরিপাট্য দেখিলেই বুঝা যায়। তার গায়ে নীল ছিটের জামা সত্ত ধোপার পাট ভাঙা, জামার হাতায় কফ ও বুকের পটি মোম দিয়া মাজা শক্ত চক্‌চকে, তাতে হীরে বসানো সোনার বোতাম; তার সিল্কের রুমাল এসেন্সের গন্ধে ভুরভুর; গলায় জরিপাড়ের উড়ানি চুনটকরা পাকানো; রূপোর বক্‌লস-দেওয়া দামী জুতো; হাতে হীরের আংটি; মাথায় টেড়ির পরিপাটী; তার রং খুব ফর্সা না হইলেও মাজাঘষায় প্রসাধনে বেশ উজ্জ্বল; তার রূপোর খাপে পেন্সিল আর সোনা-বাঁধানো ফাউণ্টেন পেন; তার বই খাতাগুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সেগুলি সে বেঞ্চির উপর পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া রাখে, একটু নড়িয়া সরিয়া গেলে সে অমনি তাহা সাজাইয়া ঠিক সমান করিয়া দ্যায়। তার সমস্ত চালচলন এমন ফিটফাট যে সে তার ক্লাসের ছেলেদের কাছে "বাবু" খেতাব পাইয়া সেই নামেই পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। অনেকে তার নাম জানিত না, কিন্তু বাবু বলিলেই তাকে চিনিত।

প্যারিভ। সে প্রত্যহ এমনই বেশভূষা করিয়া আসিত যেন নূতন জামাই শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। কিন্তু রজত শুধু তার বাবুয়ানার জন্য তার সহপাঠীদের কাছে পরিচিত ছিল না; তার আমুদে অমায়িক স্বভাব, সরস বচনবিন্যাস, আর ব্যবহারে ধনশালিতার গর্ব্বলেশশূন্যতা এবং লেখাপড়াতেও কৃতিত্ব ও বুদ্ধির পরিচয় তাকে সতীর্থমহলে প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। রজতের আর-একটি গুণ ছিল যাতে সে তার সহপাঠীদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আকর্ষণ করিত।—সে কবিতা ও গল্প লিখিতে অভ্যাস করিয়াছিল নেহাৎ মন্দ না; সে প্রায় প্রতিদিনই কোনো অধ্যাপকের বা ছাত্রের মুদ্রাদোষ বা অম্‌নি কোনো ব্যক্তিগত অভ্যাস বা ত্রুটি উপলক্ষ করিয়া ব্যঙ্গ-কবিতা বা গল্প রচনা করিয়া আনিয়া ক্লাশে মুগ্ধ শ্রোতাদের শুনাইত; সে সতীর্থদের অনুরোধে তাদের ভাইএর বোনের বন্ধুর বিয়ের প্রীতি-উপহারের কবিতা চটপট লিখিয়া দিত, সহপাঠীদের বিবাহে তারই রচনার মুন্সিয়ানা ও ছাপা-কাগজের বাহার সকলের বাহবা পাইত। তার পর যখন তার রচনা প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র সংগ্রহ প্রতিমাসে নিয়মিত ছাপিতে আরম্ভ করিল তখন ত রজত সকলের সম্ভ্রমের পাত্র হইয়া উঠিল।

প্রফেসারের আবির্ভাবে জমাট গল্প ভেঙিয়া যাওয়াতে রজতের অন্যদিকে মন দিবার অবসর হইল। সে দেখিল

ঘরের এক কোণে পিছনের বেঞ্চিতে মাথা গুঁজিয়া একজন কে দিব্য নিদ্রা উপভোগ করিতেছে। তাকে আরামে ঘুমাইতে দেখিয়া রজত হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—ওটা কে হে, দিব্যি ঘুম মারছে?

তার দলের চাঁই খগেন বলিয়া উঠিল—ওটা পূর্ণ।

রজত হাসিয়া বলিল—আজ কি বার? সোমবার ত? তবেই ঠিক হয়েছে, ওটা নিশ্চয় শনিবার শ্বশুরীবাড়ি গিয়েছিল! কার কাছে নস্যি আছে?

বলিতে না বলিতে মজার আভাস পাইয়া নস্যের শিশি একজনের পকেট হইতে বাহির হইয়া হাতে হাতে রজতের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। রজত আস্তে আস্তে গিয়া পূর্ণর সামনে দাঁড়াইল, তার পর এক টুক্‌রা কাগজের উপর খানিকটা নস্য ঢালিয়া কাগজখানা আস্তে আস্তে ঘুমন্ত পূর্ণর নাকের ঠিক নীচে ধরিল। পূর্ণ ঘুমের আরামে যেই গভীর নিশ্বাস টানিয়াছে অমনি সেই টানে খানিকটা নস্য তার নাকের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। আর রজত তৎক্ষণাৎ ত্বরিতগতিতে সে তল্লাট ছাড়িয়া অন্যত্র দূরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া নিতান্ত ভালোমানুষের মতন অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। পূর্ণর ভরা ঘুম ভাঙিয়া ত গেলই, অধিকন্তু বেচারা হাঁচিয়া হাঁচিয়া অস্থির। তার দুর্দশা দেখিয়া সমস্ত ঘর চাপা হাসির গুঞ্জনে ভরিয়া উঠিয়া গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল।

রজত আপনার বিজয়গর্ব্বে সকলের মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছে, হঠাৎ তার নজর পড়িল ঘরের আর-এক কোণে। ক্লাশের সকল ছেলে তার এই কৌতুকে যোগ দিয়া ফুর্ত্তি করিতেছে, কেবল একজন ঐ কোণে বসিয়া নিবিষ্ট মনে খাতায় কি লিখিয়া চলিয়াছে, ঘরের এত হাসি তামাসা রঙ্গ ব্যঙ্গ কিছুতে তার মন নাই। এই ছেলেটিও রজতের মতন ক্লাশের সকল ছেলেরই চেনা।—সে খালি পায়ে স্কুলে আসে, তার ছেঁড়া কাপড়ে সেলাই ঢাকা থাকে না, জামাটাও অতি পুরাতন তালি দেওয়া, বাড়ী[illegible] দিয়া কাচা; তার পরিচ্ছদে উত্তরীয়ের বাহুল্য নাই, রৌদ্র-বর্ষায় মাথায় ছাতা নাই। তা[illegible]-বর্ষা[illegible] যৌবনের চাঞ্চল্য নাই। তার গায়ে[illegible] ফর্সা ছিল বোধ হয়, কিন্তু ক্লেশে মলিন [illegible] পড়িয়াছে। তার কৃশ চেহারাটি যেন মূ[illegible] শিশির কিন্তু তার চোখ দুটি উজ্জ্বল, [illegible]শটাকা অকুণ্ঠিত; সে কথা বলে অল্প, কিন্তু [illegible]য়ে ন্যায়, মধ্যে দীনতা নাই; তার বেশ সামান্য, [illegible]র ময়লা মধ্যে দারিদ্র্যের মলিনতা নাই—সে সেলাইকরা [illegible] জুতোয় তালি-দেওয়া জামা পরে বটে কিন্তু তাকে [illegible] বুদ্ধিটিও পরিতে একদিনও কেহ দেখে নাই। [illegible] বলিয়া চট ক্লাশে তার বড় পরিচয় সে [illegible] ও [illegible]য়া বলিয়া

এগ্‌জামিন পাশ করিয়া স্কলার্‌শিপ পাইয়াছে। তার নাম শিশির।

শিশির লোকের সঙ্গে মিশিত কম, কথা কহিত অল্প, পাছে তার দারিদ্র্যের গর্ব্ব অসম্মানে কোথাও আহত হয়। সবচেয়ে সে এড়াইয়া চলিত রজতকে—রজত যে তার একেবারে চরম রকমের উল্টা অবস্থার লোক। রজত যেমন ধনশালিতার আড়ম্বর মূর্ত্তিমান, শিশির তেমনি দারিদ্র্যের রিক্ততার প্রতিরূপ।

রজত সকল ছেলের কাছে সসম্ভ্রম প্রীতি পাইয়া ক্লাশের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল সে এই একটি ছেলেকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইহাতে রজতও শিশিরকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। যখন সমস্ত ক্লাশ রজতের কৌতুকে সাগ্রহে যোগ দিয়া তাকেই প্রধান ঘুমন্ত য়া তুলিয়াছে, তখন শিশির তাকে উপেক্ষা করিয়া আরাে করিতেছে না, ইহা রজতের সহ্য হইল না। সে খানিকটা র দিকে কটাক্ষ করিয়া ক্রূর হাস্যে তার উপাসক-রজত তা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল—দ্যাখো দ্যাখো দূরে গি য় রকম! ভাল ছেলে ফলানো হচ্ছে!

অন্যদিকে ত ছাত্রেরা রজতের ভাষা ও বলার ভঙ্গীতে গেলই, হইয়া হাসিয়া উঠিল।

দুর্দ্দশা লের হাসি দমন করিয়া কালিদাস সম্ভ্রমভরা গম্ভীর উক্তিয়া গ লিয়া উঠিল—না না, ওর বই নেই, বই কিনতে

পারে নি, তাই ও সব বই হাতে লিখে নকল করে নিচ্ছে! এখনও তাই নকল করছে!

দারিদ্র্যের এই সুকঠোর তপস্যার প্রতি কালিদাসের শ্রদ্ধা সকলকারই মন স্পর্শ করিল। রজত আশ্চর্য্য হইয়া একবার শিশিরের দিকে চাহিয়া কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিল—সব বই ও অমনি করে হাতে লিখে নেবে!

কালিদাস শুধু ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইল—হাঁ।

রজত বলিল—এস না আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে ওর বইগুলো কিনে দি।

কালিদাস বলিল—ও ভিক্ষে নেবে কেন? আমাদের মেসেই ও থাকে। আমরা ওর ঘরভাড়া নিতে চাইনি—ও যে-ঘরে থাকে সেটা স্যাঁতা অন্ধকার, রান্নাঘর আর পাইখানার মধ্যে; সেটাতে ও না থাকলে অমনি পড়েই থাকত, কিন্তু তবু ও ভাড়া দিয়েই সেই ঘরে আছে।

খগেন বড়লোকের ছেলে। সে রজত আর শিশির উভয়ের মাঝামাঝি ধরণের লোক। সে দশটাকা জোড়ার কাঁচি কাপড় পরে, আদ্দির পিরাণ গায়ে দ্যায়, মন্টিথের বাড়ীর জুতো পরে, কিন্তু কাপড় তার ময়লা চিরকুট, জামায় ঘামের দাগ ও বোট্‌কা গন্ধ, জুতোয় যতরাজ্যের ধূলো কাদা লেপটানো। তার বুদ্ধিটিও ঐরকম, আছে খুব, কিন্তু আলস্যের অবতার বলিয়া চট করিয়া খেলে না। সে কালিদাসের কথা শুনিয়া বলিয়া

উঠিল—আচ্ছা বোকা ত! বাঙালের আর কত বুদ্ধি হবে! ভাড়া যখন দ্যায় তখন একটা ভালো দরের সীট নিয়ে থাকলেই ত পারে?

কালিদাস বলিল—ভালো সীটের বেশী ভাড়া কোথা থেকে দেবে? মাত্র পনেরোটি টাকা স্কলারশিপ পায়; আর সন্ধ্যেবেলা এক ঘণ্টা একটা টুইশানি করে, তাতে পায় আট টাকা; তা থেকে মাসে মাসে দশ টাকা বনমালী দাস বলে একজনকে পাঠায়, মনিঅর্ডারের রসিদ ফিরে আসে দেখেছি; বাকী তেরোটি টাকাতে ও নিজের খরচ চালায়।

খগেন জিজ্ঞাসা করিল—ওর কি কেউ নেই নাকি?

কালিদাস বলিল—তা ত জানিনে। কিছু বলে না, কেউ কখনো ওর কাছে আসেও না, কোনো চিঠিপত্রও আসে না, কেবল মাঝে মাঝে বনমালী দাসের নাম-সই-করা মনিঅর্ডারের রসিদ আসে। শিশির ব্রাহ্মণ, সুতরাং বনমালী দাস ওর আত্মীয় যে নয় এটা ঠিক।

ক্লাশ একেবারে নিস্তব্ধ। এতক্ষণকার কৌতুক-কোলাহল একটি অনির্ব্বচনীয় দুঃখের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শিশির শুধু দরিদ্রই নয়, তার আপনার বলিতেও হয় ত কেউ নাই, সে একেবারে নির্বান্ধব নিরাত্মীয়!

সমস্ত ঘর হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল দেখিয়া শিশির

একবার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিল; সে মনে করিয়াছিল বুঝি কোনো প্রফেসার আসিয়াছেন, তাই সকলে শান্ত হইয়াছে। কিন্তু কোনো প্রফেসারকে না দেখিয়া, এবং সকলে তারই দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে দেখিয়া শিশির আবার মাথা নামাইয়া লেখায় মন দিল, পরের মনস্তত্ত্ব সন্ধান করিবার অবসর তার নাই।

রজত আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলিয়া শিশিরের দিকে চলিল। তাহা দেখিয়া কালিদাস তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া রজতের কাঁধে হাত দিয়া তাকে থামাইয়া বলিল—গ্যাখো রজত, ওর সঙ্গে চালাকি করতে পাবে না।

রজত কালিদাসের হাত সরাইয়া দিয়া বলিল—না, আমি তেমন অভদ্র নই।

রজত অগ্রসর হইয়াই চলিল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া রজতের দিকে তাকাইয়া রহিল—সে না জানি কি কাণ্ড করিয়া বসিবে।

রজত আস্তে আস্তে গিয়া শিশিরের সামনে দাঁড়াইল। শিশির খাতা হইতে মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল—আপনি কি দেখ্‌ছেন?

রজত বেঞ্চির টেবিলের এপার হইতে হাত বাড়াইয়া শিশিরের কাঁধে রাখিয়া বলিল—আমরা একসঙ্গে পড়ি, আমরা বন্ধু, আমরা কেউ আপনি নয়, মশায় নয়,

বে-আক্কেল নয়। তুমি শিশির আমার বন্ধু; আমি রজত তোমার······

রজত বলিতে বলিতে থামিয়া হাসিমুখে শিশিরের মুখের দিকে অর্থভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শিশির হাতের কলম রাখিয়া হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রজতের হীরের-আংটি-পরা কোমল হাত আপনার অস্থিসার কঠিন মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—রজত আমার বন্ধু—যদিও রজত আমার মতন গরিবের বন্ধু হয়ে বেশী দিন থাকে না।

রজত আর কথাটি না বলিয়া বেঞ্চি ঘুরিয়া গিয়া শিশিরের পাশে বসিল এবং কলমটি তুলিয়া লইয়া বলিল—তবে, সর তুমি। তুমি অনেকক্ষণ থেকে নকল করছ, এখন আমি নকল করে দেবো—আমার হাতের লেখা নেহাৎ খারাপ নয়, তোমার পড়্‌তে কষ্ট হবে না।

শিশির ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, আপনার কিছু কষ্ট কর্‌তে হবে না, আমি······

রজত হাত দিয়া শিশিরের বাধা-দিতে-প্রসারিত হাত সরাইয়া তার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—আবার আপনি! এই বুঝি তোমার বন্ধুত্ব?

শিশির কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—কেন তুমি মিছে কষ্ট করবে? আমার ত অনেক লিখ্‌তে হবে······

রজত জোর দিয়া বলিল—সেইজন্তেই ত আমরা সবাই তোমার কাজ ভাগ করে নেবো......

শিশির ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, সবাইকে নিয়ে জড়ালে......

রজত সে কথা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল—দ্যাখো ত আমার লেখা, পড়্তে পারবে বোধহয়।

শিশির বলিল—হ্যাঁ, তোমার লেখা ত চমৎকার!

রজত আর কিছু না বলিয়া লিখিয়া যাইতে লাগিল। শিশির রজতের ব্যবহারে খুসীও হইতে পারিতেছিল না, রাগও করিতে পারিতেছিল না। সে অপ্রতিভ আড়ষ্ট হইয়া তার পাশে বসিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল।

হঠাৎ কলম রাখিয়া রজত বলিয়া উঠিল—আচ্ছা বোকা ত আমি যা হোক! আমরা লিখে মর্‌ছি কেন? আমার সব বই দুসেট আছে—এক সেট আমার সরকার কিনে এনেছিল, আমি মনে করেছিলুম সে তখনো কেনেনি, আমিও একসেট কিনে এনেছিলুম। দোকানদার আর ফেরত নিলে না। সেই ফাল্‌তো এক সেট বই ত তোমার কাজে লাগ্‌তে পারে?

শিশিরের মুখ চোথ লাল হইয়া উঠিল, সে একটু রূঢ় রুক্ষ স্বরে বলিল—না, আমি তোমার বই নিতে যাব কেন?

রজত তেমনি প্রসন্ন হাসিমুখে বলিল—তোমায় নিতে ত বল্‌ছিনে। তুমি যেমন অন্যের বই চেয়ে নিয়ে নকল করে নিচ্ছ, তেম্‌নি আমার বই নিয়ে তুমি পড়্‌বে, তারপর তোমার এগ্‌জামিন হয়ে গেলে আমার বই আমায় ফিরিয়ে দেবে।

শিশির দোমনা হইয়া বলিল—না না, আমার জন্যে তোমার আর-এক সেট বই কিন্‌তে......

রজত তার কথা সমাপ্ত হইতে না দিয়াই বলিল—আবার কিন্‌তে যাব কেন? কেনা ত হয়েই আছে। তুমি ছুটির পর আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে চল; গিয়ে আমার শেল্‌ফে দুসেট বই দেখ্‌তে না পাও ত নিও না।

শিশির রজতের অমায়িক ভাব ও আগ্রহ দেখিয়া তার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল; সে আর অস্বীকার করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রজত উঠিয়া শিশিরের হাত ধরিয়া বলিল—তবে এই কথা রইল, ছুটির পর তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে যাবে।

শিশির মুগ্ধ কোমল দৃষ্টিতে স্মিত মুখে রজতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কালিদাস হেম পূর্ণ খগেন প্রভৃতি দূর হইতে রজতের বশীকরণের ক্ষমতা দেখিয়া মনে মনে তাকে

তারিফ করিতেছিল। ঐ কৃচ্ছ্রসাধনে কৃশ, দরিদ্র তপস্বীর তেজস্বী মনকে যে কোমল করিয়া বশ করিতে পারে সে বড় সহজ লোক নয়!

রজত শিশিরের নিকট হইতে প্রশংসমান বন্ধুদের কাছে ফিরিয়া না আসিয়া ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কলেজের কাছেই একটা বইএর দোকানে গিয়া রজত তাদের পড়ার বই এক সেট তাদের বাড়ীতে তখনি পাঠাইয়া দিয়া সেখান হইতে দাম আনিতে বলিল। সে দোকানদারের মুটের হাতে বাড়ীর সরকারকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিল, সে যেন দাম দিয়া বইগুলি লয় ও তার বইএর শেল্‌ফে সাজাইয়া রাখে।

রজত তেজস্বী শিশিরকে তার দান লওয়াইবার জন্য এই চুরি করিয়া যখন ক্লাশে ফিরিল; তখন ক্লাশে পরের ঘণ্টার প্রফেসার আসিয়াছেন; সুতরাং তাকে আর জিজ্ঞাসু কৌতূহলী বন্ধুদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইল না সে কেমন করিয়া কি মন্ত্রে শিশিরকে বশ করিল বা কোথায় সে গিয়াছিল।

দুই

কলেজের ছুটির পর পাছে শিশির পালায় এই ভয়ে রজত তাড়াতাড়ি গিয়া শিশিরের পাশে পাশে চলিতে লাগিল। গেটের বাহিরে গিয়া রজত তার বাড়ীর গাড়ীর দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া শিশিরকে ডাকিল—এস।

শিশির কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—আজ থাক, আর-একদিন যাব।

রজত হাসিয়া বলিল—তবে চল আমি তোমার বাসায় যাই। তা যেতে দেবে ত?

শিশির অপ্রতিভ হইয়া বলিল—তা দেবো না কেন?

রজত হাসিয়া বলিল—তবে গাড়ীতে এস, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

অগত্যা শিশির গাড়ীতে উঠিল। সে ঘোড়ার দিকের গদিতে বসিতে যাইতেছিল; রজত তার হাত ধরিয়া জোর করিয়া পিছনের দিকের গদিতে বসাইয়া নিজে তার পাশে বসিয়া বলিল—আমরা কেউ এমন মোটা নই যে দুজন একদিকে ধর্‌ব না।

শিশির হাসিয়া বলিল—তোমার পাশে আমি বসাতে হরিহর-মূর্ত্তি হল।

রজত হাসিয়া বলিল—ক্রমে আমাদের হরিহর-আত্মাও হবে।

গাড়ীর পাশ দিয়া কালিদাসকে যাইতে দেখিয়া রজত গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল—ওহে কালিদাস, তোমাদের মেসে যাচ্ছি, তুমি এই গাড়ীতেই এস।

রজত নিজে সাম্‌নের গদিতে বসিয়া কালিদাসকে শিশিরের পাশে বসাইল।

সহিস গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাঁহা যায়েগা?

রজত হুকুম দিল—চোরবাগান চলো।

চোরবাগানে একটা সরু গলির মধ্যে পুরানো একটা বাড়ীতে শিশিরদের মেস। মেসের বাড়ীতে ঢুকিয়াই রজতের নাকে কেমন একটা আঁস্‌টে ফেন-পচা গন্ধ লাগিল; নীচের তলাটা নোংরা অপরিষ্কার অন্ধকার। তখন আবার উনুনে আগুন দেওয়া হইয়াছে, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইয়া আসে। তারপর সে যখন শিশিরের ঘরে ঢুকিল তখন ত তার চক্ষুস্থির! এই ঘরে থাকিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে! এত কষ্ট করিয়াও মানুষ লেখাপড়া শেখে! স্বাস্থ্যকে নষ্ট করিয়া, দারুণ দুঃখ সহিয়া কতকগুলা পাসের ছাপ সংগ্রহ করায় লাভ কি? রজতের মন শিশিরের প্রতি অনুকম্পায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

রজত বিস্ময় ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে তার ঘরখানাকে দেখিতেছে দেখিয়া লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া শিশির বলিল —তুমি এ ঘরে বেশীক্ষণ থেকো না, কালিদাসের ঘরে গিয়ে বোসোগে।

রজত স্নিগ্ধ হাসিমুখে শিশিরের দিকে চাহিয়া বলিল— আমি ত কালিদাসের কাছে আসিনি, আমি তোমার কাছে এসেছি।

শিশির শুষ্ক স্বরে বলিল—চলো না হয় আমিও সেখানে যাচ্ছি।

রজত তেমনি স্নিগ্ধ হাসিমুখেই বলিল—তোমার এই নিভৃত কুঞ্জে কোনো অভিসারিকার শুভাগমনের কি সময় হয়েছে, যে, unwelcome intruderকে তাড়াতে পারলে বাঁচ?

শিশির এইবার হাসিয়া বলিল—এই নরককুণ্ডে কোনো অপ্সরার পদধূলি পড়্‌বার সম্ভাবনা নেই। তোমার কষ্ট হবে......

রজত তার কথায় বাধা দিয়া বলিল—তুমি কষ্ট করে দিনের পর দিন যেখানে থাকো, সেখানে আমিও খানিক-ক্ষণ থাকৃতে পারব। ওসব বাজে লৌকিকতা মৌখিক ভদ্রতা রেখে আমায় এখন কিছু খেতে দাও ত; কলেজ থেকে বাড়ী যেতে দিলে না, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

রজতের এই অসঙ্কোচ চাওয়া দেখিয়া শিশিরের মন প্রীতিতে খুসী হইয়া উঠিল। সে নিজের দীনতার লজ্জা ভুলিয়া গিয়া প্রফুল্ল মুখে উৎসাহিত স্বরে বলিল—কি খাবে বলো, বাজারের খাবার খেতে হবে কিন্তু।

রজত শিশিরের উৎসাহে খুসী হইয়া হাসিমুখে বলিল—যা হয় কিছু আন্‌তে দাও।

শিশির মেসের ঝিকে ডাকিয়া তার অতি দুঃখের ও বড় যত্নের ধন বহুমূল্যবান একটি সিকি বাহির করিয়া খাবার কিনিতে দিল। ঝি চলিয়া গেলে শিশির বলিল—তুমি ভাই একটু একলা থাকো, আমি কালিদাসের কাছ থেকে এক কাপ চা তৈরি করে নিয়ে আসি, ওসব সরঞ্জাম ত আমার নেই।

রজত বলিল—থাক্, এখন আর আমি চা খাব না।

রজত খাবার খাইতে খাইতে দেখিল শিশির শুধু এক গেলাস জল খাইল, আর কিছুই খাইল না। সে বুঝিল, এই দরিদ্রকে এই রকমে শুধু জল ঢালিয়াই ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি করিতে হয়। রজতের গলা দিয়া খাবার আর নামিতে চাহিতেছিল না; একবার তার মনে হইল শিশিরকে ডাকিয়া এই খাবার সে ভাগ করিয়া খাইবে, কিন্তু শিশির পাছে অপমান বোধ করে তাই সে তাকে ডাকিতেও পারিল না।

রজত আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া

রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—আজ তবে যাই। তোমাদের এখানকার হিঙের কচুরি ভারি খাসা হে, আমার standing নিমন্ত্রণ রইল, মাঝে মাঝে এসে খেয়ে যাব, তা বলে রাখ্‌ছি।

শিশির খুসী হইয়া বলিল—Always welcome।

রজত ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় দেখিল শিশিরের বিছানার উপর একখানা গোর্কির 'কম্‌রেড্‌স্‌' বই রহিয়াছে। বইখানা হাতে তুলিয়া লইয়া রজত বলিল—এই বইটা আমি অনেক দিন থেকে খুঁজ্‌ছি, কোনো দোকানে পাইনি। তোমার পড়া হলে আমায় একবার দিও ত।

শিশির এই ধনী বন্ধুকে তার কাছে বই চাহিতে দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল—আমার পড়া হয়ে গেছে। এস আমাদের আজকের বন্ধুত্ব স্মরণীয় কর্‌বার জন্যে এই বইখানা তোমাকে উপহার দি।

রজত বই লইয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইল।

রজত গাড়ীর পাদানে পা দিয়া ফিরিয়া শিশিরের হাত ধরিয়া বলিল—তুমিও এস।

শিশির একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—আমাকে সন্ধ্যার পর এক জায়গায় পড়াতে যেতে হয়।

রজত বলিল—সন্ধ্যা হতে এখনো ঢের দেরী। আমি গাড়ী দিয়ে তোমায় শিগ্‌গির পৌঁছে দেবো।

রজত শিশিরকে টানিয়া গাড়ীতে তুলিল। শিশির আর আপত্তি করিতে পারিল না। রজত শিশিরের কাছে চাহিয়া খাইয়া ও তার কাছে বই উপহার লইয়া শিশিরের মনের সকল কুণ্ঠা সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়াছিল।

তিন

রজতের বাড়ীতে পা দিয়াই শিশিরের দৈন্য তার নিজের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তার নিজের বলিতে কোথাও একখানা কুঁড়েঘরও নাই; ভাড়া দিয়া মেসের যে ঘরে সে থাকে তার চেয়ে গাছতলা ঢের ভালো, রজতের আস্তাবল তার তুলনায় স্বর্গ। রজতের বাড়ী এই কলিকাতার বুকের উপর এক বিঘে হাতার বাগানে ঘেরা। গাড়ী-বারান্দায় গিয়া গাড়ী থামিতেই উর্দ্দিপরা চাপরাশী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। বাহিরের সিঁড়ি হইতেই মার্ব্বেল পাথর পাতা। ঘরে ঘরে ইলেকৃট্রিক ফ্যান ও লাইট, আস্‌বাবের আতিশয্যে ঘরের স্থান সঙ্কীর্ণ। রজত শিশিরকে লইয়া নিজের পড়িবার ঘরে গিয়া চাম্‌ড়ার-গদি-মোড়া চেয়ারের উপর বসিতেই খান্‌সামা চটিজুতা আনিয়া রাখিয়া রজতের পায়ের জুতার ফিতে খুলিবার জন্য সাম্‌নে হাঁটুগাড়িয়া বসিল। রজত তাকে চোখের

ইসারায় তখনি সরাইয়া দিল বটে, কিন্তু তাহা শিশিরের দৃষ্টি এড়াইল না।

রজত নিজের হাতে জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল—দেখ শিশির, শেল্‌ফে দু-সেট বই আছে কি না।

শিশির দেখিল বাস্তবিকই সব বই দুখানা করিয়াই আছে।

রজত জুতা খুলিয়া খালি পায়ে দাঁড়াইয়া বলিল—এখানে পড়ে নষ্ট হওয়ার চেয়ে তোমার কাছে নিয়ে গিয়ে রেখো। এস ওপরে যাই।

শিশির বলিল—আবার ওপরে কেন? আমি এখন যাই।

—এখনি যাবে কি? সন্ধ্যে হলে যেয়ো। ততক্ষণ একটু গল্পস্বল্প করা যাক্‌গে।—বলিয়া রজত শিশিরের হাত ধরিয়া খালি পায়ে চলিল।

শিশির বুঝিল যে তার খালি পা বলিয়া রজত জুতা পায়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। ইহাতে সে বিরক্ত হইয়া বলিল—তুমি চটি পায়ে দাও রজত।

রজত অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বলিল—আমি বাড়ীতে প্রায় খালি পায়েই থাকি।

শিশিরের তাহা অবিশ্বাস হইল না। এমন অমল মসৃণ শ্বেতপাথরের উপর জুতা পায়ে দিয়া হাঁটাটা শুধু বেমানান নয়, ধৃষ্টতা। রজত ঠিকই করে, বাড়ীতে সে জুতা পায়ে দায় না।

রজত শিশিরকে লইয়া একেবারে অন্দরমহলে গিয়া উপস্থিত। রজত যে তাকে অন্দরমহলে লইয়া যাইবে এ আশঙ্কা শিশির করে নাই, সে সম্ভাবনাও তার মনে আসে নাই; সুতরাং সে সতর্ক হইবার বা আপত্তি করিবার সুযোগও পায় নাই। সে একটা গলির বাঁক ফিরিয়াই দেখিল একটি সৌম্যমূর্ত্তি বিধবা একখানি নীচু টুলে বসিয়া ষ্টোভে লুচি ভাজিতেছেন, আর একটি সুন্দরী তরুণী বধূ তাঁর কাছে বসিয়া মার্বেল-পাথরের চাকির উপর আবলুশ কাঠের বেলন দিয়া লুচি বেলিতেছে। তারা খালি পায়ে আসিয়াছে বলিয়া তরুণী বধূটি তাদের আসা টের পায় নাই, তাই বোধ হয় সচকিত হইয়া ঘোম্‌টায় মুখও ঢাকে নাই। শিশির দেখিল বধূর অন্তরের আনন্দ তার সুন্দর মুখে জলজল করিতেছে। শিশির থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। রজত শিশিরের হাত ধরিয়া হাসিয়া আস্তে বলিল—আমার মা আর বৌ। সুতরাং ভয় পেয়ে পালাবার কারণ নেই।

রজতের গলার আওয়াজ পাইয়া একবার চকিতে মুখ ফিরাইয়াই তরুণী বধূটি স্বামীর সঙ্গে অপরিচিত শিশিরকে দেখিয়া লজ্জাভরা হাসিমুখে জিভ কাটিয়া মাথায় অল্প ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। রজতের মা [illegible] ছেলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া মাথায় কাপড়টা [illegible] দিলেন।

রজত বলিল—মা, এ শিশির, আমার বন্ধু, আমর একসঙ্গে পড়ি।

রজতের মা সুনয়নী শিশিরের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন সে কত দরিদ্র। তার বেশ ত ভূষা নয়, তা যেন দরিদ্রের বিজয়নিশান। তিনি মমতা দ্রব হইয়া, বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত কোমল স্বরে বলিলে —এস বাবা, এস। বৌমা, শিশিরকে বসতে আসন দাও।

বধু উঠিয়া আল্‌না হইতে কার্পেটের আসন পাড়িয় বিছাইয়া দিবার আগেই শিশির রজতের মাকে প্রণ করিয়া তাঁর পায়ের কাছে মার্ব্বেলের মেঝের উপ বসিয়া পড়িয়া বলিল—এমন শ্বেতপাথরের ওপর আব আসন!

রজত হাসিয়া বলিল—কিন্তু সন্ধ্যা যে শিশিরে অভ্যর্থনার জন্যে আসন পাত্‌বার জায়গা খুঁজ্‌ছে।

সন্ধ্যার আর আসন পাতা হইল না। সে চট্ রিয়া আড়ালে সরিয়া গিয়া কমলকলির মতন ছোট্ট কল তুলিয়া রজতকে ভ্রূকুটির ধনুকে হাসিমাখা কটাক্ষ হানিয়া শাসাইল।

শিশির রজতের কথা বুঝিতে না পারিয়া চারিদিকে হিয়া দেখিতে লাগিল।

সুনয়নী হাসিয়া শিশিরকে বলিলেন—সন্ধ্যা আমার ীর নাম। রজত বৌমাকে আমার বড় জ্বালায়।

টি সুনয়নী বলিলেন—তোমার ত সে অধিক
বাবা, তুমি বৌমার ছোট দেওর, ভাইএর সমা
রজত হাসিয়া বলিল—সন্ধ্যা তোমাকে বাতাস
নে কোরো না; তুমি ওর নিত্যকার স্বামী
াগ পাচ্ছ মাত্র।
রজত মুখ ফিরাইয়া পত্নীর দিকে চাহিতেই ত
টিতে হাসিমাখা কটাক্ষবাণ তাকে শাসন ক
দ। রজত সে শাসন আনন্দে অগ্রাহ্য করিয়া আ
দন পাইবার লোভে বলিল—দেখো সন্ধ্যা, রো
মায় যেমন পাখা-পেটা কর, আজ যেন তোমার ঠাকুর
কে তারও ভাগ দিও না।
সন্ধ্যা চকিতে একবার শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া যেই
খল তিনি পিছন ফিরিয়া হেঁট হইয়া বাটিতে
সর তরকারি তুলিতেছেন, অমনি চট করিয়া রজতের
য় পাখা দিয়া ঠক ঠক করিয়া দুটো টোকা মারিয়া

রজত চেঁচাইয়া উঠিল—দেখ্ছ মা, তোমার আস্কারা
পেয়ে তোমার বৌএর কি রকম আস্পর্দ্ধা
যাচ্ছে! পাখা কর্বার ছল করেও নয়, একেবারে
ৎভাবে আমায় মার্বে বলেই মার্লে!
ায়নী মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিলেন—তুই
ার জন্তে সাধ্ছিস্, আর ও মার্লেই দোষ হল?

ছিস, খেয়েছিস ; আবার বোস্, শিশির একলা
ব ?

শিশির মিনতি করিয়া বলিল—আমি এখন কিছু
ব না মা ; আমার এখন খাওয়া অভ্যাস নয়।

সুনয়নী দুখানি থালা অর্পিনের সাম্‌নে রাখিয়া
লেন—একদিন খেলে আর তোমার তাতে অসুখ
র্‌বে না।

শিশির আবার আপত্তি জানাইয়া বলিল—এখ
খেলে রাত্তিরে আর কিছু খেতে পার্‌ব না।

রজত হাসিয়া বলিল—রাত্তিরে খাবে কি ঘোড়া
ডিম ? আমি যে ওদিকে কালিদাসকে তোমার চাল নি
বারণ করে দিয়ে এসেছি।

আর আপত্তি টিকিল না, শিশিরকে খাইতে বসিতে
হইল।

সন্ধ্যা একখানি পাখা আনিয়া শিশিরের পিছ
দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

শিশির ব্যস্ত হইয়া বলিল—আবার বাতাস কেন ?

সুনয়নী বলিল—করুক না বাবা, মেয়েমানুষের
করাই ধর্ম্ম।

শিশির গাঢ় স্বরে বলিল—সেবা করা ভালো,
কিন্তু সেবা নেওয়া ভালো নয় ; সেবা নেবার অধি
থাকা চাই।

শিশির ইহাদের তিনজনের এই স্নেহমধুর আনন্দ-বা সম্পর্ক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এমন সহজ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার সে ত জন্মে কোথাও দেখে নাই, নিজের জীবনে ত পায়ই নাই।

রজত মার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তা তুমি যাই বল মা, ওটা মুখ্খু হয়ে আছে. বলে স্বামী যে কতবড় গুরুজন তা কিছু বুঝ্তে পারছে এণ্ট্রান্স পাশ করা পর্য্যন্ত ত বিদ্যে! একে ত মেমের স্কুলে শেখা বিলিতি বিদ্যে, তাও আবার বৌ হবার আনন্দে ভুলে মেরে দিয়েছে!

সুনয়নী হাসিয়া বলিলেন—তা তুই ওকে পড়ালেই পারিস্।

রজত বলিল—আমার সময় কোথায়? ওকে পড়ানোর চেয়ে আমার দুটো কবিতা কি একটা গল্প লিখ্লে ঢের কাজ দেখ্বে।

শিশির দেখিল পুত্রের কৃতিত্বের গর্ব্বে মাতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে মানস-নয়নে দেখিল পিছনে সন্ধ্যার মুখও স্বামী-সৌভাগ্যে অমনি দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুনয়নী বলিলেন—তা একজন মাষ্টার রাখ্লেই হয়।

রজত বলিল—বাইরের লোকের চেয়ে শিশিরের দিদিকে শিশিরের হাতে সঁপে দিলে কেমন হয়?

মা ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন তার

মনে একটা কিছু মৎলব আছে, তারই সাহা
পোষকতা সে তাঁর কাছে চাহিতেছে। তিনি বলিলেন
তা হলে ত বেশ হয়।

শিশির আপত্তি তুলিয়া বলিল—বৌদিদিকে পড়াবা
জন্যে একজন সুশিক্ষিতা মেয়ে বা প্রবীণ পুরুষকে
রাখাই ভালো।

রজত হাসিয়া বলিল—তা বুঝি জানো না? সন্ধ্যা
বুড়োদের ওপর বড় রাগ। আমি আর বছর-ত্রি
পরে বুড়ো হয়ে পড়্‌ব বলে ও আমায় এখন থেকে
চক্ষে দেখ্‌তে পারে না।

সুনয়নী ও শিশির খুব হাসিতে লাগিল। স
বেচারী এবার রজতকে শাস্তি দিতে না পারিয়া মে
মনে বলিতে লাগিল—রোসো না, একবার একলা পে
হয়, যখন-তখন যার-তার সাম্‌নে আমাকে নিয়ে রঙ্গ কর
বার করে দেবো।

আহার শেষ হইলেই একজন চাকর একটা ডাব
ও জলের ঘটী সাবান তোয়ালে লইয়া রজতদের সাম্‌নে
রাখিল। শিশিরকে রজত হাত ধুইতে ইঙ্গিত করিলে
শিশির বলিল—আমি একটু ভালো করে কলে গি
আঁচাতে চাই।

সুনয়নী বলিলেন—এই যে পাশেই জলের ঘর
যাও।

শিশির উঠিয়া খালিপায়েই যাইতেছে দেখিয়া সুনয়নী বলিলেন—জুতো কোথায় রেখে এসেছ বাবা, খালি পায়ে যাচ্ছ, পা ভিজে যাবে যে।

শিশির ফিরিয়া সহজ হাসিমুখে বলিল—আমার জুতো নেই।

সুনয়নী দরিদ্রের অভাবকে অনিচ্ছাতে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—জুতো না পরাটাই আমাদের দেশের আবহমান কালের প্রথা। মেয়েরা ত জুতো পরেই না, পুরুষের মধ্যেই বা কজন পরে।

শিশির এই সুচতুরা স্নেহময়ী গৃহিণীর কথায় ও ব্যবহারে ক্রমশই অধিক মুগ্ধ ও ভক্তিমান হইয়া উঠিতেছিল। এদের তার আর একটুও পর বা অচেনা মনে হইতেছিল না। যেন সে কতকাল হইতে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; রজতের মা যেন তারও মা। সে যে-মার সন্তান হইয়া জন্মিয়াছিল, তাঁর স্নেহ সে ভালো করিয়া বুঝিবার আগে ভাগ্যচক্রে তাকে অপর বাড়ীতে অপর-লোককে মা বলিতে শিখিতে হইয়াছিল; কিন্তু সেখানে, তুলিয়া রোপা গাছের মতন, নূতন মাটির রস আকর্ষণ করিয়া তাজা হইয়া উঠিবার আগেই, পাতানো মায়ের অবহেলা তাকে মুষ্‌ড়িয়া দিয়াছিল; তারপর ত সে নিঃসম্বল নিঃসম্পর্ক একক অসহায় রিক্ত

হইয়া কঠিন নির্ম্মম সংসারের সম্মুখে ভীষ্মের যোদ্ধ্ বেশে দাঁড়াইয়াছে। আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের শরশয্যার শিয়রে এ কোন্ অর্জ্জুন কোন্ অমোঘ বাণে পাতাল-হৃদয় হইতে ভোগবতীর রসধারা উৎসারিত করিয়া তুলিয়াছে! শিশিরের স্নেহমমতাবঞ্চিত শুষ্ক কণ্ঠ ও তৃষ্ণার্ত্ত জীবন সেই উৎসের অজস্র ধারায় আজ বাঁচিয়া গেল বর্ত্তিয়া গেল! আজ সে বুঝিল সে ইচ্ছা-মৃত্যু, তার এখনো মরিবার সময় হয় নাই, সে মরিবে না।

শিশির আঁচাইয়া ফিরিতেই সন্ধ্যা একটি রূপার ডিবায় করিয়া গোলাপজলে ভিজানো কয়েকটি পান আনিয়া শিশিরের সম্মুখে ধরিল। শিশির কুণ্ঠিত হইয়া সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি ত পান খাইনে বৌদিদি।

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বলিল—আমি মস্‌লা এনে দিচ্ছি।

শিশির অবাক হইয়া গেল। এই তরুণী বধূটি পর্য্যন্ত অসঙ্কোচে তার সঙ্গে কথা বলিতেছে, তার হাতে হাতে জিনিস দিতেছে! এরা তবে ব্রাহ্ম বা খৃষ্টিয়ান নাকি? হইতে পারে; রজতের মা বিধবা হইয়াও শেমিজ জামা পরিয়া আছেন, সন্ধ্যা ত আছেই। কিন্তু তা নয় বোধ হয়, ঘরের দেয়ালে হিন্দুর দেব-দেবীর ছবি রহিয়াছে যে। এরা শিশিরেরই ধর্ম্মের ও সমাজের লোক, অথচ এরা সাধারণের চেয়ে কত সভ্য বুদ্ধিমতী ব্যবহারে সহজ!

শিশিরের চিন্তায় বাধা দিয়া সন্ধ্যা মসলা আনিয়া সামনে ধরিল। সে সন্ধ্যার হাতের উপর হইতে মসলা তুলিয়া লইতে গিয়া আনন্দিত কুণ্ঠার সঙ্গে একবার তার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, সন্ধ্যার সুন্দর হাসিমুখখানি সরলতার ও মমতার মাধুর্য্যে ঢলঢল করিতেছে।

শিশির ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় অবনত হইয়া সুনয়নীকে প্রণাম করিয়া নীরবে বিদায় চাহিল।

সুনয়নী বলিলেন—আবার এসো বাবা বল্‌তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আর ত বলার দরকার নেই। তুমি আমার ছোট ছেলে, মাকে ছেড়ে তুমিই থাক্‌তে পার্‌বে না। তা ছাড়া আবার তোমার বৌদিদি আছেন।

সুনয়নী অগ্রসর হইয়া আসিয়া শিশিরের মুখে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন। শিশিরের ধরা দেওয়া সম্পূর্ণ হইয়া গেল, আনন্দের আতিশয্যে তার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। এ যে আজ মমতার মহা-মহোৎসব! এ যে দুর্ভিক্ষের উপবাসী বুভুক্ষুকে মহাভোজে নিমন্ত্রণ! এ যে শ্মশানবাসী শিবকে অন্নপূর্ণার পরিবেষণ! এ গুরুভোজন তার প্রাছিবে ত?

শিশির বাহিরে আসিয়া রজতের হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—এখন তবে যাই ভাই।

রজত তার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে বলিল—যাই বল্‌তে নেই, আসি বল। আজ তাদের

টিউশানিতে জবাব দিয়ে এস; কাল সন্ধ্যা থেকেই তুমি সন্ধ্যার শিশির।

শিশির গম্ভীর হইয়া বলিল—ছ্যাখো রজত, ও-রকম ঠাট্টা করাও ভালো না। তুমি বৌদিদির জন্যে অন্য মাষ্টার রাখো; আমার মতন অল্প বয়সের অবিবাহিত ছোক্‌রাকে ঐ ভার দিয়ো না; তুমি আমার কি বা পরিচয়ই জানো বা পেয়েছ?

রজত হাসিমুখে বলিল—তোমার সম্বন্ধে জানি এই যে, তুমি ভদ্রলোক, শিক্ষিত; তুমি আমারই মার ছেলে, আমার [illegible] কালিদাসের কাছে শুনেছি তুমি কি-রকম পিউরিটান [illegible] লোক। আর সন্ধ্যার সম্বন্ধে জানি এই যে, সে আমার স্ত্রী, আমি তাকে ভালোবাসি, সে আমাকে ভালোবাসে; যাকে তার ভালো না লাগ্‌বে তার কাছে সে আপনাকে দান কর্‌বে না, আর কাউকে যদি তার ভালো লাগে আমি শৃঙ্খল বা তালাচাবি হয়ে তাকে বন্ধ করে রাখ্‌ব না। স্ত্রীর কাছে পুলিশের দারোগা হয়ে থাকায় তারও সুখ নেই, আমারও সুখ নেই। সুতরাং তুমিই তার শিক্ষক হবে—গুরুমশায় হয়ে নয়, তার ঠাকুরপো হয়ে। তোমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ কর্‌বার প্রয়োজন নেই; কারণ সন্ধ্যা মেয়ের স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেছে, পুরুষকে তার অত সঙ্কোচ বা ভয় নেই।

শিশির স্তম্ভিত হইয়া রজতের মুখের দিকে চাহিয়া

তার এই আশ্চর্য্যজনক কথা শুনিতেছিল। রজত হাসিয়া বলিল—রাত হয়ে যাচ্ছে, এখন গাড়ীতে ওঠ, কাল কলেজে আবার দেখা হবে। তোমার বইগুলো গাড়ীতে আছে, নামিয়ে নিতে ভুলো না।

চার

শিশির চলিয়া গেলে রজতের মা রজতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আহা শিশিরটি বড় গরিব, না?

—হ্যাঁ মা।

—ওর কি কেউ নেই?

—তা ত জানিনে মা। আমাদের ক্লাশের কালিদাসকে ত চেনো, শিশিরের মেসে থাকে; তার কাছে শুনেছি ও মাসে মাসে বনমালী-দাস বলে একজনকে টাকা পাঠায়। তা ছাড়া ওর কাছে কোনো চিঠিপত্রও আসে না, এও কাউকে চিঠি লেখে না। ঐ বনমালী-দাস কে, আর শিশিরের কেউ আছে কি না, খোঁজ নিতে হবে।

সুনয়নী বলিলেন—ওকে দেখ্‌লে মনে হয় ও যেন কি একটা গভীর দুঃখ মনের মধ্যে চেপে রেখেছে। ওকে ভালোবাসা আদর যত্ন দিয়ে ভুলিয়ে সেই দুঃখের কাহিনী জান্‌তে হবে, নইলে ওর মনে আরো ক্লেশ হবে।

রজত বলিল—সেই জন্যেই ত ওকে তোমার কাছে এনে ফেল্‌লাম মা। তুমিই ওকে দুঃখ অভাব থেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে।

সুনয়নী জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কাল থেকে বৌমাকে পড়াতে আস্‌বে ত?

—আস্‌তে বলে ত দিয়েছি। না আসে ত ধরে নিয়ে আস্‌ব; ও একজায়গায় পড়ায়, আট টাকা পায়। আমরা কত করে দেবো না?

—টাকা কুড়ি করে দিলে কি ওর খরচ কুলোবে না? তারপর পার্ব্বণে পার্ব্বণে জামা কাপড় দিলেই হবে। আমার ত কেমন ওর ওপর মায়া পড়ে গেছে; শিশিরের কি মনে হয়েছে কি জানি।

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বলিল—আপনি যখনই ওঁকে আদরের কথা বল্‌ছিলেন মা, তখনই তাঁর চোখ ছলছল করে উঠ্‌ছিল, আমি দেখেছি।

বাস্তবিক সেদিন শিশিরের কাছে এই কঠোর পাষাণী পৃথিবী মধুমতী হইয়া উঠিয়াছিল; কলিকাতার পথের ধূলায় সে আনন্দের খেলা দেখিতেছিল, আপনে ধান্দায় প্রমত্ত জলস্রোতের মধ্যে সে সহৃদয়তার প্রবাহ অনুভব করিতেছিল। সে এতদিন কালিদাস প্রভৃতি বন্ধুর তার প্রতি শ্রদ্ধা মমতা গরিবের প্রতি অনুকম্পা মনে করিয়া সন্দেহে দূরে সরাইয়া চলিয়াছে; আজ তার মনে হইল

সে তাদের কাছে অপরাধী, সে তাদের আত্মীয়তাকে সন্দেহে এতদিন খাটো করিয়া দেখিয়াছে।

শিশির আনন্দে তার আট টাকার সংস্থান মাষ্টারী চাকরীটি ছাড়িয়া দিয়া স্থির করিল রজতের বৌকে পড়াইয়া পারিশ্রমিক লওয়া তার উচিত হইবে না। তখন তার এ চিন্তা মনে আসিল না, দারুণ অভাবের অবস্থায় আয় আরো কমিয়া গেলে কি দুঃসহ ক্লেশ ও অনটন ভোগ করিতে হইবে। সে আজ যা পাইয়াছে তার বিনিময়ে সে কঠিনতম দুঃখও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে, সে আনন্দের আতিশয্যে অন্তরে অনুভব করিতেছিল এমন বল যার জোরে সে অপরিমেয় ত্যাগ করিতেও সক্ষম।

শিশির রাত্রে বাসায় ফিরিয়াই কালিদাসের ঘরে গিয়া হাসিমুখে কালিদাসের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমার ভাগ্য ভালো যে তোমাকে আর রজতকে বন্ধু পেলাম। রজতরা বড়লোক বটে, কিন্তু বড় ভালো লোক। মা ত মাতৃস্নেহের প্রতিমূর্ত্তি! রজতের বিয়ে হয়েছে জানতাম না। বৌকে দেখ্‌লাম, বেশ দিব্যি সপ্রতিভ মেয়েটি। রজত ভাই আমাকে ধরে বসেছে তার বৌকে পড়াতে হবে; মাও বল্‌লেন, বৌদিদিরও ইচ্ছে বোধ হল। কি করি ভাই, এ চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে এলাম। আজ আর আমি ভাই খাব না, রজতের বাড়ী

থেকে রাজভোগ খেয়ে এসেছি। মা যে কি জিনিস তা ত আমি কখনো ভালো করে জানিনি। মায়ের যত্ন যে কেমন তা আজ টের পেয়েছি, আজ আমি ভাই মায়ের স্নেহে নতুন জন্ম লাভ করলাম। আজ থেকে আমার শৈশব আরম্ভ হল……

কালিদাস এর আগে কখনো এই কঠোর তপস্বীর এমন আনন্দিত মূর্ত্তি দেখে নাই, তার বাক্যে এমন উচ্ছ্বাস কখনো শোনে নাই, তার কথা যেন থামিতে চায় না, তার আনন্দ যেন ধরিয়া রাখা যাইতেছে না। কালিদাস শিশিরের এই পরিবর্ত্তনে সুখী হইয়া হাসিয়া বলিল—তুমি নিজে ভালো, তাই আমাদেরও তোমার ভালো লাগছে।

সে রাত্রি শিশির আপনার বদ্ধ এঁদো ঘরটিতে যে সুখে যাপন করিল তেমন সুখ সে জীবনে আর পাইয়াছে কি না সন্দেহ। শৈশবে তাকে নিজের জননীর সঙ্গ ও স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া অপর একজনের সঙ্গে মা পাতাইয়া মাতৃস্নেহ পাইবার অভিনয় করিতে হইয়াছিল; কিন্তু যেখানে সম্পর্ক সত্য হইয়া উঠে নাই, সেখানে চিত্ত ত প্রসন্ন হইয়া সে দান গ্রহণ করিতে পারে না। তার মায়ের স্নেহের অভাব রজতের মা এক নিমেষে পূর্ণ করিয়া তাকে শুষ্কতার মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া দিলেন! এই স্নেহ কি মন্ত্র জানে, যা প্রচুর দান করে কিন্তু দান গ্রহণের দীনতা একটুও অনুভব করিতে দ্যায় না!

মানুষের স্বাভাবিক সাধুতা ও সততার উপর তাদের তিন জনেরই কি গভীর বিশ্বাস, যে, একজন অপরিচিতকে নবোঢ়া তরুণী বধূর শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করিতেছে! এই বিশ্বাসের জন্যই ত তারা অসীম কৃতজ্ঞতার পাত্র!

এতদিন শিশির মোম দিয়া চকচকে পালিশ ইস্ত্রিকরা নীল ছিটের জামা পরা টেড়িবাগানো ফুলবাবু বচনবাগীশ ফাজিল দাম্ভিক ছেলে মনে করিয়া রজতকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিত। কিন্তু পরদিন ক্লাশে গিয়াই সে হাসিমুখে রজতের পাশে গিয়াই বসিল। ক্লাশের ছেলেরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল শিশির আজ নূতন বই সংগ্রহ করিয়া কলেজে আসিয়াছে, সে সকলের সঙ্গে আজ গল্প করিতে প্রস্তুত, আজ সে সময় বাঁচাইয়া বই নকল করিতে আর ব্যস্ত নয়।

কলেজের ছুটির পর শিশির রজতকে বলিল—আমি সন্ধ্যার পর যাব তা হলে?

রজত বলিল—সন্ধ্যার অপেক্ষা কেন, এখনই চল, সেখানে গেলেই এখনি সন্ধ্যার দেখা পাবে।

শিশির একটু কুণ্ঠিত হাস্যে বলিল—আমি এখন থেকে গিয়ে কি করব, তুমি এখন গিয়ে খাবে টাবে।

রজত হাসিয়া বলিল—এখন গিয়ে যা খাব তা তোমার সামনে খেলেও তোমার বা তোমার বৌদিদির

লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই, আর সে খাবারের ভাগ তোমাকে দিলে শুচিবাইগ্রস্ত লোকও আপত্তির কারণ খুঁজে পাবে না। অতএব চল।

শিশিরের কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। রজত সেই লাজুক অপ্রতিভ অরসিক বন্ধুকে টানিয়া গাড়ীতে তুলিল।

বাড়ীতে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িবার-ঘরে গিয়া বই রাখিয়া রজত শিশিরকে ডাকিল—ওপরে এস।

শিশির একখানা কাউচে কাত হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—বৌদিদির পড়্‌বার সময় হলে ডেকে পাঠিয়ো, তখন যাব।

রজত আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। রোজ রোজ পরের বাড়ীতে খাইতে শিশিরের যে লজ্জা হইতেছে, ইহা বুঝিয়া রজত যে তাকে আর পীড়াপীড়ি করিল না, তাহাতে শিশির আরাম বোধ করিল।

একটু পরেই তাকে সচকিত করিয়া সেই ঘরে সুনয়নী আসিয়া উপস্থিত। শিশির তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁকে প্রণাম করিল। সুনয়নী বলিলেন—তুমি পরের মতন বাইরের ঘরে বসে আছ কেন বাবা? মার কাছে যেতেও কি তোমার লজ্জা? এমন লাজুক মুখচোরা ছেলে ত আমি কখনো দেখিনি! এস বাবা এস।

সুনয়নী শিশিরের হাত ধরিলেন। শিশির আর

আপত্তি করিবার পথ না পাইয়া লজ্জিত স্মিতমুখে আস্তে আস্তে সুনয়নীর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে চলিল।

বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিল দুখানি ঠাঁই করা আছে ; একখানা আসনে রজত বসিয়া অপর আসনের অধিকারীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। সন্ধ্যা পরিবেষণ করিতেছে।

সুনয়নী শিশিরকে আদেশ করিলেন—খেতে বোসো বাবা। আজ তোমাকে গুরুবরণ করবে বলে বৌমা একাই সব রেঁধেছে, আমায় কিছু করতে দ্যায় নি।

এই তরুণী ধনীবধূর গৃহিণীপনার এই নিপুণতা ও আগ্রহ এবং যত্ন করিবার চেষ্টা ও ইচ্ছা দেখিয়া শিশির আনন্দিত হইয়া নিরাপত্তিতে আসনে গিয়া দাঁড়াইল। সে বসিতে যাইতেছিল, সন্ধ্যা তার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—একটু দাঁড়ান।

শিশির অবাক হইয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিল। সন্ধ্যা কিছু না বলিয়া চোখের কোণে হাসি চল্‌কাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। শিশির ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া সুনয়নী ও রজতের মুখের দিকে বে ফিরাইল, কিন্তু তাঁদের মুখেও রহস্যময় কৌতুকহাস্য জ্বলজ্বল করিতেছিল।

সন্ধ্যা একখানা জাপানী চিত্রকরা কাঠের বড় বার্‌কোশ দুহাতে করিয়া আনিয়া শিশিরের সাম্‌নে ধরিল। শিশির

দেখিল সেই বার্‌কোশের উপর কতকগুলো কোঁচানো ধুতি, উড়ানি, জামা, তোয়ালে, রুমাল, জুতো, চটি, খড়ম, ছাতা ও কতকগুলি টাকা আছে। এসব আনিয়া সন্ধ্যা যে তার সাম্‌নে কেন ধরিল তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া শিশির একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এসব কি হবে ?

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বলিল—আমার গুরুবরণ !

শিশির লইতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া রজত হঠাৎ বলিয়া উঠিল—শিশির, বার্‌কোশটা ধর ধর, সন্ধ্যার হাত কাঁপ্‌ছে, এখুনি সব ফেলে দেবে।

শিশির ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি দুহাতে বার্‌কোশখানা যেমন সন্ধ্যার হাত হইতে উঠাইয়া লইল, অম্‌নি রজত হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কেমন ! নিতে হল !

শিশির অপ্রতিভ হইয়াও সুখে হাসিল। সন্ধ্যা ও সুনয়নীর মুখেও আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সুনয়নী বলিলেন—বার্‌কোশটা এখন রেখে দিয়ে খেতে বোসো বাবা।

পাঁচ

সন্ধ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া অবধি শিশিরের এক বেলার খাওয়া রোজ রজতের বাড়ীতেই বরাদ্দ হইয়া গেল। শিশির এতে সঙ্কোচ বোধ করিত, কিন্তু আপত্তি করা বৃথা বলিয়া সে আর আপত্তি তুলিত না। সন্ধ্যা মেয়েটি যখন কাছে আসিয়া শান্ত মৃদুস্বরে ডাকে "ঠাকুরপো খেতে আসুন," অথবা সুনয়নী স্নেহভরা স্বরে ডাকেন—"বাবা, শিশির, খেতে এস," তখন আপত্তি করা অশোভন অভদ্রতা বলিয়া শিশিরকে খাইতে বসিতে হয়, অথচ তার অন্তরের সঙ্কোচ তার মুখে চোখে ফুটিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে। শিশির এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে চায় যে সে ত সন্ধ্যাকে পড়াইয়া কিছু লইবেই না ঠিক করিয়াছে। কিন্তু তার মন তাতেও সান্ত্বনা পাইতে চায় না; এক ঘণ্টা পড়ানোর জন্য তার ন্যায্য বেতন আট টাকা, বড় জোর দশ টাকা, হইতে পারে; কিন্তু সে যে মাসে পনেরো কুড়ি টাকার শুধু খাবারই খাইবে! তা ছাড়া গুরুবরণ বলিয়া সন্ধ্যা তাকে যেসব জিনিস ও একশত টাকা দিয়াছে, তা যে সে অন্যত্র এক বৎসর কাজ করিলেও পাইত না! সুতরাং শিশিরের মনের দ্বিধা সঙ্কোচ কিছুতেই ঘুচিতে চাহিতেছিল না।

শিশিরের মনের কুণ্ঠা রজত বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সে মাঝে মাঝে শিশিরের বাসায় গিয়া চাহিয়া খাইয়া, তার কাছে কোনো নূতন বই দেখিলে চাহিয়া লইয়া শিশিরের মনকে লঘু করিবার চেষ্টা করে। রজত কয়েকদিন ঘন ঘন শিশিরের মেসে গেল। কিন্তু শিশিরের কাছে থাকার চেয়ে কালিদাসের সঙ্গে কি একটা গোপন পরামর্শে তার আগ্রহ যেন বেশী।

ইহার পরেই হঠাৎ একদিন শিশির কালিদাসের কাছে শুনিল, তাদের মেসের বাড়ীওয়ালার মনে করুণা ও অনুকম্পা এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে সে বলিয়াছে বিদেশী ছাত্ররা কষ্ট করিয়া কলিকাতা শহরের দুর্মূল্য লেখাপড়া শিখিতেছে, তাদের কাছ হইতে সে মাসে দশ টাকা কম করিয়া বাড়ীভাড়া লইবে। এই খবর শুনাইয়া কালিদাস বলিল—এখন আমরা সীট-রেণ্ট কমিয়ে দিতে পারব। তুমি নীচের ঘরের ভাড়া দিয়েই এখন ওপরে থাকতে পারবে, তুমি আমার ঘরে এস।

এই কলিকালে বাড়ীওয়ালার এমন ধর্ম্মে মতি দেখিয়া আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়া শিশির কলেজে গিয়াই পরম উৎসাহের সঙ্গে রজতকে খবরটা দিল। রজত কেমন উদাসীন ভাবে হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল। এতে শিশির একটু বিরক্ত হইল—বাড়ীওয়ালার যে কত বড় মহৎহৃদয় ও তার যে কতখানি ত্যাগস্বীকার তা

বড়লোক রজত অনুভব করিবে কেমন করিয়া! শিশির ক্ষুব্ধ হইয়া রজতের ব্যবহারের প্রতিবাদ কালিদাসের কাছে উথ্থাপন করিল; কিন্তু শিশির দেখিল তার কথায় কালিদাসও বেশ উৎসাহ দেখাইল না, সে একটু হাসিয়া মৃদু ভাবে বলিল—হ্যাঁ, যে পরের জন্যে ত্যাগ করে সে মহৎ লোক তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু তাই বলে তুমি যেন বাড়ীওলাকে বাহবা দিতে যেয়ো না; সে বলেছে ও-প্রসঙ্গ যেন তার কাছে উথাপন করাই না হয়।

বাড়ীওয়ালার প্রতি শিশিরের শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সে সেইদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যাকে পড়াইতে বসিয়া উৎসাহের সঙ্গে বাড়ীওয়ালার সহৃদয়তার কথা সুনয়নী ও সন্ধ্যাকে শুনাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাঁরাও যে বাড়াওয়ালার ব্যবহারে কোনোরকম অসাধারণত্ব অনুভব করিলেন তা তাঁদের মুখ দেখিয়া শিশির বুঝিতে পারিল না। বরং শিশিরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মাঝখানে সুনয়নী বলিয়া উঠিলেন—তা বাবা, তুমি মেসে কেন পড়ে থাক? তোমার মার কোলে কি দুই ছেলের জায়গা হয় না?

শিশির ব্যস্ত হইয়া বলিল—না মা, আর ত মেসে আমার কোনো কষ্ট নেই। আমাদের বাড়াওলা যে-রকম মহৎ লোক……

সুনয়নী তাকে কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার দেশ কোথায় বাবা ?

শিশিরের উৎসাহে উজ্জ্বল মুখ ও আনন্দে চঞ্চল চোখ হঠাৎ গম্ভীর স্তব্ধ বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। সে মাথা নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস চাপিল, তারপর আস্তে আস্তে ম্লান মুখ তুলিয়া সুনয়নীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—এই বাংলা দেশই আমার দেশ মা।

শিশিরের ভাব দেখিয়াই সুনয়নী বুঝিলেন সে একটা কি গভীর দুঃখ অন্তরে গোপন রাখিয়া নিত্য নিরন্তর বহন করিতেছে। তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়া শিশিরের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কি আপনার লোক কেউ নেই বাবা ? শুনেছি, বনমালী-দাস বলে একজনকে তুমি মাসে মাসে টাকা পাঠাও, তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ?

শিশিরের চোখ দুটা কেমন একটা উৎকট জ্বালায় একবার জ্বলিয়া উঠিয়া তখনি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল।

সুনয়নী শিশিরের পাশে বসিয়া বলিলেন—তোমার দেখেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম বাবা, তোমার মনে একটা কি দুঃখ লুকোনো আছে। তোমার আঙুলে আংটি পরার দাগ এখনো মিলোয়নি ; তুমি জুতো পরো না, তবু তোমার পা নরম সুডৌল ; এ আমি

কদিন থেকেই লক্ষ্য কর্‌ছি। রাজ্য ছেড়ে রাম কি বনবাসী হয়েছে বাবা?

শিশিরের চোখ দুটি কোমল হইয়া সজল হইয়া আসিল। এমন মমতার সঙ্গে এত লক্ষ্য করিয়া তার দিকে নজর দিবার লোক সে ত জন্মে কখনো দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। এই কি মাতৃস্নেহ! মা সে দু-দুবার পাইয়াছিল, কিন্তু এমন স্নেহ সে ত কারো কাছে পায় নাই।

শিশিরকে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে দেখিয়া সুনয়নী আবার বলিলেন—তোমার বল্‌তে যদি কষ্ট হয়, কিংবা আপত্তি বোধ হয়, তবে শুন্‌তে চাইনে বাবা। যে ছেলে মায়ের কোলে আজ জন্মায় তার পূর্ব্বজন্মের খবর না জেনেও মায়ের স্নেহের ও যত্নের ত অভাব হয় না।

শিশির ছলছল চোখে সুনয়নীর দিকে তাকাইয়া বলিল—আপনার কাছে, আপনাদের কাছে গোপন কর্‌বার আমার কিছু নেই। আমার জীবনের কাহিনীটা কিছু দীর্ঘ। বলি তবু। বৌদিদির আজ আর পড়া হল না......

শিশির চেষ্টা করিয়া হাসিয়া সন্ধ্যার ও রজতের মুখের দিকে চাহিল; দেখিল রজত গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে; সন্ধ্যার মুখখানি তার দুঃখের ছোঁয়াচে মলিন বিষণ্ণ মমতাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শিশির আত্মকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

ছয়

(ক)

আমি আসলে বাস্তবিক গরিবেরই ছেলে, আমার বাপ-মায়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল; আমরা ভাই বোনে মিলে আটটি তাঁদের পোষ্য; দুটি বোন বড়, তাদের বিয়ের বয়স হয়ে উঠেছিল; আমরা চার ভাই মাঝখানে, তার পরে দুই বোন, সবাই ছোট ছোট। শুধুই ব্যয় বেড়ে চলেছিল, অথচ আয় বাড়্বার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এতে বিব্রত হয়ে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় আমাদের বাবা আর মায়ের মেজাজ ক্রমেই রুক্ষ ও তিরিক্ষি হয়ে উঠ্ছিল। একটুতেই তাঁরা চটে উঠ্তেন, খিট্খিট্ কর্তেন; বাবা আর মায়ে খিটি-মিটি লেগেই ছিল, আর তার ঝাল পোয়াতে হত হতভাগা আমাদের; কথা নেই বার্ত্তা নেই একটা কিছু ছুতো করে মা আমাদের গাল দিয়ে ভূত ভাগাতেন, বাবা দুড়্দাড় করে ঠেঙিয়ে আমাদের হাড় ভাঙ্তেন। দৈন্য ও অভাবের কারণ যে আমরাই, এ আমাদের উঠ্তে বস্তে খেতে পর্তে বেশ করে হাড়ে হাড়ে সম্ঝে দেওয়া হত। আমরা মার খাবার ভয়ে কখনো

খাবার চেয়ে খাইনি। ছেলেবেলা থেকেই আমরা সাবধানী গম্ভীর হয়ে উঠেছিলাম, একলা সকলের কাছ থেকে সরে সরে পালিয়ে বেড়াতাম।

আমার বয়স যখন বছর দশেক তখন নন্দনপুরের জমিদার শিবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন যে তিনি পোষ্যপুত্র নেবেন। তাঁর চরেরাও দেশে দেশে পোষ্যপুত্রের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। আমাদের গ্রামের প্রহ্লাদবাবু সেই জমিদার-সরকারে কাজ করত, সে বাবাকে চিঠি লিখলে, তিনি যদি তাঁর এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র দিতে রাজি হন, তা হলে সে চেষ্টা করে' করে দিতে পারে।

বিজ্ঞাপন দেখেই কথাটা বাবার মনে জেগেছিল, তার পর প্রহ্লাদ বাবুর চিঠি পেয়ে তাঁর ইচ্ছা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি বল?

মা বললেন—কেবলি শূওরের পাল বিয়োচ্ছি, না পারি খেতে পরতে দিতে; না পারি যত্ন আত্তি করতে। আর সব-কটাতে মিলে ত আমার হাড় ভাজা-ভাজা করে তুলেছে। লোকে যদি আদর করে নেয় ত একটাকে দিয়ে দাও। আমি কিন্তু গাবলাটাকে দিতে পারব না।

গাবলা আমার সব ছোট ভাই, সে আমার পরেই; তার পর আমার দুই বোন।

বাবা বল্‌লেন—ঐ শিশিটাকে দিয়ে দেবো, ওটাই সবগুলোর মধ্যে মিট্‌মিটে সয়তান!

মা বল্‌লেন—তা দিয়ে দাওগে! ও ত সুখে থাকবে। আর ওর ঐশ্বর্য্য হলে ভাই বোন মা বাপকে ত আর ভুলে থাকতে পারবে না। আর এই সুযোগে কিছু থোক টাকা হাতে পেলে উমা আর নিভার বিয়েটা দিয়ে দেওয়া যাবে।...কিরে শিশে, তুই পুষ্যিপুত্তুর হবি?

মা বাবা আমার শিশির নামটাকে খাটো করে শিশি শিশে বলে ডাক্‌তেন। মার কথা শুনে আমার অত অল্প বয়সেই কেমন রাগ আর দুঃখ হল। আমাকে বেচে তাঁরা টাকা নেবেন, অথচ আমারই আরেক ভাইকে দেবার সম্ভাবনাতেই তিনি আঁৎকে উঠ্‌লেন। এর অল্পদিন আগেই আমাদের গ্রামে যাত্রায় রাজকৃষ্ণ রায়ের নরমেধ-যজ্ঞ পালা শুনেছিলাম, আমার মনে হল আমি যেন সেই নরমেধ যজ্ঞের কুশী! আমাকে কিনে নিয়ে তারা আমায় মেরে ফেল্‌বে। বাবা আর মা আমাকে এম্‌নি করে যমের মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে! আমার অত্যন্ত অভিমান হল বলেই আমি ঝোঁক দিয়ে বল্‌লাম—হঁ্যা, আমি পুষ্যিপুত্তুর হব।

আমার কথা শুনেই বাবা বলে উঠ্‌লেন—আমি জানি ওটা চিরকেলে একলষেঁড়ে শয়তান! ওর নিজের সুখ হলেই হল; তোমাদের কষ্ট হবে কি দুঃখ হবে তাতে ত

ওর বয়ে গেল। এই বলেই বাবা আমার কান ধরে নেড়ে দিয়ে একচড় কষিয়ে দিলেন।

আমার চোখ দিয়ে জল আস্‌ছিল—আমার কাছে দোষ করে আবার আমাকেই দোষী করা! আমি উঠে সেখান থেকে চলে গেলাম।

বাবা প্রহ্লাদ-বাবুকে চিঠি লিখে দিলেন, তিনি একটি ছেলেকে পোষ্যপুত্র দিতে রাজি আছেন।

ওপিঠ থেকে একেবারে তার এল যে অবিলম্বে যেন বাবা তাঁর চার ছেলেকেই নিয়ে নন্দনপুরে আসেন; চারটির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া হবে।

মা প্রথমে মহা আপত্তি তুল্‌লেন যে তিনি গাব্‌লাকে কিছুতেই যেতে দেবেন না; ওকে দেখ্‌লে ওকেই তারা নিয়ে নেবে। আপত্তি বাবা সইতে পারেন না, তিনি চটে উঠ্‌লেন। কাজেই দুজনে ঝগ্‌ড়া বেধে গেল। বাবা যখন রেগে বলে উঠ্‌লেন—"তবে রইল তোমার ছেলে মেয়ে, তুমি যেমন করে পার ওদের খাইও পরিও, মেয়েদের বিয়ে দিও। আমি এই বিবাগী হয়ে চল্‌লাম।" এবং যখন মা দেখ্‌লেন যে বাবা সত্য-সত্যই একটা ব্যাগে কাপড়-চোপড় ভর্‌ছেন, তখন তিনি ঝগ্‌ড়া থামিয়ে কান্না সুরু করে দিলেন।

বাবা সেই সুযোগে আমাদের চার ভাইকে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

(খ)

নন্দনপুরে গিয়ে আমরা এক বৃহৎ অট্টালিকায় বাসা পেলাম ; রোজ রাজভোগের আয়োজন আস্‌তে লাগ্‌ল। জন্মে কখনো এমন বাড়ীতে থাকি নি, এমন সব ভালো খাবার খাই নি। গ্রামে কোনো দিন নিমন্ত্রণ হলেই তবে আমরা পেট ভরে খেতে পেতাম ; এখানে যেন রোজই ভোজ! তবু আমার মন কেন প্রসন্ন হচ্ছিল না। কিন্তু আমার ভাইএরা খুব খুসী। মাঝে মাঝে তারা আপোষে ঝগ্‌ড়া বাধিয়ে দ্যায়—এ বলে আমি পুষ্যিপুত্তুর হব, ও বলে আমি পুষ্যিপুত্তুর হব। গাব্‌লা মুখ ফুলিয়ে দুঃখ করে বলে—মা যে আমায় হতে দেবে না ভাই, নইলে আমিও পুচ্যিপুত্তুর হতাম! লোজ লোজ আমি পেট ভলে পলমান্ন কেতাম, ঘোনায় চল্‌তাম—হেট হেট ঘোনা জল্‌দি চল্!

গাব্‌লার কথা শুনে আমার কেন বড় কান্না পেত ; আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদ্‌তাম।

রোজ দুবেলা আমাদের ভালো ভালো কাপড় জামা জুতো পরিয়ে, বড়-বড়-পাগ্‌ড়ী-বাঁধা চাপ্‌রাশ-আঁটা দরোয়ানেরা সঙ্গে করে জমিদার-বাড়ীতে নিয়ে যেত। জমিদার শিবশঙ্কর-বাবু আমাদের কাছে বসিয়ে কত কি জিজ্ঞাসা করতেন, কখনো পড়তে বলতেন, কখনো

ছুটিতে বল্‌তেন, কখনো হাসাবার চেষ্টা করতেন। তারপর তিনি সঙ্গে করে অন্দরে তাঁর গিন্নির কাছে নিয়ে যেতেন। তাঁর গিন্নির নাম মাতঙ্গিনী, তিনি বাস্তবিকই একটি মাতঙ্গিনী—প্রকাণ্ড মোটা, গলার আওয়াজ যেন হাঁড়ার ভেতর থেকে বেরুচ্ছে! তিনি যেদিন প্রথম আদর করে আমাদের গম্ভীর গলায় ডাকলেন—"এস তোমরা আমার কাছে এস।" গাব্‌লা ত ভয় পেয়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল—"দাদা! আমি ওল্‌ পুচ্যিপত্তুর অব না!" সেই কথা শুনে তিনি তার দিকে এমন কটমট করে তাকালেন যে গাব্‌লা বেচারা থরথর করে কেঁপে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আঁৎকে কেঁদে উঠ্‌ল! তখন মাতঙ্গিনী একটু স্নেহার্দ্র হয়ে তাঁর হেঁড়ে গলায় আদর করে ডাকলেন—"অ খকা, খকা! তুমি কেঁদো না, কেঁদো না!" এই আদরে গাব্‌লার কান্না থামা দূরে থাকুক, সে বেচারা আরো চীৎকার করে বলে উঠ্‌ল—"ওরে বাবারে! জুজুবুড়ি!" এতে মাতঙ্গিনী ভয়ানক চটে গিয়ে দাসীদের বললেন—"তোরা ওটাকে এখান থেকে নিয়ে যা।" গাব্‌লা আরো কাঁদতে লাগ্‌ল; সে যাবেও না, আমাকে দুহাত দিয়ে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে রইল। আমি তাকে বল্‌লাম—"বাবার কাছে নিয়ে যাবে, যাও। যাও ভাই লক্ষীটি, বাবা হাতী দেখাতে নিয়ে যাবে!" তখন সে গেল। মাতঙ্গিনী

আমার ওপর খুসী হয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তোর ছোঁড়ার ত বেশ বুদ্ধি! তোর মনে দয়া-মমতাও আছে দেখ্‌ছি! তোর চেয়ে এ ছোঁড়া-দুটো বড় বটে, কিন্তু একএকটি আস্ত গোভূত!

দাদাদের গুণব্যাখ্যা শুনে আমার ভারি হাসি পেল। কিন্তু দাদাদের মুখ একেবারে অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

প্রথম দিন থেকে আমার উপরেই কর্ত্তা গিন্নি দুজনের কেমন নজর পড়ে গেল। থাকেন থাকেন কর্ত্তা বলেন—এর চোখ দুটো খুব তীক্ষ্ণ! রাজবুদ্ধির চিহ্ন বটে!

গিন্নি বলেন—হ্যাঁ, এ ছেলেটি চালাক চতুর, অথচ শান্ত শিষ্ট; দয়ামমতাও আছে। ওর ওপর আমার মায়া পড়েছে।

সকাল বিকেল কর্ত্তাগিন্নির কাছে অন্দরে, আর দুপুর-বেলা কর্ত্তার কাছে বৈঠকখানায় আমাদের হাজিরা দিতে হচ্ছিল। বৈঠকখানায় যতরাজ্যের দৈবজ্ঞ গণৎকার জ্যোতিষী এসে জোটে; তারা আমাদের কোষ্ঠী বিচার করে, হাত দেখে; একজন সাহেব ফ্রেনোলজিষ্টও এসেছিল, সে আমাদের মাথা টিপে টিপে ব্যথা করে তুলেছিল, একদৃষ্টে আমাদের চেহারা দেখে দেখে আমাদের ডরিয়ে তুলেছিল। পরে বড় হয়ে বুঝেছিলাম সে ফ্রেনোলজিষ্ট; কিন্তু তখন তাকে নরমেধ যজ্ঞের একজন কেউ রাক্ষস-টাক্ষস মনে হয়েছিল—একে ত সে

সাহেব, তায় তার মাথা টেপার ঠেলা! আমাদের ত ধড়ে প্রাণ ভয়ে ধুকধুক করছিল।

কোষ্ঠীবিচার, হাত গোনা, মাথা টেপা—সব থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল আমি রাজা হবার জন্যেই জন্মেছি; আমার গুণের আর সুলক্ষণের অবধি নেই।

শিবশঙ্কর-বাবু খুসী হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ভুঁড়ি দুলিয়ে বল্‌লেন—দেখেছ হে, আমি কি রকম লোক চিনি!

ঠিক হয়ে গেল আমাকেই পোষ্যপুত্র নেওয়া হবে। মার গাব্‌লা যে বেঁচে গেল, আর তাঁর প্রথম ভবিষ্যৎ-বাণী সফল করে যে আমারই নির্ব্বাচন কায়েমি হল, তাতে খুসী হয়ে বাবা মাকে তাড়াতাড়ি তার করে দিলেন।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর বাবা গোপনে কয়েক হাজার টাকা উপার্জ্জন করে হৃষ্ট মনে আমার ভাইদের নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। গোপনে টাকা নিতে হল এই জন্যে যে টাকা দিলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ অসিদ্ধ হয়ে যায়।

বাবা যাবার সময় আমার বিষণ্ণ মুখ দেখে হাসি মুখে আমায় বল্‌লেন—শিশে, তোর কপাল খুব ভালো! হাভাতের ঘরে জন্মে রাজা হয়ে গেলি! তোর আর দুঃখ কি? আমার অবর্ত্তমানে তোর ভাইবোনদের খোঁজ খবর নিস্।

বাবা চিরকাল টাকার টানাটানিতে অতগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কষ্ট পেয়ে এসেছেন, অর্থকষ্টটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তিনি আমাকে বেচে হাজার কতক টাকা পেয়ে নিজেও খুসী হয়ে উঠেছিলেন এবং আমি যে এত টাকার ভবিষ্যৎ মালিক হলাম তাতেও তিনি খুসী হয়ে নিজের খুসী দিয়ে ঠিক করে নিয়েছিলেন যে আমারও খুব খুসী হবার কথা। কিন্তু দশ বছরের বালকের মনে টাকার চেয়ে মমতার প্রতিই যে বেশী টান, এ কথা তিনি বুঝ্‌লেন না, আমি নিজে বুঝ্‌লেও বোঝাতে পার্‌লাম না। আমার সঙ্গে আমার মার খুব বেশী মাখামাখি ছিল না। আমার এক বছর বয়সের সময় গাব্‌লা হয়, গাব্‌লার পর আবার আমার দুই বোন; সুতরাং মা কচিদের নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌তেন, আমি মার কোল কি আদর-যত্ন বেশী পাইনি। বাবাকে ত বাঘের মতন ডরাতাম, তাঁর যে স্নেহমমতা আছে তা আমরা কেউ কোনো দিন সন্দেহও করিনি। কারণে অকারণে তাঁদের কাছ থেকে বকুনি আর মার খাওয়া হর্‌দম চল্‌ত। আমার দিদি-দাদারাও মা-বাবার দেখাদেখি ছোট আর দুর্ব্বলকে শাসন উৎপীড়ন কর্‌তে বেশ শিখেছিল, তারাও আমাকে উঠ্‌তে বস্‌তে লাঞ্ছনা কর্‌তে কসুর কর্‌ত না, তাদের দাদাগিরি আর দিদিগিরি ফলানোর জ্বালায় আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাক্‌তাম।

এইজন্যে ছেলেবেলা থেকেই আমার মন এদের কারো প্রতিই অনুরক্ত হয়ে ওঠেনি, আমি বরাবর কেমন একলা তফাৎ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আজ এই নির্বাসনের দিনে আমার সেই পরম অত্যাচারিণী মা আর দিদিদের জন্যেও মন কাঁদ্ছিল, বাবা দাদারা ও গাব্লা চলে যাচ্ছে বলে আমার কেমন অসহায় বোধ হচ্ছিল। কিন্তু যাবার সময় বাবার মুখের হাসিটা তাঁর শত প্রহারের চেয়ে আমাকে আঘাত করল বেশী। আমার অত অল্প বয়সেও সেই হাসিটা এমন নিষ্ঠুর অশোভন মনে হয়েছিল যে আমি কিছু না বলে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বড় দাদা আমার কাছে এসে চুপিচুপি বলে গেল—ত্যাখ্ শিশে, তুই রাজা হলি, পূজোর সময় আমাদের সব ভালো ভালো পোষাক দিস্ কিন্তু—সেই যেরকম তুই যজ্ঞির দিন পরেছিলি! ভুলিস নে যেন, আমি আবার চিঠি লিখে মনে করিয়ে দেবো!

ছোট দাদা চুপ করে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। কেবল গাব্লা গাড়ীতে উঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ছোড়দা যাবে না?

বাবা যেই বল্‌লেন "না", অম্‌নি সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। আমার জন্যে কেঁদেছিল সেই একজন সেই একদিন! সে কান্না আজও আমার মনে মমতার করুণ রাগিণী মাঝে মাঝে বাজিয়ে যায়। আমার চোথ দিয়ে

এতক্ষণে জল গড়িয়ে পড়্ল। আমায় কাঁদ্তে দেখে শিবশঙ্কর-বাবু আমার পিঠে হাত দিয়ে আদর করে বল্লেন—চল বাবা চল, তোমার মার কাছে নিয়ে যাই।

অপ্রত্যাশিত আশায় আমার বুকটা ভরে উঠ্ল—আমার মা! গমনোন্মুখ বাবা আর ভাইদের দিকে একবার চেয়ে আমি শিবশঙ্কর-বাবুর সঙ্গে অন্দরে গেলাম। কত কত ঘর পার হয়ে গেলাম, মাকে ত দেখ্তে পেলাম না! যত বেশী হাঁট্ছিলাম ততই মার নিকট হচ্ছি ভেবে আনন্দে বুকের ভিতরটা ধক্‌ধক্ কর্‌ছিল। আমি চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাকে খুঁজেখুঁজে যাচ্ছি। শিবশঙ্কর-বাবু মাতঙ্গিনী দেবীর ঘরে ঢুকে তাঁর পালঙ্কে বস্‌লেন; আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফেল্‌কা-মুখো হয়ে মায়ের আবির্ভাব অপেক্ষা করছিলাম। শিবশঙ্কর-বাবু বল্লেন—এস বাবা তোমার মার কাছে।

মাতঙ্গিনী দেবী হুঙ্কার করে উঠ্লেন—এস, এস বাবা, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

মাতঙ্গিনী দেবীর গলার স্বর শুন্‌লেই আমার পিলে চম্‌কে যেত! তখন আমার চৈতন্য হল ইনিই আমার মা! মনে পড়্ল বটে কদিন থেকে বাবা আর শিবশঙ্কর-বাবু আমায় শেখাচ্ছিলেন—আমার বাবার নাম শিবশঙ্কর-চক্রবর্তী, মায়ের নাম মাতঙ্গিনী দেবী! ছেলেবেলা থেকে যে মুখস্থ করেছিলাম বাবার নাম মার্কণ্ডেয়-মজুমদার আর

মার নাম সুরসুন্দরী দেবী তা ভুলে যেতে হবে—তাঁরা আর আমার কেউ নন!

আমার নিজের মাকে আমি ভালো করে জান্‌বার বা ভালো বাসবার অবসর পাইনি; তবু তাঁর সঙ্গে যেটুকু পরিচয় ছিল, যে স্বাভাবিক স্নেহমমতা ছিল, সেটুকুও হারিয়ে এখন থেকে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয় কর্‌তে হবে, নিঃসম্পর্কের কাছ থেকে স্নেহমমতা আদায় কর্‌তে হবে।

(গ)

মাতঙ্গিনী তাঁর শরীর নিয়ে নড়্‌তে-চর্‌তে বড় একটা পার্‌তেন না; শিবশঙ্কর খুব বড় একডেলা আফিং খেয়ে বেলা ছুটোর সময় ঘুম থেকে উঠ্‌তেন—ছুটোর সময় তাঁর প্রভাত হত, আর সেই অনুপাতে তাঁর শোবার সময়ও ছুটো রাত্রির আগে হত না; সুতরাং আমার যত্ন করবার ভার পড়্‌ল এক চাকরের উপর —তার নাম নব। আপনার বাড়ীতেও বাপ-মায়ের যত্ন জানিনি; পরের বাড়ীতে এসেও পাতানো মা-বাবার যত্ন ভাগ্যে জুটল না। নব আমাকে "ছোট রাজা" বলে যে পরিমাণ খাতির করত, সে পরিমাণ আদর সে কর্‌তে পার্‌ত না। আমার তখন যে বয়স তাতে তখন সম্মানের

চেয়ে স্নেহের উপর লোভটাই বেশী থাকে, বিশেষ করে মেয়েদের স্নেহ পাবার জন্যে মনটা যেন কাঙাল হয়ে ফেরে। আমি মাঝে মাঝে আমার পাতানো মা রতিভঙ্গিনী দেবীর কাছে যাবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু তাঁর অমানুষিক গাম্ভীর্য্য আর বিকট রব আমাকে কিছুতেই সাহস বা আনন্দ দিত না। ছেলেবেলা থেকে ঐ লোকটিকে মা বলে জান্‌লে এমন বোধ হত না, কিন্তু কিছু জ্ঞান হবার পরে তাঁকে হঠাৎ দেখে তাঁকে কিছুতেই আপনার জন বলে মনে করতে পারতাম না। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে খাওয়াতেন; কিন্তু আমি অল্প খাই দেখে বিষম রাগ করতেন, বল্‌তেন আমার মুখের সাম্‌নেই, যে, গরিবের ঘরে জন্মে আমার আঁত মরে গেছে। সুতরাং রাজা হয়েও কিছুতেই আমার আনন্দ বা স্বস্তি ছিল না।

আমি জমিদারের পোষ্যপুত্র, সুতরাং আমার সমবয়সী ছেলেরাও আমাকে খাতির আর সমীহ করে চল্‌ত; যদি আমি বা তারা বয়সধর্ম্মে একটু চঞ্চল হয়ে জমিদারী-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতাম, তা হলে আমাদের কায়দাকানুন চাল-দস্তুর স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে পেয়াদা পাইক খান্‌সামা আম্‌লা অনেককে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখ্‌তাম। জমিদার-বাড়ীতে কোনো ছোট ছেলের পাটই ছিল না, বাইরের ছেলেদের সেখানে প্রবেশের

অধিকার ছিল না। সুতরাং আমার একাকীত্ব এখানে এসে আরো কায়েমি হয়ে উঠ্‌ল। নিজের জন্মস্থানে থাক্‌তে তবু বাবা মা দাদা দিদিরা চড়টা চাপড়টা দেবার সময়ও আমায় ডেকে কথা কইতেন; আমি পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অন্তত সমান হয়ে মিশ্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু এখানে শাসন নেই, আদরও নেই; আছে কেবল রুটিন—ধরাবাঁধা নিয়মমত ব্যবহার। আমি একলাটি এক ঘরে শুতাম, তার একদিকে পাশের ঘরে থাক্‌ত নব, আর-একদিকে পাশের ঘরে থাক্‌তেন কর্ত্তা আর গিন্নি। সকালে ঘুম ভাঙার সাড়া পেয়েই নব এসে সাম্‌নে হাত জোড় করে দাঁড়াত, তারপর কলের পুতুলের মতন মুখ ধোয়া স্নান করা কাপড় জামা পরা চুল আঁচ্‌ড়ানো প্রভৃতি কাজে আমার যত কম মেহনত হয়, যত কম হাত পা নাড়্‌তে হয়, তার সাহায্য কর্‌ত। তার পর ঠাকুর-ঘরে গিয়ে প্রণাম করে মাতঙ্গিনী দেবীর কাছে গিয়ে জল খেয়ে পড়্‌তে যেতে হত। দুজন মাষ্টার সকাল বেলায় আমাকে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু তাঁও মহা সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে, পাছে জমিদারের পোষ্যপুত্রের মর্য্যাদার একটু হানি হলে তাঁদের চাকরী যায়। দশটার সময় আবার মাতঙ্গিনী দেবীর পাহারায় ধম্‌কানির সঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টায় নানান দ্রব্য গিলে স্কুলে যেতাম। এই স্কুলের কয়েক ঘণ্টা ছিল আমার মুক্তির সময়—এ যেন কারা-

গারের পাষাণ-প্রাচীরের গায়ে আলো বাতাস ঢোক্‌বার ছোট্ট ঘুল্‌ঘুলি! কিন্তু মনটা গা মেলে হাঁপ ছাড়্‌বার আগেই ছুটি হয়ে যেত। বাড়ী ফিরে আবার রুটিনের পালা—মুখ ধোওয়া, কাপড় ছাড়া, জল খাওয়া, কর্ত্তার কাছে গিয়ে বসে থাকা, সন্ধ্যেবেলা মাষ্টারের কাছে পড়া, মাতঙ্গিনী দেবীর কাছে বকুনি আর খাবার খাওয়া আর তারপর একলাটি গিয়ে শোওয়া। এই বাঁধি নিয়মে একঘেয়ে জীবনটা নিয়ে আমার মন অসুস্থ হয়ে উঠ্‌ছিল, আমি সেই বয়সেই বিষম গম্ভীর শান্ত হয়ে উঠ্‌ছিলাম; সান্ত্বনা পাবার জন্যে রাতদিন লেখাপড়ার মধ্যেই ডুবে থাক্‌তাম। আমার এই অসন্তুষ্ট জীবন-যাত্রায় কিন্তু আর সকলে খুব খুসী হয়ে উঠ্‌ছিল—আমি প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হতাম বলে মাষ্টারেরা খুসী, কিন্তু ছেলেরা বল্‌ত আমি জমিদারের ছেলে বলে মাষ্টারেরা আমায় ফার্ষ্ট করে দ্যায়; আমি শান্ত শিষ্ট বলে কর্ত্তা গিন্নি খুসী--আমি যে জমিদারের উপযুক্ত চালে এখন থেকেই পোক্ত হয়ে উঠ্‌ছি এমন খুসীর কথা আমি প্রায়ই শুন্‌তে পেতাম।

এমনি একটানা জীবনস্রোত যখন বয়ে চলেছিল, তখন একটা আকস্মিক ও অভাব্য ঘটনা ঘটে আমাদের সকলকেই একটা বেশ নাড়া দিয়ে নূতুন পথে চালিয়ে দিলে।

(ঘ)

আমি নিজের মা-বাপকে ছেড়ে এসে পরের বাড়ীতে পরের স্নেহমমতা যখন আস্তে আস্তে অর্জ্জন করছিলাম, তখন মাতঙ্গিনী দেবীর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে একটি ছেলে হল। যার অভাব পূরণের জন্যে পরের ছেলেকে নিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো হচ্ছিল, তার আবির্ভাবে কর্ত্তাগিন্নির যে কি আনন্দ হল তা বলাই বাহুল্য। পুত্রের জন্মদিন থেকে ষষ্ঠীপূজা পর্য্যন্ত যে সমারোহ উৎসব হল তেমন হট্টগোল ব্যাপার আমি জন্মে কখনো দেখি নি। এই আশাতীত লাভে কর্ত্তাগিন্নি যেন আকাশের চাঁদ হাতে ধর্‌তে পেরেছেন এমনি আনন্দে বিবশ হয়ে উঠে-ছিলেন; ঠাকুরের বাড়ীতে বাড়ীতে পূজা, হোম, স্বস্ত্যয়ন, সত্যনারায়ণের পূজা, সুবচনীর পূজা, হরির লুট, লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ প্রভৃতি কত কি অনুষ্ঠান করিয়েও তাঁদের মন নির্ভয় বা নিশ্চিন্ত হচ্ছিল না, পাছে এই দুর্লভ নিধি পেয়ে আবার হারাতে হয়। শিবশঙ্কর-বাবুর অতকালের অভ্যাস বেলা দুটো পর্য্যন্ত ঘুমুনো ঘুচে গেল, এখন নটা দশটা বাজ্‌তেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, তিনি ধড়্‌মড়িয়ে উঠে গৃহিণীর ঘরে গিয়ে খোকার কুশল জেনে তবে প্রাতঃকৃত্য কর্‌বার অবসর পান। গিন্নি ত ছেলেকে বুক থেকে নামান না।

গিন্নি ছেলের নাম রাখলেন দুলাল; কর্ত্তা রাখলেন কুলচন্দ্র।

যে চন্দ্রের উদয়ে অন্ধকার চক্রবর্ত্তী-কুল উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হয়ে উঠল, তারই অপর পিঠের অন্ধকারে পড়ে গেলাম আমি। শিবশঙ্কর ও মাতঙ্গিনী আমাকে একদম ভুলেই বস্লেন, তাঁদের আর অবসর নেই যে আমার একটুও খোঁজ খবর করেন। অতটুকু খোকা আমাকে একেবারে ঠেলে ফেলে সরিয়ে তাঁদের মনের সবখানি জায়গা একেবারে জুড়ে বসেছিল। আমি তখন একান্ত নব চাকরেরই জিম্মা হয়ে উঠ্লাম।

আমি কখনো নিজে থেকে শিবশঙ্কর-বাবু বা মাতঙ্গিনী দেবীর কাছে যেতাম না, তাঁরাই আমাকে ডাকিয়ে পাঠাতেন। এখন তাঁরাও ডাকেন না, আমিও যাই না। একদিন বিকেল বেলা স্কুল থেকে এসে আমি বাড়ীর ভিতর জলখাবার খেতে যাচ্ছি, দেখ্লাম শিবশঙ্কর-বাবু মাতঙ্গিনী দেবীর পাশে বসে দুজনে খোকাকে নিয়ে খুব আদর করছেন। আমি এখন যখন-তখন যেখানে-সেখানে যার-তার মুখে শুনতে পাই "ছেলে হল ত হল, আর বছর পাঁচেক আগে হলেই বেশ হত, তা হলে আর পুষ্যিপুত্তুর নিতে হত না, বিষয়টা আর বখ্রা হয়ে যেত না, ছেলের পাশেও আর কণ্টক খোঁচা হয়ে থাকৃত না।" এমনি কথা শুনে শুনে আমার নিজেকে কেমন অপরাধী

বলে মনে হত, আমিই যেন ঠকিয়ে বিষয়ের ভাগ নিচ্ছি এমনি ধারা একটা ধারণা করে দেওয়াতে আমার লোকের কাছে মুখ দেখাতে সঙ্কোচ বোধ হত, বিশেষ করে শিবশঙ্কর আর মাতঙ্গিনীর কাছে। তাই আমি তাঁদের সামনে পড়ে গিয়ে অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু শুনতে পেলাম শিবশঙ্কর মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন—শিশির অমন করে পালাল কেন?

মাতঙ্গিনী বললেন—দুলাল হওয়া অবধি ত ও আর আমার কাছে আসে না। দুলালের হিংসেতে একেবারে ফেটে মরছে। আন্ গাছের বাকল কি ভিন্ গাছে জোড়ে লাগে!

শিবশঙ্কর বললেন—আমি যার ভাবছিলাম যে বুড়ো হয়েছি, কখন আছি কখন নেই, শিশির বড় দাদার মতন কুলচন্দ্রকে দেখবে।

কর্ত্তাগিন্নির এই আলাপ আমার কানে যেতেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। দূর থেকেও মাতঙ্গিনীর গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শুনতে পেলাম—তুমিও যেমন! আপনার ভাই এরাই আজকাল বড় দেখে তা আবার পাতানো ভাই। দুলাল সেই যদি এল, পাঁচ বছর আগে আসতে কি হয়েছিল? তা হলে এই কণ্টক কি রোপণ করতে হত? এখন এ কাঁটা নিজের হাতে রুপে ওপড়ানোই বা যাবে কেমন করে? দুলাল, আমার এল, কিন্তু

সম্পত্তির অর্দ্ধেক নিস্পরের গেয়াসে দিয়ে, বাছা আমার শরিক নিয়ে গরিব হয়ে!

শিবশঙ্কর বোধ হয় চুপ করে গেলেন, তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, বেশী কথা কহিতেন না; অথবা যা বল্‌লেন আমি তা দূর থেকে শুন্‌তে পেলাম না।

সেইদিন থেকে আমার সঙ্কোচ কুণ্ঠা আর একটা কেমন ভয় বেশী হয়ে উঠ্‌ল।

পরদিন স্কুল থেকে এসে শুন্‌লাম শিবশঙ্কর উইল করেছেন, তাতে কুলচন্দ্র সম্পত্তির চোদ্দ আনা পাবে, আর আমি দু-আনা পাব, এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাতঙ্গিনীর আক্ষেপটা শিবশঙ্করের মনে এম্‌নি লেগেছিল যে তিনি তখনই সম্পত্তির বিভাগ ঠিক করে তার পরের দিনই উইল করে ফেল্‌লেন। সেটা তিনি ভালোই করেছিলেন, কারণ তার মাস খানেক পরেই শিবশঙ্কর-বাবু হঠাৎ সন্ন্যাস-রোগে মারা গেলেন।

এই উইল করার সংবাদে আমার মনে বিশেষ কোনো ক্ষোভের উদয় হয়নি, কারণ তখন বয়স আমার বড় জোর পনেরো, তখন বৈষয়িক বুদ্ধি পোক্ত হবার কথা নয়। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমার সব বিষয়ে ভেবে দেখা স্বভাব;—আমি ভেবে এই ঠিক কর্‌লাম যে বাপের বিষয় সবখানিই ত ছেলের পাবার কথা, তা

থেকে আমায় যা দিয়েছেন ঢের দিয়েছেন; আর যদি নাও দিতেন তাতেও অন্যায় হত না, কারণ আমার খাওয়া পরা লেখাপড়া ত বেশ রাজার হালেই চল্‌ছে।

কিন্তু জমিদার সর্‌কারে লোক থাকে অনেক আর হরেক রকমের। তারা সবাই আমার হয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করে দিলে। কর্ত্তার বয়স হয়েছে, কথন্ আছেন কথন্ নেই; কুলচন্দ্র শিশু, সে সাবালগ হয়ে বিষয় বুঝে নিতে অনেক দেরী; সুতরাং সত্ত সত্ত সংসারের কর্ত্তা হবার আমারই সম্ভাবনা দেখে সকলে আমায় বড্ড বেশী রকম দরদ দেখাতে লাগ্‌ল—সকলের 'আহা'র জ্বালায় আমার ত প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল। সকলে আমাকে এইটে বোঝাবারই চেষ্টা কর্‌ছিল যে কর্ত্তা আমার প্রতি একটা ভয়ানক অন্যায় করেছেন, আমাকে ষোলো আনার মালিক হতে ডেকে দু আনা মাত্র দিয়ে প্রবঞ্চনা করা! অন্ততঃ দুলালের সঙ্গে আধা-আধি বখ্‌রা হওয়া উচিত ছিল! আমার মন এক-একবার এইসব দরদীদের 'আহা'র জ্বালায় বিষিয়ে উঠ্‌ত। কিন্তু তখনি আমার মনে পড়্‌ত—আমার এক পয়সা পাবারও অধিকার যেখানে স্বভাবতঃ নেই সেখানে যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট! এই কথাটা ঠিক যে আমার নিজে থেকেই মনে জেগেছিল তা নয়। আমার যিনি মাষ্টারমশায় ছিলেন সেই দেবী-বাবু বড় ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন; কোনো

লোকের পোষ্যপুত্র নেওয়া যে অন্যায়, স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাক্‌লে সমস্ত দেশবাসীদেরই যে নির্ব্বংশের সম্পত্তির উপর অধিকার, স্বাভাবিক উত্তরাধি-কারীদেরও সাবালগ না হওয়া পর্য্যন্ত ভরণপোষণ শিক্ষা ইত্যাদির খরচ বাদে সামান্য পুঁজি ছাড়া সম্পূর্ণ সম্পত্তি আত্মসাৎ করা যে অন্যায়, মেয়ে ও ছেলের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার যে সমান হওয়া উচিত, রাজা থেকে জমিদারেরা পর্য্যন্ত প্রজাদের ন্যাসরক্ষক কর্ম্মচারী ভিন্ন যে প্রভু নয়, পরের উপার্জ্জিত ধনের সুবিধা পেয়ে কারো অলস কর্ম্মকুণ্ঠ বা বিলাসী হবার যে ন্যায্য অধিকার নেই, একজনের আবশ্যকেরও অতিরিক্ত ধন থাক্‌বে আর অনেকের আবশ্যক প্রয়োজনও পূরণ হবে না এমন অসমান ধনসঞ্চার যে সামাজিক ও নৈতিক হিসাবে অন্যায় ও অবৈধ—এমনি সব কথা তিনি আমায় কথায় কথায় প্রায়ই বুঝিয়ে দিতেন। শিবশঙ্কর-বাবু উইল করেছেন শুনে আর আমায় একটু বিমর্ষ দেখে তিনি আমাকে বল্‌লেন—শিশির, এই উইল হওয়াতে কি তুমি দুঃখিত হয়েছ?

দেবী-বাবুকে আমি যেমন ভক্তি কর্‌তাম, ভালো বাস্‌তাম, তেম্‌নি ভয়ও কর্‌তাম, তিনি বড় রাশভারি লোক ছিলেন। তাঁর মুখে ঐ প্রশ্ন শুনে আমি অত্যন্ত লজ্জা অনুভব কর্‌লাম, কিছু বল্‌তে পার্‌লাম না।

তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বল্লেন—পরের দেওয়া অনুগ্রহের চেয়ে নিজের উপার্জ্জনের মর্য্যাদা ঢের বেশী। শিবশঙ্কর-বাবু তোমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এমন কথা কখনো বলেন নি যে সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দেবেন; তিনি পুণ্যলোভে দেবতা প্রতিষ্ঠা, অন্নসত্র স্থাপন বা শিক্ষার জন্য সম্পত্তির চোদ্দ আনা দান করতে পারতেন, দু আনা তোমার জন্যে রাখতে পারতেন। এখন নিজের ছেলেকে চোদ্দ আনা আর তোমাকে দু আনা দেওয়াতে তাঁর কিছুমাত্র অন্যায় হয়েছে বলা যায় না; তুমি গরিবের ছেলে, লটারিতে টাকা জেতার মতন বিনা অধিকারে হঠাৎ যা পেয়ে গেলে তাই তোমার যথেষ্ট মনে করা উচিত। জীবনের সকল অবস্থায়ই ভালো দিকটা দেখে আনন্দিত থাকবে, মানুষের জীবনে দুঃখের চেয়ে সুখ যে ঢের বেশী এ কথা মনে রাখলে কোনো দুঃখই দুঃসহ মনে হবে না, দুঃখ কখনো অভিভূত করতে পারবে না।

দেবী-বাবুর এই উপদেশ আমাকে বাঁচিয়ে দিলে; সেই থেকে এই উপদেশ আমাকে জীবনের অনেক দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করে আসছে। আমার হিতৈষীদের কুপরামর্শ আর আমার মনে দাঁত বসাবার অবকাশ পেলে না।

অধিকন্তু তখন কারো কথা শুনে দুদণ্ড ভাব্‌বারও আমার অবসর ছিল না, আমার সেবার এণ্ট্রান্স এগ্‌জামিন। আমি এগ্‌জামিনের পড়া নিয়েই তখন ব্যস্ত। দেবী-বাবু আমার কাছে গুরুদক্ষিণা চেয়েছেন—আমাকে কম্‌পীট্‌ কর্‌তে হবে।—আমি গুরুদক্ষিণা দেবার জন্যে কায়মনে চেষ্টা কর্‌ছি।

এগ্‌জামিন দিতে জেলায় গেছি, খবর পেলাম শিবশঙ্কর-বাবু হঠাৎ মারা গেছেন। গুরুদশার অশৌচ নিয়েই এগ্‌জামিন দিলাম।

(৬)

নানান বিক্ষেপের মধ্যে এগ্‌জামিন দিয়েছিলাম বলে এগ্‌জামিনে তেমন ভালো ফল হল না, আমি নাইন্‌টিন্‌থ্‌ হলাম; দেবীবাবুর গুরুদক্ষিণা কোনোমতে শোধ হল। তিনি আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন ফাষ্ট´ আর্ট্‌স্‌ পরীক্ষায় আমি যেন আরো ভালো কর্‌তে পারি। আমি ভালো হয়ে পাশ করেছি দেখে তাঁর যে অহেতুক আনন্দ তাঁর গম্ভীর স্বভাবকেও ছাপিয়ে মুখে ফুটে উঠেছিল সেই আমার জীবনের দ্বিতীয় সম্পদ, সেই আমার দ্বিতীয় পাওয়া!—প্রথম পেয়েছিলাম আমার জন্যে ছোট ভাই গাব্‌লার কান্না।

আমি ফাষ্ট´ আর্ট্‌স্‌ পড়্‌তে কল্‌কাতায় চলে এলাম। মা মাতঙ্গিনীর সঙ্গে আমার যেটুকু যোগ ছিল তাও

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমার নিজের মা বাবা ভাই বোনেদের কাছ ছাড়া হয়ে অবধি আমি আর তাঁদের দেখিনি; তারাও আর আমার খোঁজ-খবর নেননি বোধ হয়, অন্ততঃ আমি জানিনে; আমাদের গ্রামের প্রহ্লাদ-বাবুর মৃত্যু হয়েছিল, সুতরাং কোনোদিক দিয়েই আমার সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগ ছিল না। আমার খবরদারিতে নিযুক্ত নব খানসামা আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় এসেছিল; সে বেচারাও হঠাৎ কলেরা হয়ে মারা গেল। মরবার সময় আমার হাতে ধরে বলে গেল আমি যেন তার ছেলে বনমালীকে দেখি, সে যতদূর পড়্‌বে তার পড়ার খরচ যেন আমি জোগাই। মৃত্যুদেবতার সাম্‌নে আমি সেই ভার অঙ্গীকার করেছিলাম, তাই এখনো পালন করছি, বনমালীকে মাসে মাসে যথাসাধ্য সাহায্য করি।

এই রকমে সকলকার সঙ্গবিচ্যুত স্নেহমমতা-বর্জ্জিত নির্ব্বাসিত আমি একলা কল্‌কাতায় দুবচ্ছর পড়ে রইলাম; কলেজের ছুটিতে একবার দিন কয়েকের জন্যে নন্দনপুর গিয়েছিলাম; তারপর আর যাইনি, কেউ ডাকেও নি। মাতঙ্গিনী দেবীর আমার ওপর কেমন একটা সন্দেহ জন্মেছিল—আমার নজর লেগে তাঁর দুলালের অকল্যাণ হবে। এই ভয়ে তিনি তাকে আমার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখ্‌তে চাইতেন। একদিন আমি নিজের ঘরে বসে

ছিলাম, দুলালের চাকর তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিল; আমি চাকরকে ডেকে দুলালকে কোলে করতেই শাবকহারা সিংহীর মতন মাতঙ্গিনী দেবীর গর্জ্জন শোনা গেল—ওরে দুখা, পাজি কাঁহাকা! দুলালকে এখানে নিয়ে আয় শিগ্‌গির!

দুখা তাড়াতাড়ি আমার কোল থেকে দুলালকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

আমি ঘর থেকেই শুন্‌তে পেলাম দুখাকে তিনি চুপ্‌চুপি উপদেশ দিচ্ছেন—দুলালকে কথ্‌খনো শিশিরের কাছে দিস্‌নে—এর মন্দ ও অহরহ কামনা কর্‌ছে, একে সরাতে পার্‌লে ত ওই ষোল আনা বিষয় ভোগ কর্‌তে পাবে!

মাতঙ্গিনীর চুপিচুপি কথাও সিংহ-গর্জ্জনের মতন। আমি সবই শুন্‌লাম, কথাগুলো আমার মর্ম্মান্তিক বাজ্‌ল। আমি তার পরদিনই কল্‌কাতায় চলে এলাম।

ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্‌ এগ্‌জামিন হয়ে গেলে আমাদের ম্যানেজার চিঠি লিখ্‌লেন যে কমিশনার আর ম্যাজিষ্ট্রেট নন্দনপুরে আস্‌ছেন, রাণী মাতঙ্গিনী দেবী তাঁর ছেলের অংশ পৃথক্‌ করে দেবার জন্তে দর্‌খাস্ত করেছিলেন, আমার মোকাবেলাতে তার নিষ্পত্তি হবে। চিঠিখানা পড়ে আমার বোধ হয় অত্যন্ত দুঃখ হয়ে থাক্‌বে, আমি হেসে ফেল্‌লাম; আর এই কথাটাই প্রথম মনে হল

যে একটা জায়গাতেও যেখানে কারো সঙ্গে যোগ ছিল এইবার তাও ঘুচবে।

আমি নন্দনপুরে ফিরে গেলাম। কমিশনার আর ম্যাজিস্ট্রেট এসে তাঁবুতে আছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। পথে দেখলাম আড়াই বছরের দুলাল ম্যানেজারের হাত ধরে থুপ থুপ করে সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। দুলালকে মাতব্বরের মতন চলতে দেখে আমার বড় ভালো লাগল, আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম—আয় ভাই দুলাল, আমি তোকে কোলে করে নিয়ে যাই।

সে গা মোড়া দিয়ে আমার স্পর্শ এড়িয়ে আধো আধো কথায় বললে—তুমি আমায় ছুঁয়ো না......

চট্ করে আমার মনে পড়ে গেল তার মার কথা। আমি অপ্রতিভ হয়ে হাত সরিয়ে নিলাম।

ম্যানেজার বললেন—যাও না রাজাবাবু, দাদা ডাকছেন।

দুলাল বলে উঠল—ও ত দাদা না; ও কেউ না; ও চোর, আমার জমিদারী ও চুরি করে নিয়েছে!

আমি তার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার তখন মুখের অবস্থা কেমন হয়েছিল জানি না, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়েই দুলাল চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ম্যানেজার পেয়াদা পাইক চাকর

দাসী শশব্যস্ত হয়ে তার কান্না থামাবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি হনহন করে এগিয়ে চলে গেলাম।

আমার কেবলি মনে হতে লাগল বাড়ীতে আমার কথা কতখানি আলোচনা হয়ে থাকে যাতে শিশু দুলাল তার কাছে অর্থহীন ঐ নিষ্ঠুর কথাগুলো একেবারে মুখস্থ করে তুলেছে। এতদিন যে কথাগুলো শুধু ক্লেশ দিয়েছে সেই কথা সরল নির্বোধ শিশুর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়ে আমাকে বোধ দিয়ে গেল। যতকাল আমি এই সম্পত্তির অংশ ভোগ করব ততকাল দুলাল ভাববে আমি চোর, তাকে বঞ্চিত করে আমি অনধিকারে সুখভোগ করছি; তার প্রসাদপ্রার্থী খোসামুদেরা সকলেই তার কথায় সায় দেবে! এ আমি সহ্য করব না।

আমি ভাবনায় একেবারে উন্মনা হয়ে একরকম ছুটে আমার একমাত্র বন্ধু দেবীবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেবীবাবুর এক ভাই আমার সমপাঠী ছিল, সেই সম্পর্কে আমি দেবীবাবুর স্ত্রীকে বৌদিদি বলে ডাকতাম। আমি তাঁদের উঠানে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ছুটে রক থেকে নেমে এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে ভয়ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—শিশির, কি হয়েছে ভাই?

আমার মুখচোখ বোধহয় তখন এমন ভাব ধরেছিল যাতে বৌদিদির ভয় লেগে গিয়েছিল। তাঁর স্নেহের স্পর্শ আর সান্ত্বনা পেয়ে আমার মন প্রশান্ত হয়ে উঠল।

আমি একটু হেসে বল্লাম—বিশেষ কিছু নয় বৌদিদি। মাষ্টার-মশায় কোথায়? তাঁর কাছে একটু দরকার আছে।

বৌদিদি বল্লেন—উনি বাগানে কাঠ চেলাচ্ছেন।

দেবী-বাবু নিজের বাড়ীর সব কাজ যতদূর পারতেন সব নিজেই করতেন; বাসন মাজা, জল তোলা, কাঠ কাটা, বাগান তৈরি প্রভৃতি সব কাজই তিনি অসঙ্কোচে তাঁর একমাত্র চাকরের সঙ্গে ভাগ করে করতেন, বল্তেন—আমার কাজ সমস্ত আমারই করা উচিত, চাকর যতখানি করে দ্যায় তার জন্যে সে আমাকে ঋণী আর কৃতজ্ঞ করে তোলে। সে ঋণ শুধু বেতনের অর্থে শোধ হয় না। কাজেই ঋণের বোঝা ভারি করা কারো উচিত নয়।

আমি তাঁর সেই কথা মনে করে অনেকটা শান্তমূর্ত্তিতে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি কুড়ুলখানা মাটিতে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন—কি শিশির, কবে এলে? কেমন এগ্‌জামিন দিলে?

আমি তাঁকে প্রণাম করে বল্লাম—এগ্‌জামিন ভালোই দিয়েছি। আপনার কাছে একটু কাজের জন্যে এসেছিলাম।

দেবী-বাবু কাঠের উপর নিজে বসে তাঁর পাশে আমাকে বসবার জন্যে কাঠের উপর হাত চাপড়ে ইঙ্গিত করে বল্লেন—বোসো। কি কাজ?

আমি বল্‌লাম—কমিশনার আর ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন দুলাল আর আমার সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা করে দিতে। আমি তাঁদের কাছে যাচ্ছি, আপনাকে একটু সঙ্গে যেতে হবে।

তিনি হেসে বল্‌লেন—বৈষয়িক লোকটি ঠাওরেছ ভালো! ভাগবাটোয়ারার অঙ্ক কষ্‌তে পারি বলে যে সম্পত্তি ভাগের বেলাও খুব হুঁশিয়ার হতে পার্‌ব তা ত মনে হয় না।

আমি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে বল্‌লাম—সম্পত্তির ভাগ আমি চাইনে; আমার অংশ আমি লেখাপড়া করে দুলালকে দান কর্‌ব, আমি পরের সম্পত্তি চুরি কর্‌ব না।

দেবী-বাবুর মুখ আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল; তাঁর একমুখ ঘন কালো চাপদাড়ি ভেদ করেও তাঁর মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আমার হাত চেপে ধরে শেক্‌হ্যাণ্ড করে বল্‌লেন—That's like a man!

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তুমি এমন কাজ হঠাৎ কর্‌ছ কেন?

আমি তাঁকে বল্‌লাম যে এ সঙ্কল্প আমার ঠিক হঠাৎ নয়; অনেক দিনের সঞ্চিত নির্ব্বেদ আজ মুক্তির পথ দেখ্‌তে পেয়েছে।

তিনি মাতঙ্গিনীর কথা, দুলালের কথা, সব খুব গম্ভীর হয়ে শুনে বল্‌লেন—'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্!' তাড়া-

তাড়ি কিছু কোরো না, ভেবে দেখো এর পরে যখন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম কর্তে হবে তখন এই impulsive momentএর কাজের জন্যে অনুতাপ আর আফ্‌শোষ হবে কি না।

আমি দৃঢ় স্বরে বল্‌লাম—না, এ আমি অনেক দিন থেকেই ভেবে ঠিক করে রেখেছি।

দেবী-বাবুকে একরকম জেদ করেই আমি সাহেবদের কাছে নিয়ে গেলাম। তাঁরা ত আমার সঙ্কল্প শুনে অবাক্‌! তাঁরা আমাকে hot-headed impulsive young man বলে অনেক বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লেন। ভেবে চিন্তে দেখ্‌বার জন্যে আমায় দুদিন অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌লেন।

আমি ঐ দুদিন সময় পেয়ে টেলিগ্রাম করে জেলা থেকে আমাদের উকিলকে ও জেলার সেরা আরো দুজন উকিলকে ডাকিয়ে এনে এক দানপত্র তৈরি কর্‌লাম, তাতে সাক্ষী হলেন দেবী-বাবু প্রধান। দলিলখানি রেজেষ্টারী করিয়ে একেবারে তৃতীয় দিনে নিয়ে গিয়ে কমিশনার সাহেবকে দিয়ে এলাম। সমস্ত বোঝা নামিয়ে, গঞ্জনার লেঠা একেবারে চুকিয়ে দিয়ে এলাম।

আমি বাড়ীতে ফিরেই মাতঙ্গিনী দেবীর ঘরে গেলাম। তিনি তখন বসে দুলালকে জামা পরাচ্ছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখেই তিনি পুত্রের প্রসাধন অসমাপ্ত

রেখে তাড়াতাড়ি তাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে বল্‌লেন—বিলাসী, ওকে এখান থেকে নিয়ে যা।

বিলাসী দুলালকে কোলে তুল্‌তে গেল; কিন্তু সে বেঁকে দাঁড়িয়ে বল্‌লে জামা না পরে' সে যাবে না।

মাতঙ্গিনী ছেলের পলায়নে আপত্তি দেখে তার বিলম্ব সহ্য করতে না পেরে তার পিঠে কষে' এক চড় লাগিয়ে গর্জ্জন করে উঠ্‌লেন—হতভাগা ছেলে, পালা বল্‌ছি!

আমার গায়েই যেন সেই চড় বাজ্‌ল। আমি বল্‌লাম—আর ভয় নেই মা, আমিই যাচ্ছি চলে, বিদায় নিতে এসেছি।

মাতঙ্গিনী চটে উঠে বল্‌লেন—পরের ধনে পোদ্দারী যার তার আবার অত রাগ কেন? ছেলেমানুষ দুলাল কি একটা কথা বলেছে……

আমি বল্‌লাম—সে কথা ত ছেলেমানুষ দুলালের নয় মা, সে কথা আপনার। তাই ঠিক করেছি পরের ধনে পোদ্দারী আর করব না। আমাকে কর্ত্তা যা-কিছু দিয়েছিলেন তার সমস্তই আমি লেখাপড়া করে দুলালকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি সবচেয়ে পুরোণো একখানা কাপড় আর একটা জামা ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নেবো না। এতকাল এ বাড়ীতে যা খেয়েছি পরেছি তার জন্যে আপনাদের কাছে ঋণের চেয়ে আমার

ক্ষতি ঢের বেশী করেছেন আপনারা আমার মা-বাপের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে·····

মাতঙ্গিনী ভয়ানক রেগে গিয়ে বল্‌লেন—নিমকহারাম বেইমান, তোর মা-বাপের কাছে ত ভারি ইশ্বয্যি ভোগ কর্‌ছিলি, তাই আমরা তোর ক্ষেতি করেছি! আর তোর বাপ কি তোকে অম্‌নি দিয়েছিল? উচ্ছের বিচির মতন পাঁচ হাজার নগদ টাকা গুণে নিয়ে তবে না তোকে বেচে গেছে!

তাঁর সঙ্গে তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন মনে কর্‌লাম; যাঁরা শুধু টাকার ব্যবসা করেন তাঁরা মানুষের মনের ক্ষতি খতিয়ে দেখ্‌তে জানেন না। আমি তাঁকে প্রণাম করে চলে এলাম।

শুধু এক কাপড় আর এক জামা সম্বল করে বেরিয়ে পড়্‌লাম, জুতো পর্য্যন্ত পায়ে দিলাম না। আমার পৈতের সময় আমি ভিক্ষা আর যৌতুক যা পেয়েছিলাম, আর স্কলার্‌শিপ যা নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জন করেছিলাম, তারই গোটা পঞ্চাশেক টাকা, গোটা দুই মোহর আর গোটা চার গিনি আমার কাছে জমা ছিল; সে টাকা আমার নিজের উপার্জ্জন মনে করে' সেইগুলি আমার সঙ্গে নিলাম।

আমি সর্ব্বস্ব ছেড়েছুড়ে এক কাপড়ে জন্মের মতন চলে যাচ্ছি, এ খবর অনেক দূর রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল।

আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েই দেখি চাকর দাসী পেয়াদা পাইক আমলা প্রজা পথের দুধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, সকলের মুখেই একটা বিস্ময়মাখা বিষণ্ণ ভাব, কেউ কেউ বা চোখও মুছছিল। কেউ কেউ বা আমার এই নির্ব্বাসনকে রামচন্দ্রের বনগমনের সঙ্গে তুলনা করে দুঃখ করছিল, কেউ বা এটা গোঁয়ারতুমি মনে করে নিন্দাও করছিল। আমি সকলের কাছে হাসি মুখেই বিদায় নিয়ে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলাম।

যে লোক বাড়ী থেকে এক পা বেরুলে দশজন ছুটে আস্‌ত মাথায় ছাতা ধরতে, দশ পা যেতে হলে যার জন্যে গাড়ী পাল্কী দরকার হত, সে খালি পায়ে একলা সাত মাইল দূরের ষ্টেসনে চলেছে! এই দৃশ্য নিজেরাই বরদাস্ত করতে না পেরেই হোক, কিংবা অদৃশ্য কারো হুকুমেই হোক, বেহারারা ছুটোছুটি একখানা পাল্কী এনে হাজির করলে। আমি হাসিমুখে মিষ্ট কথায় তাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে বললাম—আমার ওতে চড়্‌বার আর অধিকার নেই।

ম্যানেজার বল্‌লেন—তবে না হয় একখানা গোরুর গাড়ী ভাড়া করে দি।

আমি বল্‌লাম—আমার পুঁজি অল্প, তা থেকে বিলাসে খরচ করবার উপায় নেই।

বিলাসী দাসী দৌড়ে এসে বল্‌লে—বড় রাজা বাবু, মা আপনাকে ডাক্‌ছেন।

রাজা-বাবু! পথের পথিক নিরাশ্রয় নিঃসম্বল যে, সে এখনও রাজা-বাবু!' আমার ভারি হাসি পেল। আমি হেসে বললাম—মাকে ত আমি প্রণাম করে বিদায় নিয়ে এসেছি, আর আমার সঙ্গে ত কোনো সম্পর্ক নেই।

বিলাসী বললে—মা বলছেন, আপনার বিছানা বাক্‌স-গুলো নিয়ে যান অন্তত।

আমি বললাম—ওসব ত আমার নয়।

দুখা চাকর দুলালকে কোলে করে' দৌড়ে এল,—বললে—বড় রাজা-বাবু, ছোট রাজা আপনাকে ডাকতে এসেছেন!

দুলাল তার মিষ্টি মুখে ডাকলে—দাদা, তুমি বাড়ী এচো।

আমার মনটা একটু নরম হয়ে উঠল। যে মা ছেলের উপর নজর লাগবার ভয়ে তাকে আমার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে বেড়াতেন, তিনি সেই ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমাকে ডেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে! আমার মনটা চিরকেলে স্নেহের কাঙাল, এই একটু স্নেহের পরিচয়ে একেবারে গলে' গেল। আমি দোমনা হয়ে ফিরি ফিরি করছি, এমন সময় দেবী-বাবু ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে শেকহ্যাণ্ড করে' বললেন—Just like a man, and as its should be!

এই বাহবা আমার দুর্ব্বলতা দূর করে আবার আমায়

বল দিলে। আমি বল্‌লাম—দুলাল ভাই, আমি তোমার মায়ের স্নেহও চুরি করতে থাক্‌ব না।

দেবী-বাবু আমাকে সঙ্গে করে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে কিছু পাথেয় আছে কি না, জিজ্ঞাসা করে' বৌদিদি টাকা দিতে চাইলেন। আমার যথেষ্ট আছে বলে আমি তাঁদের কাছেও বিদায় নিয়ে ষ্টেসনের দিকে রওনা হলাম। দেবী-বাবুর স্ত্রী তাঁর বন্ধু থেকে কিছু না নিইয়ে আমাকে ছাড়লেন না,—তিনি কলাপাতায় মুড়ে, কানিতে বেঁধে, পথের জন্য কিছু খাবার আমার পাথেয় দিলেন।

আমার যাওয়ার খবর খুবই ছড়িয়ে পড়েছিল—নন্দনপুর থেকে ষ্টেসন পর্য্যন্ত সাত মাইল পথের ধারে ধারে বরাবর জনতা; কত লোক যে তার গাড়ী নিয়ে এসে আমায় সাধ্‌ছিল সেই গাড়ীতে ষ্টেসনে পৌঁছে দেবার জন্যে তার আর ঠিক নেই; গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলে বৌঝিরা পর্য্যন্ত এসে আমায় প্রণাম করে করে পায়ের ধূলো নিচ্ছিল, তাদের কান্না দেখে আমার এমন আনন্দ হচ্ছিল যে বল্‌তে পারিনে। মনে হচ্ছিল মানুষের স্বাভাবিক মহত্ত্বের কথা—যার সঙ্গে পরিচয় নেই তার দুঃখ কল্পনা করে নিয়ে যারা চোখের জল ফেল্‌তে পারে তারা মহৎ নয় ত কি? এই যে পথে পথে সমবেদনা সহানুভূতি অনুকম্পা প্রচুর পেয়ে এসেছি তাই আমার জীবনের

পরম পাথেয় হয়ে রয়েছে; ঐসব লোক যাদের আমরা ছোটলোক বলি তারা নিজেদের চোখের জলে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে আমাকে শুষ্কতা আর রিক্ততা থেকে বাঁচিয়েছে। আমার মনের মধ্যে যে মানববিদ্বেষ জমে উঠছিল তা দেবী-বাবুরা স্ত্রীপুরুষে কতকটা, আর পথের বন্ধু এই অপরিচিতেরা তার অনেকখানি দূর করে দিয়ে আমায় রক্ষা করেছে।

পথে মুষলধারে বৃষ্টি এল। আমার সঙ্গে সঙ্গে কত লোক ভিজে ভিজে চলেছে। ঝড়ের ঝাপটায় গাছের ডালপালা মাথা কুটে হাত পা আছড়ে আপসে আপসে কেঁদে উঠছে, আর লোকেরা বলছে আমার দুঃখে দেবতার চোখের জল পড়ছে, বুক ভেঙে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে। মানুষের মনের মধ্যে যে-দেবতা বাস করেন এই কল্পনা তিনিই তাদের দিয়ে করাচ্ছিলেন, এই ভেবে আমার মন মানব-দেবতার প্রতি ভক্তিতে প্রণত হয়ে পড়ছিল।

পথে ভিজে কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে যাবার জন্যেও কত লোকের কত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। দুলালের জমিদারীর ডিহির তহশীলদারেরা পর্য্যন্ত আমার একটু সেবা করবার জন্যে আগ্রহে উন্মুখ। সুতরাং সাত মাইল পথ আমি অক্লেশে অতিক্রম করে ষ্টেসনে পৌঁছালাম।

ষ্টেসনে গিয়েও নিস্তার নেই। আমার শত নিষেধ সত্ত্বেও আমার সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক লোক ষ্টেসন পর্য্যন্ত

এসেছিল ; এই ভিড় দেখে ষ্টেসনের যাত্রী কর্ম্মচারী সবাই আমারই চারিদিকে জড়ো হয়ে উঠল। ষ্টেসনমাষ্টার এসে সসম্ভ্রমে জানালেন দুলালের ম্যানেজার টেলিগ্রাম করে এক কামরা ফার্ষ্ট ক্লাশ রিজার্ভ করেছেন আমার যাবার জন্যে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একখানি থার্ডক্লাশের টিকিট কিনে কল্‌কাতা রওনা হলাম।

কল্‌কাতায় এসেও নিস্তার নেই ; গাড়ী থেকে নেমেই দেখি দুলালের কল্‌কাতার বাড়ীর সরকার আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে, ম্যানেজার-বাবু তাকে তার করেছিলেন। আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু মাতঙ্গিনী দেবীর আর ম্যানেজারের এই সহৃদয়তা আমার মনের উপর যেন অমৃত-প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল।

কল্‌কাতায় এসে আমি বড়বাজারে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিলাম ; বিনা খরচে থাকা হল, খাওয়াটা একবেলা হোটেলে আর একবেলা মুড়ি-টুড়ি কিনে এনে নির্ব্বাহ হতে লাগ্‌ল। সেইখানে থাক্‌তে থাক্‌তেই লোকের বাড়ীতে-বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগ্‌লাম কোথাও কেউ আমায় কিছু কাজ দিতে পারে কি না—মাষ্টারী হোক, সর্‌কারী হোক, বেহারা খান্‌সামার কাজই হোক। এমন দরিদ্রবেশী যে লেখাপড়া জানে তা বিশ্বাস কর্‌তে না পেরে কেউ শিক্ষকতায় নিযুক্ত কর্‍লে না ; অচেনা লোককে টাকা-পয়সার কাজ সর্‌কারীও কেউ দিতে

চায় না; বেহারা খান্‌সামার কাজে বাড়ীতে ঠাঁই দিতেও কেউ সাহস করে না।

চেহারাটা ভদ্ররকমের অথচ বেশে দরিদ্র দেখে লোকের সন্দেহ আর অবিশ্বাস প্রবল হত। আর সন্দেহ আর অবিশ্বাস করা যাদের ব্যবসা সেই পুলিশের নজর পড়্‌ল বেকার আমার উপর। আমাকে অসহায় বিপন্ন দেখে একজন মাড়োয়ারী তাঁর ছেলেকে পড়াবার কাজে আমাকে নিযুক্ত করলেন, মাইনে মাসে পাঁচ টাকা। বেকার নাম ঘুচ্‌ল, কিন্তু আমার অভাব ঘোচাবার মতন কিছু হল না।

তার পর এগ্‌জামিনের ফল বেরুলো, আমি পনেরো টাকা স্কলার্‌শিপ পেয়েছি। যা স্কলার্‌শিপ পাব তাইতেই আমি কোনো রকমে পড়া চালাতে পার্‌ব ভেবে আনন্দিত হলাম। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করেছিলাম, কিন্তু সেখানে আর পড়া চল্‌ল না, কারণ ঐ কলেজে মাইনে হিসাবে স্কলার্‌শিপ থেকে টাকা কেটে নেয়। আমি সেকেণ্ড হয়েছি জেনেই অন্য সকল কলেজে আমার সমাদরের অভাব হবে না জান্‌তাম; আমি এই কলেজে ভর্ত্তি হলাম। তার পর সস্তার মেস খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে কালিদাসের মেসে তাদের অকেজো পোড়ো ঘরখানা খুব সস্তায় পেয়ে বর্ত্তে গেলাম। আমি ফার্ষ্ট আর্ট্‌সে স্কলার্‌শিপ পেয়েছি, এই পরিচয়ে গৃহশিক্ষকের কাজও খুব শিগ্‌গির জুটে গেল।

বুঝতে পারলাম ভাগ্যদেবী আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হতে স্থরু করেছেন।

মেসে ভর্ত্তি হতেই কালিদাসের মতন বন্ধু লাভ হয়ে গেল; সেই আমার পরম সৌভাগ্যের সূচনা। তার দ্বারাই রজতকে লাভ করলাম ভাইএর মতন বন্ধু; আশৈশব মা-ছোড় আবার মা পেল; এক বৌদিদির স্নেহ মনের সম্পুটে সযত্নে রেখে দিয়েছি, তার সঙ্গে যোগ হবে আর-এক বৌদিদির অপার অকপট স্নেহমমতা। আমার মতন দীনের সকল রিক্ততা পূর্ণ হয়ে উঠেছে, অভাজনের চরম সৌভাগ্য উদয় হয়েছে। আমার মনে ক্লেশ যদিও কিছু ছিল না, কিন্তু আনন্দও ছিল না; এখন মা ভাই বোন সবার অভাব পূর্ণ হওয়াতে আমার মন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়ে গেছে।

সাত

শিশির তার অল্পদিনের জীবনের সুদীর্ঘ কাহিনী শেষ করিয়া চুপ করিয়া বসিল। ঘরের মধ্যে আর শব্দ নাই, শ্রোতারা সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। এই যুবকের শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া বারবার বঞ্চিত হওয়ার করুণ কাহিনী, স্বার্থশূন্য ত্যাগে-মহান বলিষ্ঠ চরিত্র, শ্রোতাদের মন করুণায় মমতায় সম্ভ্রমে ভরিয়া তুলিয়াছিল।

এই যে ভীষ্মের ন্যায় ত্যাগী যুবার স্বেচ্ছা-বৃত দারিদ্র্য তা মহৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল; এই কৃচ্ছ্রব্রতী কঠোর তপস্বীর তপোনিষ্ঠা অপরিমেয় মাধুর্য্যে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অসাধারণ ব্যক্তির কাছে কোনোরূপ বাচালতা যেন অশোভন, এই ভাবিয়াই ঘরের তিনজন শ্রোতার মধ্যে একজনেরও মুখে কথা সরিতেছিল না। সকলকে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শিশিরই হাসিয়া সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—রাত ঢের হয়েছে, দশটা বেজে গেছে বোধ হয়, আমি এখন যাই মা।

সুনয়নী গলার কাছে জমা কান্না হইতে ছাঁকিয়া তুলিয়া দুটি কথা মাত্র বলিতে পারিলেন—এস বাবা।

শিশির হাসিমুখে সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া বলিল—আজ ত পড়া পণ্ড হয়ে গেল বৌদিদি, কাল এর শোধ তোলা যাবে।

সন্ধ্যা কান্না-ধরা গলায় মৃদু স্বরে বলিল—কাল ত শনিবার, কালকে আমার গান-বাজনা শেখবার দিন। তবে বিদ্যুৎ আসবার আগে একটু সকাল-সকাল পড়ে নিলে হয়।

এতক্ষণে রজত কথা বলিতে পারিল। সে বলিল—বিদ্যুৎ তোমার আসবে ছটার সময়; শিশির চারটের সময় কলেজ থেকে এসে তোমায় পড়িয়ে দেবে; তার পর আমাদের সঙ্গতে শিশিরকে নিয়ে যাব।

শিশির হাসিয়া বলিল—রজত, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি মার কোলে কেবল সবে পাঁচদিন হল জন্ম নিয়েছি, তোমাদের সংসারের সব-কিছুর সঙ্গে পরিচয় আমার হয়নি। সুতরাং আমাকে বুঝিয়ে বলা দরকার বিদ্যুৎটিই বা কে, আর সঙ্গত ব্যাপারটাই বা কি ?'

এইবার সকলের মুখে হাসি ফুটিল। সন্ধ্যা বলিল—বিদ্যুৎ আমাকে গান বাজনা শেখায়, আমরা এক সঙ্গে লরেটো স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেছিলাম; সে এখন ডায়োসিসান কলেজে থার্ড ইয়ার ক্লাশে পড়ে।

রজত হাসিয়া বলিল—আর সঙ্গত মানে, প্রত্যেক শনিবারে আমার এখানে কয়েকজন বন্ধু ও সাহিত্য-সুহৃদের সমাগম হয়, সেই দিন পালা করে এক এক জনের রচনা পড়া হয় ও তার দোষ গুণ আলোচনা হয়। 'সংগ্রহ' কাগজের সম্পাদক ভূধর-বাবু এই সঙ্গতের সভাপতি আর আমি এর সম্পাদক। তোমাকে এর সভ্য করে নেব।

শিশির হাসিয়া বলিল—সভ্য হবার নিয়মটা কি আগে শুনি।

রজত বলিল—ভয় পাবার বিশেষ কিছু নেই; বছরে অন্তত তিন অধিবেশনে সভাকে কিছু স্বকীয় রচনা পাঠ করতে হয় এই মাত্র সর্ত্ত।

শিশির ভয়ের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল—ওরে বাবা! ভয় পাবার যথেষ্ট কারণই রয়েছে! যে স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ছাড়া Essay লেখেনি, সে কোন্ সঙ্গতি নিয়ে সঙ্গতে ভিড়বে?

সন্ধ্যা একটু অনুকম্পামিশ্র গর্ব্বিত স্বরে বলিল—আপনি বুঝি কিছু লিখতে পারেন না? উনি ত ছেলেবেলা থেকেই লিখছেন মা বলেন। যত ছাপা হয়েছে, তার ঢের বেশী উনি ফেলে রেখেছেন। সেগুলোও বেশ ভালো কিন্তু, আপনাকে আমি একদিন দেখাব।

রজত খুশী হইয়া বলিল—দেখ সন্ধ্যা, নিজের মুখে অর্দ্ধাঙ্গের প্রশংসা শিশিরের কানে আত্মপ্রশংসা বলে ঠেকতে পারে। তোমার স্বামীর লেখা যে তোমার কাছে খুব ভালো লাগে তা শিশিরকে না বললেও সে বুঝতে পারে; কিন্তু তার উল্লেখ করে শিশিরের সঙ্গে তুলনায় ওকে লজ্জা দেওয়া তোমার উচিত নয়।

সন্ধ্যা অপ্রতিভ হইয়া গেল। বাস্তবিক সে স্বামী-সৌভাগ্যের গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া তুলনায় সমালোচনা করিয়া অত্যন্ত অশোভন গর্হিত কাজ করিয়াছে। সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল।

শিশির সন্ধ্যাকে লজ্জা পাইতে দেখিয়া তার লজ্জা মোচনের জন্য বলিল—রজতের লেখা যে শুধু একা

সন্ধ্যারই ভালো লাগে তা নয়, বাংলা-দেশের মাসিক-পত্র-পাঠক সকলেই রজত-রায়ের নাম জানে, আর তার লেখা পড়্বার জন্যে আগ্রহে সংগ্রহ করিবার অপেক্ষায় থাকে।

সন্ধ্যা শিশিরের কথা শুনিয়া খুসী হইয়া লজ্জিত দৃষ্টিতে আনন্দভরা তিরস্কার হানিয়া রজতের দিকে চাহিল। ভাবটা যেন বলিতে চায়—কেমন জব্দ! তবু কি আমার ভালো লাগে নাকি!

রজত আত্মপ্রশংসায় তুষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিল।

সুনয়নী পুত্রগর্ব্বে উল্লসিত হইয়া হাসিতে হাসিতে শিশিরের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—তোদের ঝগ্ড়া এখন ধামা চাপা থাক, কাল আবার ঝগ্ড়া করিস। এখন আয় গিয়ে, ঢের রাত হয়েছে। তা এত রাত্রে আর বাড়ী যাবি কেন শিশির? এখানেই থাক্ না।

সুনয়নী শিশিরকে এই প্রথম তুই বলিয়া সম্বোধন করিলেন; এই স্নেহের প্রগাঢ়তা শিশিরকে অভিভূত করিয়া তুলিল। সে প্রণাম করিয়া সুনয়নীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—না মা, আমি বাসাতেই যাই।

শিশিরকে প্রণাম করিতে দেখিয়া সুনয়নী হাসিয়া বলিলেন—তুই দিনে কতবার করে প্রণাম কর্‌বি শিশির?

শিশির গাঢ় স্বরে বলিল—যে পায়ের ওপর মাথা লুটিয়ে রাখ্‌তে ইচ্ছে করে সেখানে ......

সুনয়নী বাধা দিয়া বলিলেন—আচ্ছা আচ্ছা, তুই এখন আয় গিয়ে।

শিশির মনভরা আনন্দ লইয়া হাসিমুখে প্রস্থান করিল।

এই দুই পক্ষের প্রত্যেকেই অপরকে অসাধারণ ও অসামান্য ভাবিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর অধিক অর্পণ করিতেছিল। সুনয়নী ও সন্ধ্যা শিশিরকে মহা-প্রাণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিতেছিল; শিশির ইঁহাদের করুণার্দ্র মমতাপ্রবণ চিত্তের কাছে বশ মানিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছিল।

কেবল রজতের ভাব ছিল একটু ভিন্ন প্রকারের। সে ধনী, আবশ্যকেরও অতিরিক্ত তার অর্থ। তার একজন দরিদ্র সমপাঠীকে সে সাহায্য করিতেছে এই গর্ব্ব তার মনে প্রচ্ছন্ন ছিল। সে তার সমপাঠী সকলকার থেকে স্বতন্ত্র ও প্রধান—এ বোধ তার মনে উগ্র হইয়া না থাকিলেও বেশ প্রবল হইয়াই ছিল। খগেন প্রভৃতি আরো অনেক ধনী ছাত্র তাদের ক্লাশে আছে, কিন্তু তারা কেউ তার মতন ফিটফাট ছিমছাম নয়; এবং তারা সকলেই তার খোসামুদে অনুচর মাত্র। যারা গরিব ছাত্র আছে তাদের মধ্যে পূর্ণ প্রভৃতি কেউ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলেও সাজসজ্জায় তারা তার সমকক্ষ নয়, হেম প্রভৃতি ত ময়লা অপরিষ্কার জামাকাপড় পরিয়াই থাকে; তারাও সকলেই তার স্তাবক ও প্রশংসায় আর সম্ভ্রমে তটস্থ। অন্য দিক দিয়াও রজত নিজেকে অপর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিত,—তার মতন রচনা-শক্তির পরিচয় তার বয়সে বাংলা দেশে দু-একজন অতি প্রসিদ্ধ লেখক ছাড়া আর কেউ দিয়াছে বলিয়া জানা নাই, দেশের মধ্যে সবচেয়ে নামজাদা দু'দে সমালোচক সংগ্রহ কাগজে তার লেখা ছাপা হয়, এই কৃতিত্বের গর্ব্বও বড় একটা কম নয়। সে দেখিত ক্লাশের সব ছেলে তাকে কেন্দ্র করিয়া ঘিরিয়া বসিয়া বা কলেজের বারান্দায় সঙ্গে সঙ্গে উপগ্রহের ন্যায় টহলাইয়া দেশবিদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তার মৌলিক মতামত অবাক হইয়া শোনে; তারা যে-সব লেখকের নামও কখনো শোনে নাই, সেইসব অতি দূর দেশের আধুনিকতম লেখকদের রচনার পরিচয় ও সমালোচনা যখন সে তার বিস্মিত বন্ধুদের সমক্ষে উপস্থিত করে তখন সে স্পষ্টই অনুভব করে সে তাদের চেয়ে কতখানি শ্রেষ্ঠ। পোল্যাণ্ডের কোন্ লেখকের কোন্ উপন্যাস সেবার নোবেল প্রাইজ পাইল, নরওয়ের কোন্ নাটক-কার আধুনিক সামাজিক প্রশ্নগুলাকে কেমন ভুলো-ধোনা করিতেছে আর আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যের মর্য্যাদা

সূতগ্রন্থি অথবা চীন-জাপানের প্রাচীন চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে ভারতীয় প্রভাব কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এইসব অন্যের অপরিজ্ঞাত নব নব তত্ত্ব যখন সে বিলাতী ম্যাগাজিন ও এন্‌সাইক্লোপীডিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া টাট্‌কা টাট্‌কা প্রচার করিত তখন তার বন্ধুদের সরব নীরব প্রশংসা তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই রাখিত না। তারপর যখন সে শিশিরের পরিচয় পাইল, তখন এই নিঃস্ব সমপাঠীকে বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ও দারিদ্র্যব্রতের কঠোর নিষ্ঠায় নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেখিয়া তার উপর জয়ী হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রজতের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। যার যেখানে অভাব সেই দিক দিয়া তাকে আক্রমণ করিয়া জয় করিবার একটা সহজ বুদ্ধি রজতের স্বভাবগত হইয়া গিয়াছিল। সে তাই চট করিয়া শিশিরের অভাব মোচনের চেষ্টায় লাগিয়া গেল, এবং অতি সহজে কৃতকার্য্য হইয়া সে আবার নিজের শ্রেষ্ঠত্বে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন আবার শিশিরের জীবনের ইতিহাস শুনিয়া তার ত্যাগের মাহাত্ম্যের কাছে রজত আপনাকে খর্ব্ব অনুভব করিতেছিল; কিন্তু সহজেই সে সেই খর্ব্বতার গ্লানি হইতে উত্তীর্ণ হইল এই মনে করিয়া যে সে এই আত্মম্ভরী আত্মনির্ভরপরায়ণ শিশিরকে তার কাছে দান গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে; শিশির

পরীক্ষায় স্কলারশিপ লইয়া উত্তীর্ণ হইলেও সাহিত্যরসবোধে ও সাহিত্য-সৃষ্টির দক্ষতায় রজতের চেয়ে সে নিকৃষ্ট। অতএব শিশিরের প্রতি রজতের মনের ভাবে প্রীতির চেয়ে অনুকম্পাই অনেক বেশী মিশ্রিত হইয়া রহিল।

আট

আজ শনিবার। সন্ধ্যার সময় বিদ্যুৎ সন্ধ্যাকে গান-বাজনা শিখাইতে আসিবে, সন্ধ্যার পর রজতের সঙ্গত বসিবে। তাই শিশির সকাল-সকাল আসিয়া জলখাইয়া সন্ধ্যাকে পড়াইতে বসিয়াছে। খানিকক্ষণ পড়ানোর পর শিশির বলিল—কই বৌদিদি, রজতের লেখা দেখাবেন বলেছিলেন যে?

সন্ধ্যা লজ্জিত হইয়া বলিল—না, আপনারা আমাকে খালি খালি ঠাট্টা করেন! ভালো জিনিস ভালো লাগ্‌লেও আপনাদের কাছে ভালো বল্‌বার জো নেই।

শিশির হাসিয়া বলিল—ঠাট্টা ত আপনাকে আমি করিনি।

সন্ধ্যা শিশিরের কথায় আশ্বস্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে রজতের লেখা আনিতে চলিয়া গেল।

শিশির একলা ঘরে বসিয়া আছে, ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল সন্ধ্যারই সমবয়সী একটি তন্বী তরুণী;

সে যেন একটি রজনীগন্ধা-ফুলের কুঁড়ি, যেন একটি মোমবাতির শিখা,—তেমনই সুন্দর, তেমনই উজ্জ্বল, তেমনই নিটোল ঋজু কমনীয়! তার মুখ চোখ দিয়া বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ছটা বিকীর্ণ হইতেছে, তার সাদাসিধা বেশভূষায় রুচিসঙ্গত শ্রী, প্রতিমার অঙ্গে রাংতার সাজের মতন ঝলমল করিতেছে। তার পরণে একখানি শাদা শাড়ী, শাদা জামা, শাদা জুতো,—শামাদানের আলোর উপর কাঁচের ফানুষের মতন সেই সামান্য শুভ্র বেশই তার রূপজ্যোতিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিল। কুঞ্চিত ঘন কালো চুলের ঝারা ঢল্‌কো করিয়া,কপাল ও কানের অনেকখানি ঢাকিয়া, এলো খোঁপায় বাঁধা; ভ্রূ দুটি ডাগর টানা ভাসা চোখের উপর উড়ন্ত চিলের ছবির মতন, তারই ভয়ে শফরীর ন্যায় চোখ দুটি সদা চঞ্চল; কুটিলাগ্র দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি সেই সুন্দর মুখের দীপ্ত রঙের মধ্যে কালোর আঁজি কাটিয়া মুখখানিকে রমণীয়তর করিয়া তুলিয়াছিল। তার অঙ্গে অলঙ্কার মাত্র পাঁচটি, কিন্তু সেই পাঁচটিও অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষুদ্র—তার বাঁকা সিঁথির পাশে মাথার কাপড় আট্‌কাইবার জন্য চুলের সঙ্গে আট্‌কানো আছে ছোট্ট একটি পাথর-বসানো ফুল, কানের পাতায় চুলের আড়াল থেকে চিক্‌চিক্ করিতেছে দুটি হীরার টোপ, গলায় এক ছড়া মোহনমালা, বাঁ কাঁধে কাপড় আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে একটি মিনা-করা ব্রুচ, দু হাতের মণিবন্ধে দু গাছি মাত্র চুড়ি,

আর বাম বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া দুলিতেছে লিলি-পুট শিশুদের খেলিবার মতন ছোট্ট একরত্তি ঘড়ী! আর তার সবচেয়ে বড় অলঙ্কার তার মুখে বিদ্যুৎ-বিকাশের মতন হাসি!

সেই তরুণীটিকে দেখিয়াই শিশিরের চিনিতে বাকি থাকিল না যে এই বিদ্যুৎ। হাঁ, এ বিদ্যুৎ বটে!—বিদ্যুৎফলকের মতন উজ্জ্বল শুভ্র তার রূপজ্যোতি, তেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি ঝক্‌ঝকে, তেমনি বুঝি মারাত্মকও! নতুবা তাকে দেখিবামাত্র শিশির বেচারী বুকের মধ্যে একটা প্রবল ধাক্কা অনুভব করিল কেন—যেন বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রবল আঘাত!

শিশির দৃষ্টি ভরিয়া প্রশংসা তুলিয়া তার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া বিদ্যুৎ লজ্জাভরা মৃদুহাসি পাত্‌লা রাঙা ঠোঁট দুখানিতে মাথাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সন্ধ্যা কৈ?

শিশির দেখিল সেই সুন্দরীর দাঁতগুলি কী সুন্দর!—মণিদর্পণের মতন চক্‌চকে, মুক্তামালার মতন সাজানো! সুন্দরীর দুটি কথা অমৃতবিন্দুর মতন সুমধুর, কবিতার মতন ছন্দোময়ী, গানের মতন সুরে বাঁধা! শিশির সেই কথার স্পর্শে চেতনা পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি বসুন, বৌদিদি আস্‌ছেন।

বিদ্যুৎ অসঙ্কোচে অগ্রসর হইয়া আসিয়া একখানি

কোচে বসিয়া সে তখন হাসিতেছিল না, কিন্তু অস্তগত সূর্য্যের পরাবর্ত্তিত দীপ্তি যেমন সন্ধ্যার আকাশে লিপ্ত হইয়া থাকে, তেম্‌নি একটি হাসির আভা বিদ্যুতের চোখে মুখে জ্বলজ্বল করিতেছিল।

শিশির নিজের আসনে বসিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—আপনি বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ চোখে মুখে হাসি চল্‌কাইয়া লজ্জানম্র স্বরে বলিল—হ্যাঁ। আপনি ত আমার পরিচয় পেয়েছেন দেখ্‌ছি; আপনার পরিচয় পাবার সৌভাগ্য আমার কিন্তু হয়নি।

এই সাহসিকা সুন্দরীর প্রগল্‌ভ বচন-বিন্যাস শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া শিশির নিজের পরিচয়টাকে অল্প কথায় গুছাইয়া লইয়া বলিতে যাইতেছে, পিছন হইতে সন্ধ্যার স্বর শোনা গেল—উনি আমার শিশির-ঠাকুরপো।

সন্ধ্যা ঘরের মাঝখানে আসিয়া বিদ্যুতের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই আমার মাষ্টারনী, উনি আমার মাষ্টার!

বিদ্যুৎ সন্ধ্যার দিকে কটাক্ষে তিরস্কার হানিয়া চকিতে আড়চোখে একবার শিশিরকে দেখিয়া লইল।

সন্ধ্যা হাসিতে হাসিতে বিদ্যুতের তিরস্কারের জবাব দিল—আমি তা ভেবে বলিনি ভাই; কিন্তু তোর মনে যে-অর্থ আপনি জেগেছে, তা যদি কখনো সত্যিসত্যি ঘটে ওঠে তবে তার চেয়ে আমাদের সকলের সুখের ব্যাপার আর কিছু হবে না।

শিশির বিদ্যুৎকে লজ্জা পাইতে দেখিয়া সন্ধ্যাকে বলিল —বৌদিদি, আপনার পাততাড়ি নামান, দেখি।

সন্ধ্যা বলিল—আজ আর কাল ওসব থাক, এ দুদিন এসবের চেয়ে ভালো জিনিস দেখ্‌তেই আপনার চোখ ব্যস্ত থাক্‌বে।

বলিতে বলিতে সন্ধ্যা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

শিশির সেই আনন্দপ্রতিমার কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হাসি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল।

বিদ্যুৎ মৃদুস্বরে ভৎর্সনা করিয়া বলিল—আ মর্, অত হাস্‌ছিস্ কেন?

সন্ধ্যা কৃত্রিম বিরক্তি মুখে ফুটাইয়া বিদ্যুতের দিকে ফিরিয়া বলিল—তুই বল্ না ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা, কেমন না হেসে থাক্‌তে পারিস্ দেখি।

বিদ্যুৎ হাসিয়া খুব চুপিচুপি বলিল—আমি কেন খামখা তোর ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা বল্‌তে গেলাম।

সন্ধ্যা ঠোঁট উল্টাইয়া চেঁচাইয়া বলিল—ইস্! নিজেই কারো মধ্যস্থতার অপেক্ষা না রেখে আলাপের সূত্রপাত করে এখন বড্ড যে বিরাগ দেখানো হচ্ছে! জানি লো জানি, মনের ভাবটাকে উল্টেই দেখাতে হয়। ও লোকটি বড় সোজা নয়, এক দণ্ডে এমন আপনার করতে পারে!

শিশির বলিল এটা ঠিক কথা হল না বৌদি। আমি নিজে থেকে কাউকে আপনার করতে কখনো শিখিনি; যদি কেউ আপনার করে নেয়, তবে তার আপনার হতে পারি। আপনারা আমায় আপনারি করে নিয়েছেন......

সন্ধ্যা বিদ্যুতের পাশে বসিয়া-পড়িয়া কানে কানে বলিল—ঠাকুরপো বেচারা আমাদের বেনামীতে যে দরখাস্তটা তোর কাছে পেশ করছে মঞ্জুর করে' ফ্যাল্।

বিদ্যুৎ গম্ভীর মুখে অন্যদিকে চাহিয়া সন্ধ্যাকে এক চিম্‌টি কাটিয়া দিল। সন্ধ্যা "উঃ!" করিয়া চেঁচাইয়া লাফাইয়া উঠিল।

শিশির হাসিয়া বলিল—ওটা কি বিদ্যুতের shock ?

বিদ্যুৎ লজ্জিত হইয়া সন্ধ্যার হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের পাশে বসাইয়া চুপিচুপি বলিল—তুই তোর ঠাকুরপোকে নিয়ে রঙ্গ কর্, আমি চল্‌লাম।

সন্ধ্যা বিদ্যুতের মুখের কাছ হইতে কান সরাইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—না না, যাবি কি! ঠাকুরপো তোর গান শুন্‌বেন বলে বসে আছেন। চ, পিয়ানোতে।

সন্ধ্যা বিদ্যুৎকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পিয়ানোর সাম্‌নে টুলে বসাইয়া দিল।

শিশির বলিল—বৌদিদি, আপনার গানও ত শোনা হয়নি।

সন্ধ্যা বলিল—আমি ত রোজ আছি; অন্যদিন শোনাব। শনি রোব দুদিন বিদ্যুতের পালা।

বিদ্যুৎ পিয়ানোতে সুর তুলিয়া সন্ধ্যাকে বলিল—তুইও আমার সঙ্গে ধর্ না।

সন্ধ্যা বলিল—না, তুই একাই গা; আমার গলা যোগ ঠাকুরপোর মনের first impression আমি মাটি তে চাইনে।

বিদ্যুৎ আবার কটাক্ষে তিরস্কার করিয়া গান ধরিল —"গীত-সুধার তরে চিত্ত পিপাসিত রে!"

শিশিরও ভালো গাহিতে বাজাইতে পারিত। সে নন্দনপুরে গেলে শিবশঙ্কর-বাবু তাকে গানবাজ্না শিখাইবার জন্য দুজন ভালো ওস্তাদ রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেই চর্চ্চা সে নন্দনপুর ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাখিয়াছিল। সে দেখিল বিদ্যুৎ শুধু স্ত্রীকণ্ঠের স্বাভাবিক মাধুর্য্যেই ঐশ্বর্য্যময়ী নয়, সে সঙ্গীতশাস্ত্র রীতিমত করিয়া শিখিয়াছে, তার গান তানমানলয়ে বিশুদ্ধ, মাধুর্য্যে অনুপম। বিদ্যুৎ গান শেষ করিলে শিশির বলিল—আপনার গান অতি চমৎকার! সে শুধু স্ত্রীকণ্ঠ বলে নয়, আপনার কণ্ঠে শিক্ষার পরিচয় পেয়েছি।

বিদ্যুৎ বলিল—আমার মা খুব ভালো গাইতে বাজাতে পারেন, তিনি ছেলেবেলায় ওস্তাদের কাছে শিখেছিলেন। আমি মার কাছে শিখেছি।

সন্ধ্যা হাসিতে হাসিতে বলিল—বিদ্যুৎ খুব ভালো নাচ্‌তেও পারে ঠাকুরপো !

বিদ্যুৎ আবার কটাক্ষে সন্ধ্যাকে তিরস্কার করিয়া লজ্জিত মুখ নত করিল।

শিশির বলিল—নাচ্‌তে জানাটা বিদ্রূপ বা লজ্জার বিষয় নয়। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে নাচ্‌তে জানাটাও [illegible]র অঙ্গ ছিল। এখন ঐ সুন্দর বিদ্যাটা অপ্রচলিত হয়ে দেশের আনন্দকে উল্লাসে উদ্গত হয়ে উঠ্‌তে বাধা দিচ্ছে। তার ফলে দেশের প্রাণ মুহ্যমান হয়ে পড়ছে। আতিশয্যই আনন্দের প্রাণ। আমাদের দেশ ছাড়া আর সকল দেশেই নাচ আনন্দ ও উৎসবের অঙ্গ হয়েই আছে।……আপনি আর-একটা গান করুন, আমি সঙ্গে সঙ্গে বেহালা কি এস্‌রাজে সুর দি।

সন্ধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—আপনার সঙ্গীত-বিদ্যাও জানা আছে! এ খবর ত আমাদের এতদিন জানেনি! ছাখ্ ভাই বিদ্যুৎ, এই surpriseটা তোর জন্যে মজুত রেখেছিলেন।

বিদ্যুৎ আবার কটাক্ষে বিদ্যুৎ হানিয়া চকিতে একবার শিশিরকে দেখিয়া লইল। বিদ্যুতের চোখদুটিতে তখন উষার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শিশির লজ্জিত হাস্যে বলিল—এ বিদ্যাটা প্রকাশ পায়নি, অবসর হয়নি বলে; এখন অবসর পেয়ে প্রকাশ

হল। কিন্তু আমার বাজনা শুনেই আপনাদের মনে হবে—
তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।'

সন্ধ্যা বেহালা আনিয়া শিশিরের হাতে দিয়া বলিল—আচ্ছা এখন বিনয় রেখে বিদ্যের পরিচয়টা দেখান্।

বিদ্যুৎ পিয়ানোয় সুর দিতে লাগিল, শিশির তার সঙ্গে বেহালা মিলাইয়া সুর বাঁধিয়া লইয়া বিদ্যুতের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুৎ আবার গান ধরিল—

'বৈরাগ-যোগ কঠিন উধো হম না করব হো!'

সুরের মূর্চ্ছনায় আর গলার গিটকিরিতে ঘরে যেন সুধাবৃষ্টি হইতেছিল, তার সঙ্গে পিয়ানো আর বেহালার সুরের সঙ্গত!

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে সন্ধ্যা শিশিরকে বলিল—এমন বিদ্যে আপনি এতদিন প্রকাশ করেননি! কি সুন্দর আপনার মিঠে হাত! এইবার আপনার গান শুনব আমরা!

শিশির হাসিয়া বলিল—এই কিন্নরীর সামনে আমার গান! আমি ত পাগল হই নি।

বিদ্যুৎ বলিল—আপনি অমন সুন্দর বাজাতে যখন পারেন তখন গাইতেও নিশ্চয় পারেন। আমি ত বিনা অনুরোধেই গেয়েছি, আপনি......

বিদ্যুৎ লজ্জিত দৃষ্টি তুলিয়া শিশিরের দিকে চাহিল।

শিশির বলিল—আচ্ছা আমিও বিনা অনুরোধে গাইছি, কিন্তু গান শুনে আপনারা হাস্‌বেন।

সন্ধ্যা কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিল—আমি বল্‌লাম তখন গাওয়া হল না, আর বিদ্যুৎবরণী যেই বলেছে উঃ!

বিদ্যুৎ জোরে চিম্‌টি কাটিয়া সন্ধ্যার বাক্‌রোধ করিল। সন্ধ্যা হাসিতে লাগিল। শিশির লজ্জারুণরাগে সুন্দরতর বিদ্যুতের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—তবে আপনি বেহালা ধরুন, বৌদিদি এস্‌রাজ নিন, আমি পিয়ানোয় বসি।

শিশির গাহিতে লাগিল—"বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে!"

সন্ধ্যা বিদ্যুতের কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া মৃদু স্বরে বলিল—ঠাকুরপো গানের আড়ালে তোকে প্রাণের কথা জানাচ্ছে।

কিন্তু তখন বিদ্যুৎ গানের সঙ্গে বাজাইতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার কথা শুনিয়াও সে রাগ প্রকাশ করিবার অবকাশ পাইল না। তার মনে হইতেছিল, এ কি পুরুষের গলা! এ যে স্ত্রীকণ্ঠের মতন মিহি, তেমনি কোমল তেমনি মধুর! আর সেই স্বরে কী কর্ত্তব, কী খেলা, কী শিক্ষিতপটুত্ব! এই অপরিচিত একটি যুবক তার বুদ্ধিপ্রখর চেহারায়, অমায়িক ব্যবহারে, অনিন্দ্য

সঙ্গীতে বিদ্যুতের মনের উপর যে কতখানি ছাপ বসাইয়াছিল তা সে অনুভব করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার বিদ্রূপবিদ্ধ টিপ্পনী তার মনের অবস্থা আরো স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া তাকে সচেতন করিয়া রাখিতেছিল। এই অপরিচিতের পরিচয় জানিবার জন্য বিদ্যুতের কৌতূহল উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

শিশির গান থামাইয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল সুনয়নী ও রজত দরজার কাছে দাঁড়াইয়া প্রশংসা-ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া আছেন। সে গান থামাইয়াছে দেখিয়া তাঁরা ঘরের মধ্যে আসিলেন। সুনয়নী বলিলেন—শিশির, তোর পেটে পেটে এত বিদ্যে! এমন গান ত আমি কখনো শুনিনি!

শিশির উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—মার কাছে নিজের ছেলের জোড়া ত দুনিয়ায় আর নেই!

সুনয়নী সুখী হইয়া বলিলেন—তুই আমার নিজের ছেলে বলে পক্ষপাত করছিনে শিশির! সত্যিই আমার সন্তানভাগ্য ভালো!

রজত হাসিয়া বলিল—আর-একটি গুণধর রত্ন এই আমি! কিন্তু আমি ক্রমশই তোমার ছোট ছেলেটির কাছে নিষ্প্রভ হয়ে উঠ্‌ছি।

শিশির তাড়াতাড়ি বলিল—রজত-রায়ের নাম বাংলা দেশের সবাই জানে; শিশির-চক্রবর্ত্তীকে কেউ জানে না।

রজত হাসিয়া বলিল—কিছু বলা যায় না ভাই। তোমার যে-রকম পেটে-পেটে বিদ্যে, তাতে আমার ওপরে নাম ছাপিয়ে তুল্‌লেও আমি আশ্চর্য্য হব না।

শিশির বলিল—না, সে ভয় তোমার করা বৃথা; আমি 'ও-রসে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ!'

রজত বলিল—সময়ে তা দেখা যাবে। এখন আপাততঃ সঙ্গতে সাহিত্যশক্তির না হোক্ সঙ্গীতশক্তির পরিচয় দেবে চল।

শিশির রজতের পাশে গিয়া চুপিচুপি বলিল—Here is metal more attractive.

রজত হাসিয়া বলিল—কাল তোমাকে disturb কর্‌ব না, আজ চল।

শিশির অগত্যা যাইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু বিদ্যুতের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে তার একটুও ইচ্ছা হইতেছিল না; তার মধ্যে সে একটা যৌগিক আকর্ষণ ও চুম্বকশক্তি নিজের অন্তরে অনুভব করিতেছিল। সে বিদ্যুতের দিকে ফিরিয়া মৃদু স্বরে বলিল—Au revoir!

বিদ্যুৎ লজ্জিত মুখ নত করিয়া মৃদু অস্ফুট স্বরে বলিল—Au revoir!

রজত শিশিরকে লইয়া বাহির হইয়া যাইতেই সঙ্গে-সঙ্গে সুনয়নীও চলিয়া গেলেন। বিদ্যুৎ সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা

করিল—উনি কে? ওঁকে ত আর কখনো দেখিনি, ওঁর কথাও কখনো শুনিনি।

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—Taking interest! দ্যাখ্, বলিস্ ত ঘট্‌কালি করি, অমন বর আর পাবিনে। শুভদৃষ্টি ত দুদিক থেকেই হয়ে গেছে বোধ হচ্ছে!

বিদ্যুৎ কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—আঃ কি যে বকিস্! পথের লোকের সঙ্গে চোখোচোখি হলেও তা হলে ঘট্‌কালি কর্‌তে হয়।

"আচ্ছা, আগে তুই আমার ঠাকুরপোর মহত্ত্বের কাহিনী শোন্, তারপর ঘট্‌কালি কর্‌তে বল্‌বি কি না বিচার করিস্"—বলিয়া সন্ধ্যা শিশিরের ইতিহাস বিদ্যুৎকে শুনাইতে বসিল।

শিশিরের কাহিনী যখন শেষ করিল তখন সন্ধ্যা গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে; বিদ্যুতের চোখে জল চক্‌চক্ করিতেছে।

সন্ধ্যা একটু থামিয়া বলিল—ঠাকুরপোকে তোর কেমন লাগ্‌ল? একজন মানুষের মতন মানুষ নয় কি?

বিদ্যুৎ কিছু না বলিয়া তার হাতখানি তুলিয়া সন্ধ্যার হাতের উপর রাখিয়া একটু চাপিয়া ধরিল। তার বুকের মধ্যে তখন কত অজস্র ভাবের তোলাপাড়া হইতেছে, তার মুখে কথা সরিতেছিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ বলিল—আজ যাই ভাই সন্ধ্যা, আজ আর গান-বাজনা জম্‌বে না। কাল সকাল-সকাল আস্‌ব।

সন্ধ্যাও বুঝিতেছিল শিশিরের করুণ কাহিনীর পর আজ আর গানবাজনা জমিবার নয়। সে বলিল—চ, তবে সঙ্গতের আলোচনা শুনিগে।

নয়

শিশির রজতের সঙ্গে তার বৈঠকখানায় গিয়া দেখিল তাদের ক্লাশের সহপাঠী পূর্ণ হেম খগেন কালিদাস প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন ও অপরিচিত কয়েকজন ভদ্রলোক চা আর জলখাবারের সদ্ব্যবহার বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই করিতেছে।

রজত ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—ইনিই আমার বন্ধু শিশির-বাবু; এঁরই কথা আপনাদের বল্‌ছিলাম; আপনারা এঁরই সুকণ্ঠ শুন্‌তে পেয়েছিলেন; আজ ইনিই আমাদের সঙ্গতকে সঙ্গীতে অভ্যর্থনা করবেন।

তারপর শিশিরকে রজত বলিল—এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি—ইনিই হচ্ছেন সংগ্রহের সম্পাদক ভূধর-বাবু; ইনি প্রসিদ্ধ কবি নরেশচন্দ্র সেন; ইনি

প্রসিদ্ধ গল্পলেখক সন্তোষকুমার ঘোষ; আর ইনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যতীন্দ্রনাথ মৈত্র।

শিশির সকলকে নমস্কার করিয়া একপাশে বসিল। সে দেখিল—ভূধর ভূধরেরই মতন লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড লোক, বয়স আন্দাজ চল্লিশ; নরেশ কৃশ, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, বয়স বছর ছাব্বিশ সাতাশ; সন্তোষ মোটাসোটা মাঝারি আকারের মেটে রঙের লোক, মুখখানা খুব ভারি আর চওড়া, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি; যতীনের দাড়িগোঁপ কামানো, মাথায় টাক, চোখে চশমা, রং একরকম ফর্সাই। ভূধর পর্ব্বতগহ্বরের মতন তার বিপুল মুখগহ্বরে গোটা-গোটা চপ কাটলেট ভরিয়া দিয়া অনর্গল বকিতেছিল; নরেশ পেটরোগা মানুষ, সে খাবার লইয়া নিড়িকচিড়িক করিতেছিল; অন্য সকলে ভূধরের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পাড়ি জমাইবার জন্য ব্যস্ত ছিল। সুতরাং সে সভায় বক্তা ভূধর, শ্রোতা অপর সকলে।

একখানা গোটা লুচি দিয়া একটা গোটা আলু মুড়িয়া মুখে পুরিয়া ভূধর বলিল—তা হলে রজত-বাবু সঙ্গীত দিয়ে সঙ্গত আরম্ভ হয়ে যাক; আমরা খেতে খেতে শুনি।

শিশির রজতের ইঙ্গিতে হারমোনিয়ামের সম্মুখে গিয়া বসিল। সে গান ধরিল—"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!"

গান থামিলে ভূধর রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—বাঃ তোফা গলা আপনার শিশির-বাবু। এতদিন আমাদের অসুরের সঙ্গত ছিল; আপনার আগমনে আমাদের সুর-সঙ্গতি হল!

ভূধর একটা কোনো কথা বলিলেই আর সকলে খুব আতিশয্যের সঙ্গে তার রসগ্রহণের পরিচয় দিতেছিল। ভূধরের এই রসিকতা শুনিয়া সকলে খুব চেষ্টা করিয়া করিয়া ক্রমাগত হাসিতে লাগিল।

ভূধর বলিল—এখন রজত-বাবু আপনার গল্প আরম্ভ করুন।

রজত গল্প পড়িতে আরম্ভ করিল। শিশির লক্ষ্য করিল সকলের সে কী মনোযোগ, যেন একটি কথা হারাইয়া গেলে মহা সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। কেবল সন্তোষ এক-একবার এদিক ওদিক ফিরিতেছিল, মাঝে মাঝে পান তুলিয়া খাইতেছিল, দুচারবার মুখ বিকৃত করিল—সে নিজেও গল্প লেখে বলিয়া বোধ হয়।

রজতের গল্পটা শিশিরের ভালো লাগিতেছিল না; প্লটের মধ্যে তেমন কোনো বাঁধুনি নাই, লেখাটাও হইয়াছে কেমন খাপছাড়া। কিন্তু গল্প শেষ হইলেই যতীন বলিয়া উঠিল—উঃ! কী চমৎকার হয়েছে!

খগেন বলিয়া উঠিল—আপনার গল্পের মধ্যে এইটে সবচেয়ে ভালো যদি নাও হয়, তবে one of the best

বটেই। এমন গল্প সেই সাধনার যুগে এক রবি-বাবু লিখেছিলেন!

রজত আত্মপ্রশংসায় ডগমগ হইয়া হাসিমুখে খাতাখানা পাকাইতেছিল। ভূধর হাত বাড়াইয়া বলিল—ওটা রজতবাবু, সংগ্রহের জন্যে আমি সংগ্রহ করতে চাই।

রজত গর্ব্বিত ভাবে বলিল—হ্যাঁ আপনাকেই ত দেবো, তবে আমি সবে আজই ওটা শেষ করেছি, আর-একবার দেখে আপনাকে দিয়ে আস্‌ব।

শিশির দেখিল রজতের লেখার এই যে তারিফ সমস্ত বাংলাময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে তার প্রধান কারণ-গুলি এই—প্রথম, রজত এখনো ছাত্র ও তার বয়স অল্প; দ্বিতীয়, তার লেখা প্রতি মাসেই বাহির হয় দুটো তিনটে, সুতরাং তার নাম বিজ্ঞাপনের মতন পাঠকদের চোখের সাম্‌নে সর্ব্বদাই আছে, তাকে ভোলা বা উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে শক্ত; তৃতীয়, তার লেখা ভূধরের সংগ্রহে বেরোয়, যে ভূধর অপরের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আচরণ ও রচনার কড়া নির্ম্মম ব্যঙ্গদিগ্ধ সমালোচনা মুখে ও লেখায় করিয়া নামজাদা হইয়া উঠিয়াছে; চতুর্থ, রজতের সঙ্গতে বাঁধা পড়িয়া প্রতি শনিবারে ঘুষ খাইতেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা ও সাহিত্যসংসারের নিন্দুকেরা; পঞ্চম, রজতের রজত-চক্রের প্রাচুর্য্য।

শিশির চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া ভূধর বলিল—এইবার শিশির-বাবু আপনার পালা।

শিশির লজ্জিত হইয়া বলিল—আমার লেখা-টেখা আসে না।

খগেন বলিয়া উঠিল—মৌলিক লিখ্‌তে না পারেন, কোনো একটা নতুন বই পড়ে তার পরিচয়, appreciation কি criticism আপনি অনায়াসে করতে পারেন ত। সবাই যে মৌলিক লিখ্‌তে পারে তা ত নয়।

যতীন বলিল—আপনার মৌলিক লেখারই বা ভাবনা কি? এমন প্রতিভাবান বন্ধু যার, তাঁর আবার অভাব কিসের? আপনি রজতবাবুর কাছে দুচারদিন lessons নিলেই শিখে যাবেন।

সন্তোষ বলিল—হ্যাঁ, আপনাদের বিদ্যেবুদ্ধি আছে, শুধু ধরণটা একটু শিখে নেওয়া। আমরা রয়েছি দুদিনেই শিখিয়ে দেবো......

রজত গম্ভীর ভাবে বলিল—সে আমি ওকে শিখিয়ে নেবো। তবে আস্‌ছে শনিবারের পরের শনিবার শিশিরের জন্যে ঠিক রেখে, এ শনিবারটার ভার আর কেউ নিন।

সন্তোষ তাড়াতাড়ি বলিল—আচ্ছা আমি নিচ্ছি; শিশির-বাবু তা হলে ছোটগল্প লেখার একটা আন্দাজ পাবেন।

ভূধর বলিল—বেশ, তবে ঐ কথাই রইল। এখন তবে মধুরেণ সমাপয়েৎ—শিশির-বাবুর একটি গান হোক।

শিশির হাসিতে হাসিতে হারমোনিয়ামের সাম্‌নে গিয়া বসিয়া বলিল—আমার যা সামান্য সঙ্গতি আছে তাই দিয়েই সঙ্গতের সম্বর্দ্ধনা কর্‌ব, আমাকে দিয়ে লেখা-টেখা ওসব হবে-টবে না।

রজত পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে শিশিরের কাঁধে হাত রাখিয়া পরম মুরুব্বির মতন গম্ভীরভাবে আশ্বাস দিয়া বলিল—আঃ ভয় করছ কেন? আমি দেখে-টেখে দেবো, দুচারবার লিখ্‌তে-লিখ্‌তেই হাত আস্‌বে, একটা উৎরে গেলেই তখন সহজ বোধ হবে। লেখ্‌বার আগে তুমি আমাদের গল্পগুলো বেশ করে একবার পড়ে নিয়ো, তা হলে ধর্‌তে পার্‌বে ছোটগল্প লেখার আর্টটা কি রকম!

শিশির হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা কি হয়, পাখীর কাছে ওড়া সহজ বল্লেই সে ভাবে জন্তুগুলো ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে মরে কেন।

পাশের ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা ও বিদ্যুৎ সঙ্গতের আলোচনা শুনিতেছিল। সন্ধ্যা বিদ্যুৎকে বলিল—সত্যিই ত, ওঁর কাছে লেখা সহজ বলে আর সকলেই যে পার্‌বে তার মানে কি? ঠাকুরপো যেরকম শুক্‌নো লোক, উনি আবার রস সৃষ্টি করবেন! তা হলেই হয়েছে!

বিদ্যুৎ শুধু একটু হাসিল।

রজত শিশিরকে বলিল—আচ্ছা এখন তর্ক রেখে গান ধর।

শিশির গান ধরিল—"আমায় বোলো না, গাহিতে বোলো না!"

দশ

সকলকে বিদায় করিয়া রজত বাড়ীর ভিতর আসিল; সন্ধ্যাও বিদ্যুৎকে বিদায় দিয়া আপনার ঘরে আসিয়া বসিয়া সেই মাসের নূতন সংগ্রহ পড়িতেছিল। রজত ঘরে আসিতেই সন্ধ্যা হাসি দিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—তোমার ত আচ্ছা বাতিক দেখ্‌ছি! নিজে লিখ্‌তে পারো বলে সবাইকে লেখক কর্‌তে চাও। কিন্তু রচনাশক্তি ঈশ্বর-দত্ত ঐশ্বর্য্য, তা কি যার-তার থাকে?

রজত স্ত্রীর প্রশংসায় খুসী হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—হ্যাঁ, প্রতিভা ঈশ্বর-দত্ত বটে কিন্তু talent নিজের চেষ্টায় অনেকটা আয়ত্ত করা যায়। শিশিরের যেরকম বুদ্ধিবিদ্যে তাতে ও চেষ্টা কর্‌লে খুব ভালো না হোক চলনসই লিখ্‌তে পার্‌বে।

সন্ধ্যা বলিল—তা পার্‌তে পারেন হয়ত; কিন্তু তোমার তুলনায় ঠাকুরপোর ঐ চেষ্টা-করা লেখা বড়

খারাপ লাগ্‌বে। তার চেয়ে উনি যেমন চুপচাপ আছেন তেম্‌নি থাকুন।

রজত অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া বলিল—না, না। আহা বেচারা সর্ব্ববঞ্চিত, লিখ্‌তে শিখ্‌লে তবু একটা অবলম্বন পাবে। আর যদি চলনসই রকমেরও লেখা ওকে শেখাতে পারি তা হলে ও যাতে কাগজে লিখে মাসে কিছু পায় তার ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

সন্ধ্যা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—হ্যাঁ তা বটে। তুমি ওঁকে শিখিয়ে দিলে উনি তোমার ধাঁজটা যদি কতকটা ধর্‌তে পারেন তাহলে একরকম চলনসই হবে।

রজত বলিল—কাল রোববার আছে। কাল সকাল-সকাল খেয়ে-দেয়ে শিশিরের হাতেখড়ি করাতে যাব।

পরদিন দ্বিপ্রহরে রজত শিশিরের মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। মেসের সব ছেলে সেদিন শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়াছে; একা শিশির মেসে আছে। শিশির বিছানাময় খাতা কাগজ ছড়াইয়া কি লিখিতে নিমগ্ন হইয়া ছিল; হঠাৎ রজতকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িবার মতন থতমত খাইয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় তাড়াতাড়ি পাত্‌ভাড়ি গুটাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। রজত অগ্রসর হইয়া গিয়া একখানা খাতা তুলিয়া লইতেই, শিশির ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া কাড়িয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল—না না,

ওসব দেখো না ভাই, ওসব অন্যের দেখ্‌বার জন্যে নয়।

রজত শিশিরের হাত সরাইয়া দিয়া বলিল—লুকিয়ে লুকিয়ে হাত মক্‌স করতে সুরু করে দিয়েছ! ডুবে ডুবে জল খাওয়া!......

খাতার পাতা উল্টাইয়া একটু পড়িয়া রজত বলিল—এ যে দেখ্‌ছি উপন্যাস! একেবারে উপন্যাসে হাত দেওয়াটা তোমার ভালো হয়নি; আগে হেলে ধরতে শিখে তবে কেঁউটে ধরতে যেতে হয়। আমি এতদিন পরে উপন্যাস attempt কর্‌ছি; ভূধর-বাবু প্রভৃতি ত বল্‌ছেন বেশ ভালো হচ্ছে, কিন্তু আমার মনে এখনো বিশেষ সন্দেহ আছে—উপন্যাসের শেষ রক্ষে করতে না পারলে প্রকাণ্ড শ্রম একেবারে পণ্ড! ছোটগল্প খারাপ হলে অল্পের ওপর দিয়েই যায়।

শিশির লজ্জিত হইয়া বলিল—ওটা ঠিক উপন্যাস নয়, বড় গল্প বলা যেতে পারে। আর আমার শ্রম ত আগাগোড়াই পণ্ড, কারণ ওসব ত প্রকাশের জন্যে লেখা নয়, ওসব অবকাশের খেয়াল।

রজত খাতার এখানে-সেখানে পড়িতে-পড়িতেই বুঝিতে পারিল এ অক্ষম লেখনীর কাঁচা রচনা নয়। সে তখন খাতাখানার গোড়া হইতে পড়িতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, শিশিরের কথার জবাব দিবার অবসর তখন তার ছিল না।

রজত পড়িতে লাগিল। শিশির লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একটানে সমস্তটা পড়িয়া রজত একটু অপ্রসন্ন মুখে মুরুব্বিয়ানা চালে বলিল—প্রথম চেষ্টার পক্ষে মন্দ নয়। ঐ যে ওর মধ্যে কাদম্বরীর চরিত্র এঁকেছ সেটা একটু overdrawn হয়েছে বলে অস্বাভাবিক লাগছে; আর ওর সঙ্গে শেষকালে প্রশান্তর ঐরকম ভাবে মিলন না ঘটিয়ে একটা কোনোরকম situation create ক'রে ওদের মিলনটাকে inevitable করতে পারলে ঠিক হত।

শিশির কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—আমার ত্রুটি যে প্রচুর তা আমি জানি, তাই ত ওসব একলা আমারই হয়ে লুকোনো আছে।

রজত একটু উপদেশ দিবার ধরণে বলিল—লুকিয়ে রাখলে ত ত্রুটি সংশোধন হবে না। সমালোচনায় ভুল শোধরায়। আমি তোমার দপ্তর গেরেপ্তার করছি; আমি এর সব পড়ে দেখব।

শিশির ব্যস্ত হইয়া বাধা দিতে উদ্যত হইল, কিন্তু রজত তখন ক্ষিপ্র হস্তে সমস্ত দখল করিয়া লইয়াছে। রজত বলিল—তুমি বিকেল-বেলা এসো, তখন দুজনে মিলে আলোচনা করা যাবে। আমি ততক্ষণ এগুলো পড়ে ফেলিগে।

রজতের কৌতূহল এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে

সে বাড়ীতে গিয়া শিশিরের সমস্ত লেখা পড়িয়া শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে গাড়ীতে উঠিতে গেল। শিশির সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—ঐ ছাইপাঁশগুলো পড়ে কেন বৃথা সময় নষ্ট করবে? আমি অক্ষমতার লজ্জায় এর পর তোমাদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

রজত গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়া বলিল—জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে সবাইকেই হাত মক্স করে করে লেখা পাকাতে হয়েছে। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, হোমার, প্রভৃতি সেকালের কবিদের খসড়া খাতা হারিয়ে গেছে, নইলে দেখা যেত তাঁদেরও কীর্ত্তি অকস্মাৎ ভূমণ্ডলজোড়া হয়ে ওঠেনি।

রজত বাড়ীতে ফিরিয়াই শিশিরের খাতা খুলিয়া ইজিচেয়ারে কাত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল—ওসব কি?

—শিশিরের লেখা।

—ঠাকুরপোর এত লেখা জমা ছিল?

—হ্যাঁ, লুকিয়ে লুকিয়ে লেখে।

—কেমন দেখছ?

রজত নাক সিঁট্‌কাইয়া তাচ্ছিল্য দেখাইয়া বলিল—এখনো কাঁচা হাত। তবে promise আছে। একখানা খাতা পড়ে ভাখো না।

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—ওসব কাঁচা লেখা পড়ে কি হবে? তোমার নতুন উপন্যাসের শেষ চার চ্যাপ্টার আমার পড়া হয়নি তাই পড়তে যাচ্ছি।

রজত খুসী হইয়া বলিল—আহা বেচারা, তুমি ওকে একটু উৎসাহ দিলে ও খুসী হবে।

—তুমি পড়ে আমায় মুখে দু চার কথা বলে দিয়ো, তাই উল্লেখ করে আমি উৎসাহ দেবো। এখন আমি চললাম, মঞ্জুলিকাকে ডাকাতেরা ধরে নিয়ে গেছে, তার কি হল জানবার জন্যে আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে।

রজত খাতা হইতে মুখ তুলিয়া অপাঙ্গে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। সন্ধ্যা হাসির বিনিময়ে হাসি দিয়া খাতা লইয়া পড়িতে বসিল।

সন্ধ্যা রজতের মঞ্জুলিকা উপন্যাসের পরিচ্ছেদ কয়টা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া একদমে শেষ করিয়া অসমাপ্তির অতৃপ্তিতে বিরক্ত হইয়া রজতকে বলিল—তুমি কতটুকু কতটুকু লেখ?

রজত শিশিরের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল—আমি যতখানিই লিখি তোমার পড়ার সঙ্গে ত পাল্লা দিয়ে উঠতে পারব না।

সন্ধ্যা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মঞ্জুলিকার শেষকালে কি হবে? রণবীর সিংহের সঙ্গে মিলন হবে কি?

রজত খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—হওয়া না-হওয়া ত আমারই হাতে। যা হুকুম করবে তাই করে দেবো।

সন্ধ্যা বলিল—তবে ওদের মিলন করে দিতে হবে তোমার।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া রজত আবার পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যা বলিল—তুমি ত দিব্যি পড়তে লাগলে। আমি এখন কি করি?

—তুমিও পড় না।

—এসব কাঁচা হাতের আনাড়ি লেখা ভালো লাগবে কিনা? আমি সেলাই করিগে তার চেয়ে।

সন্ধ্যা উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া সেলাই করিতে বসিল। খানিকক্ষণ পরে বিদ্যুৎ আসিল। বিদ্যুৎকে দেখিয়াই সন্ধ্যা বলিল—এত সকাল-সকাল এলি যে?

—বাড়ীতে মন টিকছিল না।

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—যাকে দেখবার জন্তে ছুটে এলি সে ত এখনো আসে নি। তবে তার মনের কথা এনে দিচ্ছি দাঁড়া।

বলিয়াই বিদ্যুতের কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সন্ধ্যা ছুটিয়া চলিয়া গেল। এবং রজতের কাছ হইতে শিশিরের লেখা কতকগুলা খাতা আনিয়া বিদ্যুতের কোলে ফেলিয়া দিল।

বিদ্যুৎ বলিল—এসব কি ?

—শিশির-ঠাকুরপোর লেখা।

—এত লেখা কবে লিখলেন ?

—ডুবে ডুবে জল খেতেন।

—কেমন লেখা, পড়ে দেখেছিস ?

—ওর আর পড়্‌ব কি ? কাঁচা হাতের মক্‌স !

বিদ্যুৎ আর কিছু না বলিয়া খাতা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। সে দু চার লাইন পড়িয়াই বলিয়া উঠিল—কাকে তুই কাঁচা হাতের মক্‌স বল্‌ছিস্‌! শোন্‌ দেখি, এমন লেখা বাংলা দেশের কটা সাহিত্যিক লিখ্‌তে পারে শুনি—

এই বিজন শরৎরাত্রির অশ্রুস্নাত অনন্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া সরোবরতটে একাকিনী রাজকন্যা তরলাক্ষি। তার তনুলতায় লাবণ্যরঞ্জিত পুষ্পশ্রী, ঈষচ্চঞ্চল আয়ত-নয়নে শুভ্র দুগ্ধনদীর ন্যায় মুগ্ধদৃষ্টি; তরঙ্গায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ বিপুল কেশরাশি ও লীলামধুর গতিভঙ্গীতে তাহাকে ঘন-বর্ষার বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় মনে হইতেছে। তার নেত্রবিদ্যুতের খরঋজু পথে তার হৃদয়ের শ্রী নিক্রুত হইয়া আসিতেছিল।

সন্ধ্যা আকৃষ্ট হইয়া বলিল—দেখি দেখি! এমন সুন্দর ভাষার বাঁধুনি!

সন্ধ্যা একখানা খাতা লইয়া মাঝখানে খুলিয়া পড়িল—

পুষ্পপল্লবশোভিত উদ্যানতোরণে বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত চীনাংশুককেতু সুমন্দ পবনে আন্দোলিত হইয়া কুঙ্কুমানুলিপ্ত রমণীহস্তের সঙ্কেতের মতো সবিলাস লীলাসহকারে নাগরিকদিগকে উৎসবমেলায় আহ্বান করিতেছে; ধারাযন্ত্রে শীতল সলিল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শিকরাকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে; সুগন্ধি সলিলে ধরাতল অবসিক্ত হইয়া উঠিতেছে।

বিদ্যুৎ বলিয়া উঠিল—শোন শোন।

দেবতার বদনবিম্ব দেখিবার মণিদর্পণের ন্যায় স্বচ্ছসলিল বিশাল হ্রদ। তাহার উত্তর তীরে সুরেন্দ্রশরচ্ছিন্ন দৈত্যজজ্বার ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শৈলশ্রেণী—স্তূপাকার, বিশৃঙ্খল,—কোথাও তরুপুঞ্জে ধূসর, কোথাও নগ্নতায় বিকট, কোথাও হ্রদগর্ভে অবগাঢ়, কোথাও বা বিজনভীম ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিতশির। শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন শিখরের পার্শ্বেই এক-একটা তৃণহীন শিখর সহস্র রেখাঙ্কিত পাষাণকঙ্কাল প্রকাশিত করিয়া নগ্ন কুশ্রীতার প্রতিমূর্ত্তি। মধ্যে মধ্যে এক-এক স্থানে অরণ্যের খণ্ড আবরণ। যেন প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা বিকট দৈত্য সহস্র হিংস্র নখের বিদারণরেখা রাখিয়া উহার শ্যামল ত্বক অনেকখানি করিয়া আঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইয়াছে।

সন্ধ্যা বলিল—টুকরো টুকরো করে পড়ে সুখ হচ্ছে না। একটা কিছু গোটাগুটি পড়া যাক আয়।

বিদ্যুৎ বলিল—তুই একখানা খাতা পড়্, আমি আর-একখানা পড়ি।

দুজনে দুখানা খাতা লইয়া পড়িতে পড়িতে একেবারে নিমগ্ন হইয়া তন্ময় হইয়া গেল।

সন্ধ্যার খাতা তখনো শেষ হয় নাই; বিদ্যুৎ তার খাতা শেষ করিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ! কী চমৎকার!

হঠাৎ তার চোখ পড়িল পিছনের দরজার দিকে; সেখানে শিশির স্মিত মুখে দাঁড়াইয়া তার দিকে চাহিয়া আছে। শিশিরেরও চোখ যেন লজ্জিত হইয়া বলিতেছিল—'বাঃ! কী চমৎকার!' বিদ্যুৎ সন্ধ্যাকে ঠেলা দিয়া আস্তে বলিল—এই, শিশির-বাবু এলেছেন।

সন্ধ্যা ঘাড় ঘুরাইয়া হাসিয়া বলিল—আপনার পেটে পেটে এত বিদ্যে ছিল ঠাকুরপো! কী সুন্দর আপনি লিখ্‌তে পারেন! এমন সব লেখা বাক্‌স-বন্দী করে রেখেছেন, ছাপ্‌তে দ্যান নি?

শিশির অগ্রসর হইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বিদ্যুতের কাছে যে চেয়ারখানা ছিল তাতে বসিয়া বলিল—ছাপ্‌বার এখনো সময় হয়নি বৌদি। ভ্রূণ মাতৃগর্ভে থেকে পুষ্ট হয়ে ভূমিষ্ঠ না হলে সে দীর্ঘায়ুও হয় না, লোকের প্রীতি-ভাজনও হয় না। সব কিছুরই একটা সাধনার যুগ থাকে, আর থাকা দরকারও।

বিদ্যুৎ এই তরুণ তপস্বীর সকল কর্ম্মে সংযম ও সাধনার প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়া মনে মনে তাকে মুগ্ধ অন্তরের প্রশংসা করিতেছিল।

সন্ধ্যা বলিল—আজকাল যারা লিখ্‌ছে তাদের অনেকের চেয়ে ত আপনার লেখা ভালো।

শিশির হাসিয়া বলিল—আপনারা আমাকে ভালো বেসেছেন বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু কোনো সম্পাদক ওরকম কাঁচা লেখা পুছ্‌বেও না।

শিশির আসিয়াছে টের পাইয়া রজত পাশের ঘর হইতে উঠিয়া আসিল এবং শিশিরের কথার উত্তরে বলিল—হ্যাঁ, লেখাগুলো একটু কাঁচা আছে বটে; তবে আমার সঙ্গে কাণ্ডারী কাগজের এডিটার দক্ষিণা-বাবুর বেশ পরিচয় আছে, আমি বলে দিলে তিনি ছাপ্‌বেন।

সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল—কাণ্ডারী ত তেমন ভালো কাগজ নয়; ভূধর-বাবুকে বলে সংগ্রহে ছাপিয়ে দাও না।

রজত গম্ভীর হইয়া বলিল—একেবারে নতুন লেখকের লেখা সংগ্রহ নেবে কি না বল্‌তে পারিনে, আচ্ছা ভূধর-বাবুকেও বলে দেখ্‌ব।

শিশির লজ্জিত হইয়া বলিল—যে লেখার নিজের জোর নেই, তাকে সুপারিশের জোরে ঠেলে লোকের সাম্‌নে বার করে উপহাসাস্পদ করা কি ঠিক হবে?

রজত গম্ভীর হইয়া বলিল—প্রথম প্রথম সব লেখককেই সুপারিশ আর খোসামোদ করে আসরে নাবতে হয়। আমি কিন্তু তা কখনো করিনি; আমাদের সঙ্গতে এসে ভূধর-বাবু আমার লেখা শুনে নিজে চেয়ে ছেপেছেন! আচ্ছা, চল না, ভূধর-বাবুর কাছে তোমায় নিয়ে যাই।

শিশির অপ্রতিভ ভাবে বলিল—না না, অত তাড়াতাড়ি কিসের? এখন থাক্।

রজত হাসিয়া একবার বিদ্যুতের দিকে তাকাইয়া শিশিরের দিকে চাহিয়া বলিল—ও! Here is metal more attractive! তবে আমি একলাই যাই।

রজত হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

শিশির যখন লজ্জায় সঙ্কুচিত মুখ ফিরাইয়া বিদ্যুতের দিকে দেখিতে পারিল, তখনও বিদ্যুৎ মুখ লাল করিয়া বসিয়া আছে। শিশির বিদ্যুতের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল না তার ঐ লালিমার কারণ রাগ বা বিরক্তি বা লজ্জা।

শিশিরকে ফিরিতে দেখিয়াই বিদ্যুৎ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—আপনি খাতাগুলো নিয়ে যেতে দিলেন কেন? ওর মধ্যে যে জিনিস আছে তার নিজের কদরেই যারা আদর করবে না সেই মূঢ়দের কাছে সুপারিশ করায় তার অপমান করা হবে!

সন্ধ্যা শিশিরের প্রতি বিদ্যুতের আবেগভরা অনুরাগের পরিচয় পাইয়া যেমন কৌতুক অনুভব করিল, তার স্বামীর প্রতি বিদ্যুতের বিরাগ প্রকাশ পাওয়াতে তেম্‌নি একটু বিরক্ত হইল; সে বলিয়া উঠিল—Madam, you protest too much! নতুন লেখকদের ত সম্পাদকদের সঙ্গে পরিচয় আপনি হবে না।

বিদ্যুৎ সন্ধ্যার কথার হুলে বিদ্ধ হইয়াও নরম স্বরেই বলিল—হ্যাঁ, পরিচয় হবে লেখার নিজের গুণের দ্বারা, লোকের সুপারিশের দ্বারা নয়।

সন্ধ্যাকে বিরক্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়া শিশির তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎকে বলিল—আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে রজতের আগ্রহটা কতখানি; সে নিজে বিখ্যাত হয়েছে, আমাকেও সে লোকের কাছে সমাদৃত দেখ্‌তে চায়; তাই তার তাড়াতাড়ি। সাধারণের কাছে আমার লেখার সমাদর হোক না হোক তার জন্যে আমি কোনো দিনই লালায়িত ছিলাম না; নিজের আনন্দে লিখেছি, আর সেই আনন্দ আজ আশাতীত প্রচুর পুরস্কার পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে—

—বিদ্যুতের প্রশংসায়?—বলিয়া সন্ধ্যা কটাক্ষে বিদ্যুৎ ও শিশিরের মুখের ভাব পাশাপাশি রাখিয়া দৃষ্টিতে মিলাইয়া দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

শিশির লজ্জিত মুখে যথাসম্ভব সহজ স্বরে

বলিল—হ্যাঁ, আপনাদের প্রশংসাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার !

সন্ধ্যা বিদ্যুতের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—গৌরবে বহুবচন !

শিশির হাসিয়া বলিল—সে গৌরব থেকে আপনিও বাদ পড়েন নি বৌদিদি !

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—মুখের ওপর অস্বীকার করাটা নেহাৎ অভদ্রতা হবে বলে।

শিশিরের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। সে গাঢ় স্বরে বলিল—বৌদিদি, আপনারা ছাড়া আমার আপনার বল্‌বার কেউ নেই।

সন্ধ্যা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আমি ঠাট্টা কর্‌ছিলাম ঠাকুরপো। চ বিদ্যুৎ, গান কর্‌বি চ; আসুন ঠাকুরপো আপনি বেহালা নিন।

সন্ধ্যা বেহালা আনিয়া শিশিরের হাতে দিল। বিদ্যুৎ শিশিরের সরল স্নেহভিক্ষু হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া অধিকতর মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া পিয়ানোর কাছে যাইতে যাইতে সন্ধ্যাকে চুপিচুপি বলিল—ঐ নিরীহ বেচারাকে তুই আর ঠাট্টা করিস্‌নে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা বলিল—না ভাই আর কর্‌ব না। আমি কি জানি যে অতটুকু ঘাও ঐ প্রাণে সয় না।

বিদ্যুৎ ম্লান দৃষ্টিতে মমতা ভরিয়া সন্ধ্যার দিকে

চাহিয়া বলিল—সে যে অনেক ঘা সয়ে সয়ে ঠুনকো হয়ে আছে।

সন্ধ্যাকে আর কোনো কথার অবকাশ না দিয়া বিদ্যুৎ দ্রুত অঙ্গুলি চালনায় পিয়ানোর সুরের মূর্চ্ছনায় ঘরখানিকে নিমেষে ভরিয়া তুলিল। ক্ষণেক পরে গান ধরিল—"বড় বেদনার মত বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে।"

এগারো

রজত শিশিরের একখানা খাতা লইয়া কাণ্ডারীর সম্পাদক দক্ষিণা-বাবুর কাছে গিয়া উপস্থিত। দক্ষিণা রজতকে মোটর থামাইতে দেখিয়াই তার ছোট্ট আপিস-ঘরের মধ্যে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিবার চেষ্টায় দুবার দুদিকে ধাক্কা আর চোট খাইল। তার সাড়ে চার হাত চৌকা ঘরখানির এক-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া একটা টেবিল আছে, তার উপরের বনাতটা লোমশূন্য হইয়া ধূসর হইয়া গেছে, বনাতের একটা কোণ কাঠের পাটা হইতে খুলিয়া পাকাইয়া গিয়াছে, তার সর্ব্বাঙ্গে ধুলা ও কালীর লাঞ্ছনা; টেবিলের উপর বই কাগজ খাতা ছড়ানো এলোমেলো কাণ্ড। সেই টেবিলের পাশে

একখানা কাঠের চেয়ার আছে, তার কাঠামোটা এখনো সেগুনকাঠের আছে, কিন্তু বসিবার জায়গাটা দেবদারু কাঠ দিয়া পরে মেরামত হইয়াছে, তার একটা হাতা আর পিঠের ঠেস ভাঙিয়া গিয়াছে—সে দুটা আর মেরামত হইয়া উঠে নাই। টেবিলের অপর দিকে একখানা বার্নিশ-ওঠা নড়্‌নড়ে বেঞ্চি আর একখানা টুলের উপর এইমাসের কাণ্ডারী স্তূপাকার করা আছে। দক্ষিণা চেয়ার ছাড়িয়া অনেকবার গা মোড়া দিয়া দিয়া অলিগলি ঘুরিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল—রজত-বাবু যে, আসুন আসুন।

রজত ঘরে ঢুকিয়া বেঞ্চির একপাশে কাণ্ডারী সরাইয়া জায়গা করিয়া বসিল।

দক্ষিণা তটস্থ হইয়া বলিল—ওখানে কেন, ওখানে কেন? চেয়ারে বসুন আপনি।

—না, আমি বেশ আছি। একটা লেখা দিতে এসেছি, একবার পড়ে দেখ্‌বেন, যদি চলে।

দক্ষিণা গদ্‌গদ হইয়া বলিল—কতকাল ধরে আপনার লেখা চাচ্ছি, এতদিনে ভাগ্য ফির্‌ল। আপনার লেখা আবার চল্‌বে কি না দেখ্‌তে হবে! হাঃ হাঃ হাঃ!

রজত খুসী হইয়া বলিল—এটা আমার লেখা নয়; আমার লেখা—বুঝ্‌লেন কি না—সব ভূধর-বাবু কেড়ে নিয়ে যান। এ আমার একটি বন্ধুর লেখা।

দক্ষিণার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে বলিল—বড় আশায় নিরাশ হলাম রজত-বাবু!

রজত সান্ত্বনা দিবার স্বরে বলিল—এও নেহাৎ মন্দ লেখা নয়।

দক্ষিণা বলিল—মন্দ না হলেও আপনার সমকক্ষ ত নয়!

দক্ষিণা শিশিরের খাতার পাতা উল্টাইয়া তার নাম পড়িয়া বলিল—শিশির-চক্রবর্ত্তী যত ভালোই লিখুন, রজত-রায়ের মতন ত তাঁর এখনো নাম হয় নি।

রজত উঠিয়া দাঁড়াইয়া খুব মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল—এখন ঐটাই ছাপুন, তার পর আমি আমার একটা লেখা দেবার খুব চেষ্টা করব। আপনার কাগজের অন্যান্য লেখার সঙ্গে ও লেখাটা চলে যাবে একরকমে।

দক্ষিণা বলিল—আপনার অনুরোধ আমরা রাখ্‌তে বাধ্য, কিন্তু আপনাকেও আমার অনুরোধটি রাখ্‌তে হবে।

"আচ্ছা আচ্ছা সে হবে"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে গিয়া রজত মোটরে চড়িল। মোটর নিমেষে গলির মোড় ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দক্ষিণা শিশিরের খাতাখানা লইয়া টেবিলের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া মুখবিকৃতি করিয়া বলিল—বন্ধুর লেখা দিয়ে কেদাস্ত করে গেলেন! থাক্ পড়ে।

রজতের মোটর সংগ্রহ-আপিসের সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল। সংগ্রহ-আপিসটা একটু বড়, আট হাত ছ হাত ঘর; সে ঘরে একখানা আস্ত চেয়ার, একখানা বার্ণিশকরা বেঞ্চি, একটা অয়েলক্লথ-ঢাকা টেবিল, একটা আল্‌মারি, আর একখানা সরু তক্তাপোষে একটা ফরাস-বিছানা আস্‌বাব। ভূধর বিন্ধ্যগিরির মতন বুকে তাকিয়া দিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া একটা প্রুফ দেখিতেছিল। রজতের মোটর আসার শব্দে চোখ তুলিয়া জান্‌লা দিয়া বাহিরে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—আসুন রজত-বাবু।

রজত আসিয়া বেঞ্চিতে বসিল। ভূধর কাত হইয়া খুব মোটা ভারী গলায় বলিল—আপনারই রসলহরীর প্রুফ দেখ্‌ছি।

রজত ভারিক্কি চালে একটু হাসিল।

ভূধর রজতের একখানা খাতা দেখিয়া বলিল—হস্তে কিমাস্তে তব? নতুন কিছু নাকি? সেই নতুন উপন্যাসটা বুঝি?

রজত হাসিমুখে বলিল—হ্যাঁ উপন্যাস বটে, তবে আমার নয়, শিশিরের।

—ও! শিশির-বাবু তা হলে লিখে থাকেন? কেমন, দেখেছেন কি?

—হ্যাঁ, নেহাৎ মন্দ নয়, চলনসই। আপনি যদি বদ্‌লে-সদ্‌লে নিয়ে ছাপ্‌তে পারেন, তা হলে ওর উৎসাহ

হয়। আর ও গরীব-মানুষ, যদি কিছু করে দক্ষিণা দিতে পারেন দেখ্‌বেন।

ভূধর গম্ভীর হইয়া বলিল—নামজাদা লেখকদের লেখাই এত জমে আছে যে ওসব নতুন লোকের কাঁচা লেখা বার করবার অবসর……

রজত বলিল—তাড়াতাড়ি নেই, আপনি একটু অবসর করে দেখে কোনো ফাঁকে যদি চালিয়ে দ্যান তা হলে সেটা আমি personal favour বলে মনে করব। আহা বেচারা অনেক দুঃখ পেয়েছে।

—হ্যাঁ, তা ত আপনার কাছে সব শুনেছি। তা ওকে নিজের জীবনের কাহিনীটাই গুছিয়ে লিখ্‌তে বলুন না, বেশ উপন্যাস হয়ে যাবে।

—একটা উপন্যাস পড়্‌ছিলাম, তার মধ্যে ওর নিজের জীবনের একটু ছায়া পড়েছে; এখনো সেটা আমার শেষ হয়নি।

ভূধর সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বলিল—আপনার উপন্যাস শেষ হল? আপনার উপন্যাসের নামটা "প্রিয়তের কাঠপিঁপড়ে" রেখেছেন, সেটা কেমন একটু vulgar শোনাচ্ছে, ওটা বদলে অন্য নাম রাখ্‌বেন, it smacks of বটতলা।

রজত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হ্যাঁ, সেটা ভেবেছি—চলতি কথ্য ভাষায় আছে বলে vulgar লাগ্‌ছে; সাধুভাষায়

ঐ নামটাই তর্জ্জমা কর্‌লে আর খারাপ লাগ্‌বে না—"প্রণয়ের শূলবেদনা" নাম রাখ্‌ব মনে কর্‌ছি। কি বলেন আপনি ?

—হ্যাঁ তা মন্দ নয়—প্রণয়টা ব্যাধিরই সামিল, এবং সেটা উৎকট হয়ে উঠ্‌লে শূলবেদনার মতনই দুঃসহ হয় বটে। আচ্ছা শেষ হোক, তার পর একদিন সঙ্গতে নাম নির্ব্বাচনের আলোচনা হবে।

"সে প্রস্তাব মন্দ নয়" বলিয়া রজত হাসিতে হাসিতে মোটরে গিয়া চড়িল।

রজত বাড়ী গিয়া দেখিল শিশিরদের গানের মজ্‌লিস জমিয়া উঠিয়াছে—শিশির বিদ্যুৎ ও সন্ধ্যা তিনজনের মিলিত সুস্বর বাড়ীখানিকে ভরিয়া তুলিয়াছে। রজত ঘরে ঢুকিতেই হঠাৎ গান থামিয়া গেল। রজত বলিল—চলুক, চলুক, থাম্‌লে কেন ?

কিন্তু গান আর চলিল না। রজত শিশিরকে বলিল—তোমার 'ভুঁইচাঁপা' কাওয়ারীতে আর 'ফুলের পাখা' সংগ্রহে দিয়ে এলাম হে শিশির।

শিশির লজ্জিত মুখ নত করিয়া রহিল। সন্ধ্যা বা বিদ্যুৎ কিছুই বলিল না।—এই লেখা দেওয়ার কথা লইয়া একটু আগে যে অপ্রিয় প্রসঙ্গ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাকে অনেক কষ্টে গান চাপা দিয়া কবর দেওয়া হইয়াছে, তাকে আর খুঁড়িয়া তুলিতে তাদের ইচ্ছা ছিল না।

সে যে শিশিরের লেখা ছাপিতে দিয়া কতবড় বাহাদুরী ও উপকার করিয়াছে ইহার জন্য কাহারও কাছে কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসার এতটুকু পরিচয় না পাইয়া রজত মনে মনে চটিয়া গেল; এবং তার আবির্ভাবে যে এদের জমা মজলিস ভাঙিয়া গেল ইহা অনুভব করিয়া সে মনে মনে ঈর্ষা ও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

ঘর নিঃঝুম। কারো মুখে শব্দ নাই। ইহা ঘরের চারজনের কাছেই অশোভন ও অন্যায় বোধ হইতেছিল, অথচ বলিবার কথাও কেহ কিছু খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

তাদের রক্ষা করিলেন আসিয়া সুনয়নী। তিনি ঘরে আসিয়া বলিলেন—শিশির, তোদের গান থাম্‌ল? আয়, এখন খাবি আয়।

শিশির উঠিয়া হাসিয়া বলিল—এস রজত।

রজত গম্ভীর ভাবে বলিল—চল।

বারো

এই ঘটনার পর শিশিরের লেখার সম্বন্ধে আলোচনা একরকম চাপা পড়িয়া গেল। শনিবার সঙ্গতে ভূধর একবার প্রসঙ্গ উত্থাপন মাত্র করিয়াছিল, কিন্তু সে তখনো তার লেখা পড়িবার অবসর পায় নাই বলিয়া বিশেষ কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিল না। তার

পর রজতের নূতন উপন্যাসের নামকরণ লইয়া আগ্রহ ও কোলাহল যেরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, তার মধ্যে শিশিরের মতন নগণ্য লোকের কথা কেহ মনে করিয়া রাখিল না। এতে ফল হইল এই যে রজতের মনে শিশিরের প্রতি যে একটু সামান্য ঈর্ষা ও তার অকৃতজ্ঞতায় অপ্রসন্নতা কুশাঙ্কুরের ন্যায় মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তাহা চাপা পড়িয়া গেল। তার জড় নষ্ট হইয়া গেল শিশিরের একটি পরবর্ত্তী ব্যবহারে।

মাসকাবার হইলে একদিন সন্ধ্যা দশ টাকার দুখানি নোট আনিয়া বিনীত ভাবে শিশিরের সম্মুখে ধরিল। শিশির স্মিতমুখ সন্ধ্যার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কি হবে বৌদিদি?

সন্ধ্যা বলিল—প্রণামী ত বল্‌তে দেবেন না, তাই বল্‌ছি এ আপনার দক্ষিণা।

শিশির গম্ভীর হইয়া বলিল—আপনাকে পড়িয়ে আমি টাকার চেয়ে ত ঢের মূল্যবান দক্ষিণা অহরহ পাচ্ছি বৌদি। টাকা আমি ঢের পেয়েছিলাম; স্বেচ্ছায় আমি অবহেলা করে সেসব ছেড়ে এসেছি। কিন্তু আমি জীবনে যা পাইনি, যার জন্যে আমার চিত্ত কাঙাল হয়ে আছে, তা যে আপনারা নিত্য নিরন্তর যেচে যেচে আমায় প্রচুর দিচ্ছেন।

সুনয়নী বলিলেন—কি আর দিচ্ছি বাবা আমরা?

শিশির উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মা-ভাই-বোনের স্নেহ যে কেমন তা আমি আপনাদের কাছেই প্রথম জেনেছি। এর মূল্য নিরূপণ তুচ্ছ টাকায় হয় না।

এ' কথার পর আর শিশিরকে টাকা লইতে অনুরোধ করা চলে না। সুনয়নী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তবে এক কাজ কর বাবা, তোমার সকল ভার তোমার মা-ভাইকেই ছেড়ে দাও......

শিশির স্মিতমুখে বলিল—আমার ত সকল অভাব আপনারাই পূর্ণ করেছেন, আর কোথাও কোনো দৈন্য ত নেই।

রজত বলিল—মা বনমালী-দাসের কথা বল্‌ছেন; তার পড়ার খরচ জোগানোর ভারটা তুমি আমাদের হাতে তুলে দাও।

শিশির কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—ওর ভার আমারই থাক। দেশে ত গরিব ছেলের অভাব নেই।

সুনয়নী উঠিয়া গিয়া শিশিরের পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন—তুমি আর আপত্তি কোরো না বাবা; বনমালীকে যা পাঠাতে হয় তা আমরা পাঠাব।

শিশির আর আপত্তি করিতে পারিল না। শুধু বলিল—আমি তাকে মাসে দশ টাকার বেশী দিতে পারিনি।

রজত বলিল—আচ্ছা আচ্ছা সে হবে এখন।

এমন সময় চাকর আসিয়া এই মাসের নূতন কতকগুলি মাসিকপত্র রজতের হাতে দিয়া গেল।

তাহা দেখিয়াই সন্ধ্যা উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিল—দেখি দেখি কাণ্ডারী এসেছে কি? ঠাকুরপোর লেখা বার হয়েছে?

রজত কাগজগুলি বাছিয়া দেখিল কাণ্ডারী আসিয়াছে, কিন্তু তাতে শিশিরের লেখা নাই।

রজতের মুখ দেখিয়াই সন্ধ্যা বুঝিতে পারিল যে শিশিরের লেখা ছাপা হয় নাই। এতে সন্ধ্যার যেমন একটু প্রচ্ছন্ন অস্বীকৃত আনন্দ বোধ হইল, তেমনি লজ্জা ও দুঃখও বোধ হইল। তার স্বামীর চেয়ে এরা সব কত নিকৃষ্ট যে সংগ্রহ প্রভৃতি উঁচুদরের কাগজের কথা ত দূরে থাক, কাণ্ডারীর মতন যারা অধম লেখকদের কাণ্ডারী তারাও এর লেখা পুছিল না।

ওদের মুখ দেখিয়া শিশিরও বুঝিতে পারিল যে তার লেখার ভাগ্যলিপি কি। সে হাসিয়া বলিল—অধমতারণ কাণ্ডারীও আমার লেখা ছাপ্‌বার উপযুক্ত মনে করে নি—ঠিকই করেছে। এখন আমার লেখা নিয়ে রজত আর টানাটানি করবে না বোধ হয়। আঃ নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁচা গেল! আমায় এই কদিন একেবারে জ্বালাতন করে তুলেছিলে।

রজত সন্ধ্যা সুনয়নী—তিনজনেই শিশিরের এই কথার

মধ্যে পরাজয়ের প্রচ্ছন্ন দুঃখ অনুভব করিল এবং তাতে রজতের কৃতিত্বের ছবি শিশিরের ব্যর্থতার পটভূমিকার উপর আরো স্পষ্ট হইয়া উঠাতে তারা আনন্দ অনুভব করিলেও শিশিরের জন্য দুঃখও বোধ করিল। রজত তাড়াতাড়ি বলিল—যে-মাসে লেখা দেওয়া হয় সে মাসেই যে ছাপা হয় তার ত কোনো মানে নেই। এ মাসে জায়গা আগেই ভরে গিয়েছিল হয়ত।

শিশির হাসিয়া বলিল—প্রত্যেক মাসেই তাদের জায়গা আমার চেয়ে ভালো লেখা দিয়েই ভরবে। তুমি আমায় মিছিমিছি টেনে বার করে অপদস্থ করলে। এ লজ্জা কিন্তু তোমারও।

রজত শিশিরের কথার সত্যতা অনুভব করিল। শিশিরের লেখা প্রকাশ করাইবার আগ্রহ তার এতে আরো বাড়িয়া গেল; সে হাসিয়া বলিল—দেখো দেখো, লজ্জা পেতে হবে না—শিশির-চক্রবর্ত্তীর প্রশংসায় বাংলা দেশ ছেয়ে যাবে; আমরা যাকে ভালো বলেছি, তাকে সকলের আলবৎ ভালো বলতে হবে।

শিশির হাসিয়া বলিল—যতই তুমি push আর boom কর না কেন, রজতের জ্যোতির পাশে শিশিরের এতটুকু চিক্‌চিকে আভা কারো চোখেই পড়বে না।

রজত খুসী হইয়া বলিল—তা আমি কত দিন থেকে লিখছি সেটাও ত দেখতে হবে।

এমন সময় তাদের এই প্রচ্ছন্ন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থামাইয়া দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল বিদ্যুৎ। তাকে দেখিয়াই সন্ধ্যা হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—কি রে, তুই আজ অদিনে অক্ষণে এসে উপস্থিত যে?

বিদ্যুৎ একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল—মা'র অসুখ করেছে, তাই মা আনতে পাঠিয়েছিলেন।

রজত শিশিরের দিকে কটাক্ষ করিয়া হাসিয়া বলিল—অসুস্থ মাকে দেখ্‌বার জন্যে তাই এখানে আসা হয়েছে!

বিদ্যুৎ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না, তা না, ...আমি মার কাছে শিশির-বাবুর গল্প করেছিলাম, তাই তিনি তাঁকে নেমন্তন্ন-চিঠি দিতে......

রজত হাসিয়া বলিল—আমাদের সঙ্গে এতদিনের আলাপ, কিন্তু আমাকে ত দূরে থাক সন্ধ্যাকেও ত এক-দিনও নেমন্তন্ন করে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। আর শিশিরের বেলা এমন পক্ষপাত!

রজতের কথায় বিদ্যুৎ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মুখ লাল করিয়া নত করিয়া রহিল। শিশিরও অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিল। তার লেখা না ছাপার সকল গ্লানি ছাপাইয়া এই আনন্দ তার অন্তর ছাইয়া ফেলিল।

বিদ্যুৎকে লজ্জিত ও নীরব দেখিয়া সুনয়নী হাসিয়া বলিলেন—তুই স্পষ্ট স্বীকার কর্ না বিদ্যুৎ যে আমো-

জিনিস সকলেরই ভালো লাগে। তাতে লজ্জা কি? আমার শিশিরকে চিনেও ভালো বাসবে না এমন হৃদয়হীন লোক কজন আছে? তুই শিশিরের মতন বর আর কোথায় পাবি? তুই নিজের ঘটকালি নিজে করতে না পারিস আমাদের বলিস, লজ্জা করিসনে।

এত কথার পর বিদ্যুতের সেখানে থাকা ও চলিয়া যাওয়া দুইই কঠিন হইয়া উঠিল। সে ত আগে এত সব কথা তলাইয়া ভাবিয়া ছাখে নাই। সে মার কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় যেদিন শিশিরের কাহিনী বলে সেই-দিন তার মা বলিয়াছিল "একদিন সেই ছেলেটিকে এখানে ডেকে আনিস না, আমি দেখ্‌ব।" আজ তার মাকে অসুস্থ দেখিয়া সে-ই প্রস্তাব করিয়াছিল—"তা মা, আজকেই শিশির-বাবুকে ডেকে পাঠাও না। গল্পস্বল্প করলে তুমি ভালো থাক্‌বে।" তার মা বলিল—"আচ্ছা, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুই নিজে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আয়।" সেই চিঠি লইয়া সে আনন্দে ছুটাছুটি শিশিরকে তাদের বাড়ীতে ডাকিতে আসিয়াছে, ভাড়াটে-গাড়ীটাকে পর্য্যন্ত সে বিদায় ছায় নাই, সেই গাড়ীতেই সে শিশিরকে লইয়া ফিরিবে। শিশিরকে নিজেদের বাড়ীতে লইয়া যাইবার আগ্রহে সে এমনই বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল যে সে ভাবিয়া ছাখে নাই কেহ ইহাতে অন্য কিছু ভাবিয়া তাকে ঠাট্টা করিতে পারে।

এখন রজতের কথায় তার চিত্ত সজাগ হইয়া উঠিল, সে দেখিল কাজটা অত্যন্ত লজ্জাজনক হইয়াছে;—সে ত এতদিন সন্ধ্যার সঙ্গে একসঙ্গে পড়িয়াছে, তারপর হপ্তায় একদিন ছুদিন সন্ধ্যাকে গানবাজনা শিখাইতে সে বহুকাল ধরিয়া সন্ধ্যাদের বাড়ীতে আসিতেছে, অথচ একদিনও সে না সন্ধ্যাকে না রজতকে তার বাড়ীতে লইয়া যাইবার কথা ভাবিয়াছে। কিন্তু শিশিরের সঙ্গে তার আলাপ ভালো করিয়া হয় নাই বলিলেই হয়, মাত্র ছুদিনের পরিচয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইতে আসায় তার প্রতি আগ্রহেরই পরিচয় দেওয়া হইয়া গেছে। তাতে আবার পরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে আসা। শিশিরের বাসায় ত সে যাইতে পারে না, এবং এখানেই তাকে বিকাল-বেলা পাইবে নিশ্চয় জানিয়া সে এখানেই আসিয়াছে। কিন্তু আসিয়া কি বিভ্রাটে পড়িয়া গেল। শিশির তাকে না-জানি কি মনে করিতেছে! বিদ্যুৎ লজ্জায় অত্যন্ত লাল হইয়া বসিয়া রহিল, যেন একটি রূপার প্রতিমা আগুন-আঁচে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এখনি বুঝি গলিয়া যাইবে।

তাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সুনয়নী বলিলেন—দে বিদ্যুৎ, শিশিরকে তোর মায়ের চিঠি দে।

বিদ্যুৎ যেন কলের পুতুলে দম দেওয়ার মতন উঠিয়া গিয়া শিশিরের হাতে চিঠিখানি দিল।

রজত ও সুনয়নীর কথায় শিশিরের অবস্থাও বড় কাহিল হইয়া উঠিয়াছিল। তার প্রতি বিদ্যুতের পক্ষপাত যেমন তার অন্তরে আনন্দের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল, তেমনি দারুণ লজ্জাতেও তাঁকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, বিদ্যুতের হাত হইতে চিঠি লইতে তার হাত আর উঠিতে চাহিতেছিল না। শিশির চিঠি খুলিয়া পড়িল মাত্র, কিন্তু সে যাইবে বা যাইবে না তার কোনো জবাব সে বিদ্যুৎকে দিতে পারিল না, সে চিঠির দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিল। চিঠিটি সংক্ষিপ্ত, তাতে লেখা ছিল—

কল্যাণবরেষু—

তোমার কথা বিদ্যুতের মুখে শুনে অবধি তোমাকে দেখ্‌বার জান্‌বার কৌতূহল হয়েছে। তুমি বিদ্যুতের বন্ধু, আমার পুত্রস্থানীয়। তুমি যদি আজ আমার বাড়ীতে এসে আমাকে দেখা দিয়ে যাও ত সুখী হব। ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীস্বর্ণপ্রভা দেবী (বিদ্যুতের মা)।

শিশির কিছু বলিতেছে না দেখিয়া বিদ্যুতের অবস্থা আরো সঙ্কটময় হইয়া উঠিল। শিশিরের একটা জবাব না লইয়াও ত সে পলাইবার পথ পাইতেছে না।

সুনয়নী হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা লাজুক ছেলে যা হোক! চুপ করে বসে রইলি শিশির? বিদ্যুতের সঙ্গে যা।

শিশির একটি কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখাদেখি বিদ্যুৎও উঠিল। তারা লজ্জিত আরক্ত মুখে কারো দিকে না চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, এমন সময় সন্ধ্যা ছুটিয়া গিয়া কোথা হইতে একটা শাঁখ আনিয়া বাজাইতে লাগিল আর সঙ্গেসঙ্গে রজত হাসিভরা স্বরে উলু দিয়া বাড়ী ভরিয়া তুলিল।

শিশির ও বিদ্যুৎ আর পিছনে না তাকাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সুনয়নী স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাদের দিকে দেখিতে দেখিতে হাসিমুখে বলিলেন—ওদের দুটিতে বিয়ে হলে বেশ হয়।

রজত হাসিয়া সন্ধ্যাকে বলিল—বিয়েটা তুমি ঘটিয়ে দাও না, বেশ ভালো ঘটকী-বিদেয় পাবে।

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—কাউকে ঘটকালি করতে হবে না, ওদের পাকা দেখা হয়ে গেছে।

তেরো

সমস্ত গাড়ীর পথটা বিদ্যুৎ ও শিশির চুপ করিয়াই অতিবাহিত করিল। যে বিদ্যুৎ আবাল্য মেয়ের স্কুলেই পড়িয়া ও মেয়েদের বোর্ডিঙে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, যে একলা পথে ঘাটে বেড়াইতে সঙ্কোচ বা ভয় বোধ

করে না, সে এই একটি লোকের কাছে কেন যে সহজ হইয়া উঠিতে পারে না, তা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শিশির ত সন্ধ্যার সঙ্গে অনর্গল বকে হাসে, কিন্তু এই মেয়েটির কাছে তারও মুখ কেন খোলে না।

বিদ্যুৎদের বাড়ী শ্যামবাজারে। অল্প একটু হাতা-ঘেরা ছোট্ট একটি ছবির মতন বাড়ী। বাড়ীর হাতায় একটু বাগানের আভাস আছে; বাড়ীতে অনেকগুলি পশুপক্ষীও পোষা আছে—বানর কুকুর বেরাল কাকাতুয়া ময়ুরী শ্যামা দয়েল বুল্‌বুল্‌ ক্যানারী।

বিদ্যুৎ গাড়ী হইতে নামিয়া প্রথম কথা কহিয়া শিশিরকে কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে ডাকিল—আসুন।

শিশির সঙ্গে সঙ্গে গিয়া নীচের তলায় থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুৎ তা দেখিয়া আবার কথা বলিল—আপনি ওপরে আসুন।

শিশির বিদ্যুতের পিছনে পিছনে উপরে গিয়া একটি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল একখানি পালঙ্কের উপর একটি বড় তাকিয়ায় ঠেস দিয়া আধশোওয়া অবস্থায় আছেন একটি বিধবা; বয়স তাঁর চেহারা দেখিয়া বুঝিবার জো নাই, বিদ্যুতের মা ত মনেই হয় না, যেন বড় বোন; বিদ্যুতেরই মতন রূপার ন্যায় শুভ্র উজ্জ্বল তাঁর বর্ণ, চোখ তেম্‌নি টানা মাদকতা-ভরা, দেহ তেম্‌নি ছিপ্‌ছিপে

অথচ নিটোল, মুখ তেম্‌নি ধী ও শ্রীতে উজ্জ্বল। কিন্তু শিশিরের কেমন মনে হইল সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন একটা কিছুর অভাব আছে যাতে তাঁকে দেখিয়া মনে ভক্তি আসা ত দূরে থাক সম্ভ্রমও আসে না—রমণীর যে প্রধান ভূষণ হ্রী তার যেন অভাব ঘটিয়াছে। বেশভূষাতেও তাঁর প্রসাধন-পারিপাট্যের আতিশয্য ও বিলাসিতার বাহুল্য শিশিরের রুচি ও দৃষ্টিকে পীড়া দিল।—তাঁর পরণে অতি মিহি ঢাকাই শাদা ফুলপাড় ধুতি, আদ্দির কাপড়ে প্রচুর চিকণের কাজকরা শেমিজ পেটিকোট, আর গায়ে পাতলা মস্‌লিনের কাপড়ে জালিকাটা চিকণের কাজওয়ালা বুকখোলা একটি ব্লাউজ—মিহি কাপড়ের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া জামা শেমিজ ত দেখা যাইতেছেই, অঙ্গের আভাসও প্রকাশ পাইতেছে। এই পরিচ্ছদের কোথাও একটু রঙের আঁজি পর্য্যন্ত নাই, সমস্তই শুভ্র, কিন্তু তবু কেন শিশিরের মনে হইল এই বিলাসের বেশ বিধবার নয়, এ বেশ ভদ্রতাসঙ্গত নয়। কিন্তু তখনি শিশির মনকে বুঝাইল যে সে আবাল্য একবস্ত্রা হিন্দুবিধবা দেখিয়া অভ্যস্ত, এ যুগের নব্যতন্ত্রের বিধবাদের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য তার কাছে নূতন বলিয়াই বিসদৃশ বোধ হইতেছে। তবু এই মহিলাটিকে দেখিয়া শিশিরের মন কিছুতেই প্রসন্ন আনন্দে ভরিয়া উঠিল না; সুনয়নীও ত বিধবা, তিনিও শেমিজ জামা সর্ব্বদা

গায়ে দিয়া থাকেন, তবু সুনয়নীকে দেখিয়াই যেমন তাঁর মধ্যে সে মাতৃত্ব অনুভব করিয়াছিল, এঁর মধ্যে সে সেই ভাবটির সন্ধান পাইল না। তবু ইনি বিদ্যুতের মা, এই মনে করিয়া সে হাত জোড় করিয়া নত হইয়া নমস্কার করিল, সুনয়নীকে প্রণাম করার মতন পায়ের কাছে মাথা নুয়াইতে পারিল না।

ক্ষণপ্রভা বলিলেন—এস বাবা বস। বিদ্যুৎ ফ্যানটা খুলে দে।

শিশির একখানি সোফাতে বসিল। বিদ্যুৎ পাখা খুলিয়া দিয়া মায়ের কাছে পালঙ্কে গিয়া বসিল।

ক্ষণপ্রভা বলিতে লাগিলেন—বিদ্যুৎ ত তোমার কথা বল্‌তে অজ্ঞান, শতমুখে তোমার প্রশংসা করে ফুরোতে পারে না। ও ত আমার কাছে থাকে না, কলেজ অনেক দূর হয় বলে ও কলেজের বোর্ডিঙেই থাকে। আমার হার্ট-ডিজিজ আছে; থাকি থাকি হটাৎ দম বন্ধ হয়ে যায়। কাল অম্‌নি মূর্চ্ছা হয়েছিল, তাই ওকে আনিয়েছিলাম। কাল আবার বোর্ডিঙে চলে যাবে। হপ্তায় হপ্তায় শনিবার বিকেলে এসে সোমবার সকালে যায়। এবার যতটুকু এসে আছে কেবল তোমারি কথা! আমার ত যে-রকম ব্যামো, এই আছি ত এই নেই। ওকে এখন একটি সৎপাত্রের হাতে দিয়ে যেতে পার্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজি। আমাদের ত আত্মীয়

স্বজন কেউ নেই, আমি চোখ বুজ্‌লে বিদ্যুৎকে একলা সংসারে দাঁড়াতে হবে। তখন যাতে নিজেকে অসহায় না মনে করে তার জন্তেই ওকে মেয়েদের কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছি। চোখ মুখ ফুট্‌লে আপনাকে আপনি ও চালিয়ে নিতে পার্‌বে। তোমাদের মতন ওর দু একজন বন্ধু আছে জেনে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পার্‌ব—আমার অবর্ত্তমানে ওকে দেখ্‌বার শোন্‌বার লোকের অভাব হবে না। শনিবার শনিবার বিদ্যুৎ এখানে আসে; সমস্ত রোব্‌বারটা ও একলা থাকে। তুমি যদি রোব্‌বার রোব্‌বার আস ত আমি খুসী হব।—তোমরা একই ক্লাসে পড় শুনেছি; তুমি ভালো গাইতে বাজাতে পার তাও শুনেছি; তুমি এলে বিদ্যুতের অনেক বিষয়ে আলোচনা করে শেখ্‌বার সুবিধা হবে। মেয়েমানুষ হাজার লেখাপড়া শিখ্‌লেও কুণো থেকে যায়; পুরুষের সঙ্গে পৃথিবীর অবাধ যোগ; পুরুষের মুখে ছাড়া পৃথিবীর খবর জান্‌বার সুযোগ মেয়েদের ত বেশী হয় না। তুমি মাঝে মাঝে এলে বিদ্যুৎ অনেক উপকার পাবে। আর তোমারও ত এখানে বড় কেউ আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব নেই শুনেছি; লোকের সঙ্গ বিনা মন শুক্‌নো হয়ে ওঠে; এখানে এসে দুদণ্ড কথাবার্ত্তা করে গেলে তোমারও মনটা ভালো থাক্‌বে।

ক্ষণপ্রভা একাই গড়গড় করিয়া অনেকগুলা কথা অনর্গল মুখস্থ করিয়া বলার মতন বলিয়া গেলেন। তাঁর কথার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে শিশিরের সঙ্গে বিদ্যুতের বিবাহের প্রস্তাব থাকিয়া থাকিয়া উঁকি মারিতেছিল বলিয়া বিদ্যুৎ মুখ হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, স্বল্পভাষী শিশিরও মাথা নীচু করিয়া নীরব ছিল। আর তাদের কথা বলিবার ফাঁক বা উপলক্ষ্যও ক্ষণপ্রভার কথার মধ্যে কিছু ছিল না।

ক্ষণপ্রভার কথা শুনিয়াও শিশিরের কেমন ভালো লাগিল না। প্রথম সাক্ষাতেই নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা তার কাছে কেমন পণ্যজীবীর দোকানদারি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এ যেন চারে মাছ আসিয়াছে দেখিয়া তাকে টোপ গিলাইয়া বঁড়শীতে গাঁথিবার চেষ্টা।

শিশির চুপ করিয়া আছে দেখিয়া ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎকে বলিলেন—বিদ্যুৎ, শিশিরকে একটু জল খেতে দে।

বিদ্যুৎ উঠিয়া একটি ছোট হাল্কা টেবিল তুলিয়া আনিয়া শিশিরের সামনে রাখিল। তারপর তার উপর এক-খানা ধোয়া ন্যাপকিন বিছাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই সে একখানা জাপানী কাঠের বারকোশে করিয়া এক রেকাবি খাবার ও এক রেকাবি ফল ও একটা কাঁচের গেলাসে জল লইয়া আসিল।

ক্ষণপ্রভা বলিলেন—আগে চা দে।

বিদ্যুৎ শিশিরের দিকে ফিরিয়া বলিল—আপনি ত চা খান না।

শিশির বলিল—না।

ক্ষণপ্রভা বলিলেন—তা হলে গরম দুধ এনে দে।

শিশির ব্যস্ত হইয়া বলিল—না, আমি দুধ খাইনে বড়, দুধ খেতে আমার ভালো লাগে না।

বিদ্যুৎ তার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—আমি সর ছেঁকে এনে দিচ্ছি।

ক্ষণপ্রভা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সর ছেঁকে কেন?

বিদ্যুৎ হাসিয়া বলিল—উনি সর খেতে পারেন না, ঘেন্না করে।

বিদ্যুৎ আবার বাহির হইয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপ্রভা শিশিরকে বলিলেন—তুমি খাও।

শিশির নীরবে লজ্জার সঙ্গে খাইতে আরম্ভ করিল।

বিদ্যুৎ কাঁচের গেলাসে করিয়া গরম দুধ আনিয়া দিল।

ক্ষণপ্রভা বলিলেন—এ সমস্ত খাবার বিদ্যুতের নিজের হাতের তৈরি। তোমায় সব খেতে হবে।

শিশির অপ্রতিভ ভাবে ঈষৎ মুখ তুলিয়া ক্ষণপ্রভার দিকে স্পষ্ট না চাহিয়া বলিল—আমি ত এত খেতে পারব না।

বিদ্যুৎ বলিল—উনি বড্ড কম খান।

ক্ষণপ্রভা বলিলেন—তবে একটু একটু করে সব রকম চেখে দ্যাখো বিদ্যুৎ কেমন রাঁধ্তে বাড়্তে পারে। মেয়েকে আমি শুধু লেখাপড়াই শেখাইনি, ঘরকন্নার কাজও সব শিখিয়েছি। ও যার বাড়ীতে যাবে তার সংসার সুশৃঙ্খলাতেই চালাতে পারবে।

শিশির আহার সমাপ্ত করিয়া হাত গুটাইল।

বিদ্যুৎ জিজ্ঞাসা করিল—আর কিছু খাবেন না ?

শিশির কুণ্ঠিত মুখ তুলিয়া বলিল—না, আর পারব না।

বিদ্যুৎ বলিল—তবে হাত ধোবেন আসুন।

ক্ষণপ্রভা বলিলেন—কোথায় নিয়ে যাবি, ঐখানেই ফিঙ্গার-বৌলটা দে না।

বিদ্যুৎ শিশিরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—না, ও-রকম ম্লেচ্ছাচার উনি ভালো বাসেন না। উনি ভালো করে আঁচাবেন।

ক্ষণপ্রভা হাসিয়া বলিলেন—তুই জানিস তোর বন্ধু কি ভালো বাসেন না-বাসেন। তাই তবে নিয়ে যা।

বিদ্যুৎ পথ দেখাইয়া শিশিরকে বাহিরে লইয়া গিয়া হাতে জল ঢালিয়া দিতে গেল। শিশির ব্যস্ত হইয়া বলিল—আপনি ঘটা রাখুন, আমি ঢেলে নিচ্ছি।

বিদ্যুৎ হাসিয়া বলিল—না, আজ আপনি যে আমার অতিথি।

শিশির পরাস্ত হইয়া ঝুঁকিয়া ঝাঁঝ্‌রার কাছে হাত বাড়াইয়া স্মিত মুখে বিদ্যুতের মুখের দিকে চাহিল; বিদ্যুতও তখন শিশিরের হাতে জল ঢালিয়া দিবার জন্য নত হইয়াছে, উভয়ের মুখ প্রায় পাশাপাশি। শিশির বিদ্যুতের হাতের ঘটী হইতে জল লইয়া হাত পাতিয়া লইতেছিল, কিন্তু তার হৃদয় রসধারায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

শিশির আঁচাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই বিদ্যুৎ হাতের ঘটী মাটিতে রাখিয়া কাঁধ হইতে একখানা ধোয়া তোয়ালে লইয়া শিশিরের হাতে দিল। শিশির হাত মুখ মুছিয়া তোয়ালে বিদ্যুতের হাতে ফিরাইয়া দিয়া আবার ঘরে গেল। পিছনে পিছনে বিদ্যুৎ একখানা ছোট্ট কাশ্মীর কাজকরা পিতলের রেকাবিতে করিয়া কিছু মস্‌লা আনিয়া শিশিরের সাম্‌নে ধরিল।

ক্ষণপ্রভা বলিলেন—পান আনাস্‌ নি বুঝি?

বিদ্যুৎ বলিল– উনি পান খান না।

শিশির আশ্চর্য্য হইতেছিল যে স্বল্পমাত্র পরিচয়ের মধ্যেই বিদ্যুৎ কেমন করিয়া তার পছন্দ-অপছন্দের এত খবর জানিয়া ফেলিতে পারিল। সে কি খায় না-খায়, কি ভালোবাসে না-বাসে, তা জানিয়া সে সেই রকম আয়োজন করিয়াছে। তার সম্বন্ধে কতখানি আগ্রহ থাকিলে তবে সে এতসব খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ

করিতে পারিয়াছে। এতক্ষণ ক্ষণপ্রভাকে দেখিয়া শিশিরের মধ্যে যে অপ্রসন্নতা উদিত হইয়াছিল তা বিদ্যুতের ব্যবহারে দূর হইয়া গেল, তার মুখ আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ক্ষণপ্রভা বলিলেন—বিদ্যুৎ, শিশিরকে তোর ঘরে নিয়ে যা।

একলা বিদ্যুতের সঙ্গে তার ঘরে যাইবার প্রস্তাবে শিশির বিব্রত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ এখন আমি যাই, আমার একটু কাজ আছে।

ক্ষণপ্রভা বলিলেন—তবে রোববার দুপুরবেলা তুমি এইখানে এসে খাবে, তোমার নেমন্তন্ন রইল।

শিশির বলিল—না না, ওসব কেন, আমি নানান কাজে ব্যস্ত থাকি, আস্‌তে পারি কি না-পারি......

ক্ষণপ্রভা চুপ করিয়া রহিলেন, আর অনুরোধ করিলেন না। শিশিরের মনে পড়িল সুনয়নীকে, তিনি কোনো অনুরোধ এমন শিথিল ভাবে করিতেন না, অনুরোধ করিয়া তিনি এমন সহজে নিবৃত্তও হইতেন না, তিনি গায়ে মাথায় হাত দিয়া স্নেহের জোরে হুকুম করিতেন। সে আদেশ অমান্য করা তখন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আর এঁর অনুরোধ যেন ভদ্রতা রক্ষা করা, তার মধ্যে আন্তরিকতার টান নাই।

শিশির আর অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎও বাহিরে গেল।

শিশির বিদ্যুতের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইয়া সিঁড়িতে নামিতে লাগিল।

শিশির দু ধাপ নামিয়াছে, বিদ্যুৎ সিঁড়ির ধারে রেলিং ধরিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু স্বরে বলিল—আপনি আস্‌বেন না?

কথা বলিতে বিদ্যুতের গলা কেন কাঁপিয়া গেল, তিনটি মাত্র কথা বলিতে গিয়াও গলা ধরিয়া আসিল।

শিশির ঘাড় ফিরাইয়া বিদ্যুতের দিকে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। বিদ্যুতের দৃষ্টিতে সে যে কি প্রবল অনুরোধ অনুভব করিল জানি না, সে হাসিয়া বলিল—আস্‌ব।

বিদ্যুতের চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চোদ্দ

এইরূপে শিশিরের আর-একটি আত্মীয় লাভ হইল। রজতের ঠাট্টা সহ্য করিয়া, ক্ষণপ্রভার প্রতি অহেতুক প্রবল বিরাগ অগ্রাহ্য করিয়া সে এখন প্রতি শনিবারে হরিতকীবাগানে রজতের বাড়ীর সাহিত্য-সঙ্ঘের পরে বিদ্যুৎকে তার শ্যামবাজারের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া তবে চোরবাগানে নিজের বাসায় ফিরে; প্রতি রবিবারে

সে বিদ্যুতের বাড়ীতে যায়। রবিবার রাত্রে বাসায় ফিরিয়াই সে সঙ্কল্প করে এখন কয়েক সপ্তাহ সে আর বিদ্যুৎদের বাড়ীতে যাইবে না, তার সঙ্গে ত সন্ধ্যার বাড়ীতে প্রতি শনিবার দেখা হইবেই। কিন্তু শনিবার বিদ্যুৎকে তার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া সে যখন বিদায় লয় তখনই বিদ্যুৎ তার মিহি আর মিঠা স্বরে যেই বলে—"কাল আসবেন।" অমনি তার সকল সঙ্কল্প কোথায় চলিয়া যায়। ঘন ঘন যাতায়াতে তার ক্ষণপ্রভার প্রতি বিরাগও অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল। রবিবার সকাল হইতেই তার মন ছটফট করিত কখন্ বিকাল হইবে। সন্ধ্যার কাছে গিয়া সে হাসে বকে ঠাট্টা করে, কিন্তু বিদ্যুতের কাছে গিয়া সে হয় শুধু চুপ করিয়া বসিয়া ক্ষণপ্রভার অনর্গল বক্তৃতা শোনে, নয় বিদ্যুতের গান শোনে, নয় নিজের গান শোনায়—বিদ্যুতের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হয় অল্পই। কিন্তু সেই অল্প কথার মধ্য দিয়াই শিশির বুঝিতে পারে বিদ্যুৎ কত বেশী পড়িয়াছে; তার সাহিত্য-রসবোধ কত পরিপক্ব; তার বুদ্ধি কত তীক্ষ্ণ; তার চরিত্র কত দৃঢ়; আর তার হৃদয় কত কোমল গভীর মমতাময়। বিদ্যুতের এইসব গুণের টানেই বোধ হয় শিশিরের মন বিদ্যুতের কাছেই ছুটিয়া যাইতে চায়।

এক শনিবারে শিশির সন্ধ্যাকে পড়াইতেছে, কিন্তু তার মন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে বিদ্যুতের

আগমন। হঠাৎ শিশির বলিল—আজ এইখানেই থাক বৌদিদি, আর ভালো লাগ্‌ছে না।

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—বিদ্যুতের আস্‌তে ত এখনো দেরি আছে ঠাকুরপো।

শিশির হাসিয়া বলিল—দেখুন বৌদিদি, আপনারা সবাই মিলে thought suggestion ক'রে ক'রে আমার মনে বাস্তবিকই সন্দেহ তুলে ধর্‌ছেন হয়ত বা সত্যিই আমি বিদ্যুতের আসার জন্যে বড্ড ব্যস্ত।

সন্ধ্যা হাসিতে হাসিতে বলিল—সত্যি যেটা সেটাকে আর সন্দেহে অস্পষ্ট করে রেখে লাভ কি? দুপক্ষই যখন পরস্পরকে টান্‌ছে তখন মিলনে আর বিলম্ব কর্‌ছেন কেন?

শিশির বলিল—না হয় মেনে নিচ্ছি দুপক্ষ থেকেই টান পড়্‌ছে। কিন্তু বিদ্যুৎকে নিয়ে আমি রাখ্‌ব কোথায়—মেসে?

শিশির তার দারিদ্র্যের ও নিরাশ্রয়তার কথা স্মরণ করাইয়া সন্ধ্যাকে অপ্রতিভ করিয়া তুলিল। সে কোনো উত্তর দিতে না পারিয়া শুধু তিরস্কার করিল—যান, আপনি বড় দুষ্টু। আপনার সঙ্গে আমি কথা কইব না।

শিশির হাসিয়া বলিল—কতক্ষণ?

সন্ধ্যা হাসিয়া ফেলিল। সে ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিবার

জন্য বলিল—হ্যাঁ, ভালো কথা মনে হয়েছে—বিদ্যুৎ আপনার গায়ের মাপ নিয়ে রাখতে বলেছিল।

—হেতু ?

—সে সেলাই শিখছে কিনা, তাই পিরাণ বানাবে। আপনাকে বলতে তার লজ্জা করে, তাই আমার ওপর বরাত।

শিশির বুঝিল তার জামার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই দুই সখীর এই নূতন অভিসন্ধি। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা মাপের ফিতা আনিতে গেল। এমন সময় বিদ্যুৎ আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একলা শিশিরকে দেখিয়া থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সন্ধ্যা কই ?

—পরোপকার ব্রত করবার উদযোগে আছেন।

—সে কি রকম ?

—প্রথম, আপনার হয়ে আমার জামার মাপ নেওয়া ; আর দ্বিতীয়, আমার জামার সংখ্যা বৃদ্ধির সাহায্য করা।

শিশিরের কথায় লজ্জা পাইয়া ও একটু দুঃখও অনুভব করিয়া বিদ্যুৎ মাথা নীচু করিয়া রহিল।

সন্ধ্যা ফিতা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে বিদ্যুৎ এসেছিস! তোর জন্যে ভাই ঠাকুরপো হেদিয়ে সারা হচ্ছিল। এই নে ফিতে, তোর মাপ তুইই নে।

যদি বা বিদ্যুৎ শিশিরের জামার মাপ লইতে পারিত কিন্তু সন্ধ্যার কথার রকমে তার সে পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু সন্ধ্যা ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে বিদ্যুতের হাতে ফিতা গুঁজিয়া দিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া শিশিরের সাম্‌নে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। এর পর মাপ না লওয়াও দুষ্কর। বিদ্যুৎ নত চোখের দৃষ্টি ঈষৎ তুলিয়া শিশিরের দিকে চাহিল। তাহাতেই শিশির বিদ্যুতের মনের ভাব বুঝিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুৎ মাপ লইয়া মৃদু স্বরে তাহা বলিতে লাগিল, এবং সন্ধ্যা হাসি চাপিয়া সেই মাপ এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া লইতে লাগিল।

মাপ লিখিয়া সন্ধ্যা অভিমানের ভান করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল—আমি হলে ঠাকুরপোকে সাধ্‌তে সাধ্‌তে হয়রান হতে হত; আর বিদ্যুৎবরণী সাম্‌নে গিয়ে যেই দাঁড়ানো অম্‌নি বিনা আহ্বানেই ঠাকুরপো উঠে দাঁড়ালেন!

শিশির অপ্রতিভ হইয়া বলিল—যে লোক কথা কয় তার সঙ্গে তর্ক করা চলে; কিন্তু যে বোবা তার সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ বৃথা, সেখানে নীরবে পরাজয় স্বীকার করাই রক্ষা পাওয়ার সহজ পথ।

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—তবে এবার থেকে আমিও বোবা হব।

শিশির কাতরতা দেখাইয়া বলিল—দোহাই বৌদি,

তা হলে আমি দুই বোবার মাঝে পড়ে হাঁপিয়ে মারা যাব।

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—আমরা দুজনেই জামা সেলাই কর্‌ব, কারটা ভালো বলেন

শিশির হাসিয়া বলিল—দুজনেরই সমান ভালো বল্‌ব।

ঘরে হাসির বান ডাকিয়া গেল।

এমন সময় হাতে একখানা কাগুারী লইয়া হাসিতে হাসিতে রজত সেই ঘরে আসিয়া বলিল—শিশির, কি খাওয়াবে বল?

—লেখাটা ছেপেছে? আগে তুমি বল কি রকম ঘুষ দিয়েছ, তবে ত ঠিক কর্‌ব কিরকম খাওয়া তোমার পাওনা।

রজত গর্ব্বিত ভাবে বলিল—তা একটু ঘুষ দিতে হয়েছে—আমার একটা অনেক দিনের পুরোনো লেখা বাতিল হয়ে পড়ে ছিল সেইটে ফাউ দিয়েছি।

—সেটা ফাউ নয়, তোমার লেখার ফাউ হয়ে আমারটা ছাপা হয়েছে। এই ঘুষের জন্যে তোমার পাওনা ঘুষি ছাড়া আর ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

রজত ও শিশির হাসিতে লাগিল। ততক্ষণে সন্ধ্যা রজতের হাত হইতে কাগুারীখানা কাড়িয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিয়াছে আর বিদ্যুৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহা দেখিতেছে।

শিশির জিজ্ঞাসা করিল—সংগ্রহে যে খাতাখানা দিয়েছিলে সেটার কি হল?

—ভূধর-বাবু বল্‌ছিলেন এখনো তাঁর পড়্‌বার সময় হয়নি। হাতে অনেক নামজাদা লেখকের লেখা আছে, তোমারটা এখন ছাপ্‌বার সুবিধে হবে না।

—তবে খাতাখানা সংগ্রহের কবল থেকে সংগ্রহ করে এনো।

—অত ব্যস্ত কেন, থাক্‌ না। কত লোকের লেখা তিন চার বচ্ছর পরে বেরোয়, তোমার গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি চাই যে দেখ্‌ছি।

—আমি গাছেও উঠ্‌তে যাই নি, কাঁদিও চাই নি, আমার হয়ে গাছে উঠ্‌ছ তুমি, কাঁদিও চাচ্ছ তুমি। এত ঝঞ্ঝাটও তুমি পোয়াতে ভালোবাস। নিরীহ খাতা-গুলি বাক্সে বন্ধ ছিল, তাদের টেনে হিঁচ্‌ড়ে বার করে কেন্‌ এ নাস্তানাবুদ করা?

রজত মুরুব্বিয়ানা চালে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—আচ্ছা আচ্ছা, সংগ্রহেও যাতে শিগ্‌গির বেরোয় তার চেষ্টা আমি করব। চল বাইরে ভূধর-বাবুটাবু সব এসেছেন।

রজত শিশিরের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। শিশির একবার কটাক্ষে বিদ্যুতের দিকে চাহিল; ঠিক সেই সময়েই বিদ্যুৎ কাণ্ডারীর পাতা হইতে বাঁকা চোখে

চোরা দৃষ্টিতে শিশিরের দিকে তাকাইল; দুজনের দৃষ্টি মিলিত হইতেই বিদ্যুৎ দৃষ্টি নামাইয়া কাগজের উপর রাখিল, শিশির রজতের সঙ্গে-সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শিশিরকে আসিতে দেখিয়াই দূর হইতেই ভূধর তার ভারি গলায় বলিয়া উঠিল—আসুন আসুন শিশির-বাবু! আমি predict করছি আপনার সাহিত্য-প্রতিভার যশে বাংলা-দেশ অচিরে ভরে যাবে।

রজত একটু গম্ভীর হইয়া গেল। ভূধরের কাছ থেকে এমন প্রাণখোলা প্রশংসা কাহাকেও পাইতে সে দেখে নাই। কিন্তু শিশির মনে করিল উহা ঠাট্টা, ঐ বিশ্বনিন্দুক লোকটি যে তার লেখাকে সত্যই প্রশংসা করিতেছে ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

রজত ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি শিশিরের খাতাখানা পড়েছেন নাকি?

ভূধর বলিল—না……

ভূধরের মুখে "না"টুকু শুনিয়াই ও তার বাক্য সমাপ্তির অপেক্ষা না করিয়াই রজত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং তার হাসির সঙ্গে আর-সকলেই যোগ দিয়া শিশিরকে একেবারে অপ্রস্তুত করিয়া দিল, কেহ আর ভূধরের কথা শেষ করিবারও অপেক্ষা রাখিল না।

ভূধর বলিল—আমি শিশির-বাবুর খাতা না পড়েই প্রেসে কম্পোজ করতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাণ্ডারীতে যে উপন্যাসের সূত্রপাত মাত্র হয়েছে তাই পড়েই আমি বুঝেছি শিশির-বাবুর লেখনীর কি শক্তি কি মোহিনী আছে! এমন ভাষার ওপর দখল, শব্দসম্পদ, বাক্য-বিন্যাসের ঐশ্বর্য্য, এমন ভাববিশ্লেষণ, এই বয়সে অল্প লেখকই দেখাতে পেরেছেন। একেই বলে প্রতিভা!

ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। এ ত ঠাট্টা নয়, হাসিয়া উড়াইবার কথা নয়। শিশির—এই দীন কৃশ স্বল্পভাষী যুবকটির অন্তরে এত ঐশ্বর্য্য এত সম্পদ আছে যে তাকে ভূধরের মতন কঠিন সমালোচকও এমন প্রশংসা করিল! এর শতাংশ প্রশংসাও ত রজত কোনো দিন পায় নাই—'চলতে পারে', 'চলনসই', 'হ্যাঁ, হয়েছে একরকম', বড় জোর 'মন্দ নয়' পর্য্যন্ত রজতের লেখার ভাগ্যে প্রশংসা জুটিয়াছে; তার তুলনায় এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যে অনেক গুণে বেশী! রজতের আত্মম্ভরিতা আহত হইল, তার মন ভূধর ও শিশিরের উপর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তবু সে ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে হাসিয়া পরাজয়ের ভিতর হইতে নিজের কৃতিত্বের বাহাদুরী আদায় করিবার জন্য বলিল—দেখলে হে শিশির, তখন আমার ওপর রাগ করছিলে। আমার জন্যেই ত তোমার এই খ্যাতির সূত্রপাত হল।

শিশির কৃতজ্ঞতায় স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া প্রগাঢ় স্বরে বলিল—তোমার কাছে আমার ঋণের বোঝা ক্রমেই ভারি করে তুল্ছ। এই সৌভাগ্য আমার ছিল বলেই তুমি নিজে বেছে আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলে।

সকলের সাম্‌নে শিশির মুক্তকণ্ঠে রজতের কাছে নিজেকে ঋণী স্বীকার্ করাতে রজতের মন অনেকটা খুশী হইলেও সে শিশিরের কাছে নিজের এই পরাজয় কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না।

ভূধর বলিল—শিশির-বাবু, আমি কাল আপনার বাসা আক্রমণ কর্‌তে যাচ্ছি; আপনার ভাণ্ডার বেহাত হবার আগে আমি সমস্ত লুট করে নিয়ে আস্‌তে চাই। রজত-বাবু কাল আমার লেফ্‌টেনাণ্ট হবেন।

রজত যাও বা কোনো রকমে হাসিতেছিল, এই কথায় সে একেবারে গম্ভীর হইয়া গেল। সে বলিল—কাল ত আমি যেতে পার্‌ব না। আমার অন্য কাজ আছে।

ভূধর রজতের গাম্ভীর্য্য উপেক্ষা করিয়া বলিল—তবে শিশির-বাবু, আমি "একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন!"

শিশির প্রথম সাফল্যের আনন্দে উদ্দীপ্ত ও প্রথম খ্যাতির লজ্জায় কুণ্ঠিত মুখে হাসিয়া বলিল—বেশ ত। কিন্তু নেবার মতন 'রতন' কিছু পাবেন না।

ভূধর হাসিয়া বলিল—যা পাওয়া যাবে তাই যে বাংলা-

দেশে অতীব দুর্লভ। আপনার মনের মন্দিরে বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন হয়ে গেছে।

রজত গম্ভীর হইয়া ছিল, কোনো কথায় যোগ দিতেছিল না; কাজেই তার মোসাহেবেরাও বাক্‌সংযম অভ্যাস করিতেছিল, ভূধরের রসিকতাতেও তাদের গাম্ভীর্য্য টলিল না। কাজেই আজকার সঙ্গত কিছুতেই জমিল না। সকলে সকাল-সকাল বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

পনেরো

সঙ্গত ভাঙিয়া রজত বাড়ীর ভিতর আসিতেই সন্ধ্যা হাসিমুখে গিয়া বলিল—ভূধর-বাবু শিশির-ঠাকুরপোকে কিরকম প্রশংসা কর্‌লেন!

রজত গম্ভীর হইয়া বলিল—ওসব সম্পাদকী চাল। নতুন লেখক বাগাবার ফন্দি!

সন্ধ্যা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—তা ত নয়, প্রথমে ত উনি না পড়েই খাতা ফেরত দিতে চেয়েছিলেন; এখন কাণ্ডারীতে উপন্যাস পড়ে উনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন।

রজত বলিল—কাণ্ডারীতে যেটা ছাপা হয়েছে সেটা কি আর শিশিরেরই লেখা! আমি প্রুফে কেটেকুটে ওর খোল-নলচে বদ্‌লে একরকম চলনসই করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম, তবে না অমন হয়েছে।

শিশিরের নামে যাহা বাহির হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে শিশিরের নহে, তাহা রজতেরই বেনামী বন্ধুকৃত্য, ইহা বিশ্বাস করিয়া সন্ধ্যা দুঃখিতও হইল, সুখীও হইল। এই কৃতিত্ব শিশিরের হইলে সে বেশী সুখী হইত, তাহা নয় বলিয়া তার দুঃখ; আর সেই কৃতিত্বের আসল কর্ত্তা তার স্বামী ইহা মনে করিয়া ও স্বামীর বন্ধুপ্রীতি দেখিয়া সে সুখীই হইল! সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—ও! তাই বল! আমি ত তাই ভাব্‌ছিলাম যে তোমার চেয়েও ভালো লেখা একজন নতুন লেখক কেমন করে লিখ্‌তে পার্‌লে। দুজনের লেখা মিলে ওটা হয়েছে কিনা, তাই ওটা তোমার একার লেখার চেয়েও ভালো উৎরে গেছে!

রজত স্ত্রীর আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিশেষ প্রীত হইতে না পারিয়া গম্ভীর হইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে শুধু বলিল—হুঁ!

সন্ধ্যা স্বামীর গাম্ভীর্য্য লক্ষ্যই না করিয়া ও তার চলিয়া যাওয়া গ্রাহ্যই না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিল—ভূধর-বাবু এইবার আচ্ছা জব্দ হয়ে যাবেন—যেমন না দেখে লেখা ছাপ্‌তে দিয়েছেন তেম্‌নি ঠক্‌বেন। ওখানেও তুমি একটু প্রুফটা দেখে লেখাটা ঠিক করে দিও না। আহা বেচারার যদি একটু খ্যাতি প্রতিপত্তি হয় তোমা হ্‌তে।

রজত স্ত্রীর আনন্দ-কাকলি নিজের গাম্ভীর্য্যের গুমোটে

একেবারে থামাইয়া দিয়া বলিল—তুমি শোওগে, আমার এখন লিখ্‌তে হবে।

সন্ধ্যা স্বামীর কথায় হঠাৎ থামিয়া গেল। সে দেখিল তার স্বামী অত্যন্ত গম্ভীর, তার কথা শুনিবার আগ্রহ তার স্বামীর কিছুমাত্র নাই। সন্ধ্যা মনে করিল, তার স্বামীর মন এখন রচনার ভাবনায় ভরিয়া উঠিয়াছে তাই সে তদ্‌গত-মন হইয়া আছে। তার স্বামীর নূতন স্বষ্টির বেদনার ফল যে তার নূতন কিছু পড়িতে পাইবার আনন্দ ইহাই ভাবিয়া সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। রজত টেবিলের বিদ্যুৎ-আলোটা জ্বালিয়া লিখিতে বসিল—কাণ্ডারীর নূতন সংখ্যার সমালোচনা।

রাত বারোটার পর যেই রজত লেখা সমাপ্ত করিয়া উঠিল, অম্‌নি সন্ধ্যা খাট হইতে তড়াক করিয়া লাফাইয়া নীচে নামিয়া হাসিমুখে সাগ্রহে বলিল—কি লিখ্‌লে দেখি দেখি।

রজত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তুমি এখনো ঘুমোও নি?

সন্ধ্যা প্রীতিভরা হাসিমুখ স্বামীর দিকে তুলিয়া বলিল—ঘুম এল না, তোমার নতুন লেখাটা না পড়ে ত আমার সোয়াস্তি নেই।

রজত গম্ভীর হইয়া বলিল—ওটা বিশেষ কিছু নয়, এ মাসের কাণ্ডারীর সমালোচনা, সংগ্রহের মাসিক সাহিত্য-সমালোচনার জন্যে লিখ্‌লাম।

সন্ধ্যা সাগ্রহে বলিল-- দেখি দেখি, নিজের লেখার নিজে কেমন প্রশংসা করেছ?"

রজত একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—এখন থাক, ওটা আরো বাল করতে হবে।

সন্ধ্যা খাতা কাড়িয়া লইয়া বলিল—সে পরে যা করতে হয় কোরো—আমি এখন একবার পড়ি ত। আমি যার বলে ঐটে পড়বার জন্যে এতক্ষণ জেগে রয়েছি!

রজত আস্তে আস্তে গিয়া শুইয়া পড়িল। সন্ধ্যা পড়িতে লাগিল। এক এক কথায় এক-একটা রচনার ডিক্রি-ডিস্‌মিস করিয়া সে নিজের গল্পটার একটু বড় রকম সমালোচনার প্রসঙ্গে বেশ কড়া কড়া কথাই বলিয়াছে; সব শেষে সবচেয়ে বড় করিয়া শিশিরের উপন্যাসের সমালোচনা লিখিয়াছে—কোথায় কোন্ শব্দ অপ্রযুক্ত, কোথায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে কোন্ বাংলা শব্দ বা পদ অসিদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ, নায়ক-নায়িকার কথাবার্তা যে আগাগোড়া অস্বাভাবিক ও নেকামিভরা, বর্ণনা যে আতিশয্যের ভারে পঙ্গু, লেখক যে হেলে ধরিতে অক্ষম হইয়াও কেউটে ধরিবার প্রয়াসে কিরূপ লোক হাসাইয়াছেন তাহা খুব বিদ্রূপপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটুকাটব্যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই সমালোচনা পড়িয়া সন্ধ্যা মোটেই সন্তুষ্ট না হইলেও কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিয়া

বলিল—করেছ কি ? নিজেই নিজের আর বন্ধুর লেখার মুণ্ডপাত করে ছেড়েছ !

রজত গম্ভীর হইয়া বলিল—ওখানে ত আমি আমির সম্পর্ক রাখিনি—ওখানে লেখক আর সমালোচকের সম্পর্ক। আমরা সাধারণ লেখক হিসাবে যতই বাহবা পাই না কেন, সমালোচকের কাছে সাহিত্যের যে আদর্শ standard আছে তার কষ্টিপাথরে যাচাই করেই না দরের নিরিখ নির্দ্দেশ করতে হবে।

সন্ধ্যার মন স্বামীর প্রতি সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল—তার স্বামী এমন নিরপেক্ষ বিচারক! সন্ধ্যা খুসী মনে উঠিয়া আসিয়া স্বামীকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি ভক্তি প্রশংসা একখানি চুনির পেয়ালায় ভরিয়া তার অধরে ঢালিয়া দিল। রজত তবু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল না, সে গম্ভীরভাবে বলিল—শোও এসে, অনেক রাত হয়েছে, ঘুম পেয়েছে।

ওদিকে সঙ্গতের পরে শিশির বিদ্যুৎকে তার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে যাইবার সময় গাড়ীতে বিদ্যুৎ শিশিরকে বলিল—ভূধর-বাবুর প্রশংসাতে আপনার বন্ধু বিশেষ খুসী হন নি।

শিশির ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, এ প্রশংসার অনেকখানিই ত তারই প্রাপ্য।

বিদ্যুৎ বলিল—রজত-বাবু নিজে প্রধান হয়ে যতক্ষণ

কিছু করতে পারেন ততক্ষণ উনি বেশ, কিন্তু নিজের চেয়ে অপরকে উঁচিয়ে যেতে দেখলে তিনি আর সহ্য করতে পারেন না, এ আমরা ত দুবচ্ছর তাঁকে দেখ্‌ছি।

শিশির কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—না না, আপনি [illegible] সম্বন্ধে বড় uncharitable estimate করে রেখেছেন। রজত অতি উঁচুদরের লোক।

বিদ্যুৎ শিশিরের লোকচরিত্র বুঝিবার অক্ষমতা ও লোকচরিত্রের সাধু উচ্চ দিকটার প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং বন্ধুপ্রীতি দেখিয়া তার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া বলিল—হ্যাঁ, রজত-বাবু উঁচু দরের লোক ততক্ষণই যতক্ষণ তিনি অনুভব করেন তিনি নিজে উঁচু হয়ে আছেন; যে মুহূর্ত্তে তাঁর বোধ হবে আর-কেউ কোনো বিষয়ে তাঁকে উঁচিয়ে বড় হয়ে উঠ্‌ছে সেই মুহূর্ত্তে তিনি নিজে খাটো হয়ে পরকেও খাটো কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন। সূত্রপাতেই আপনার যেরূপ প্রশংসা হচ্ছে, এত আপনার বন্ধুর বরদাস্ত হলে হয়।

শিশির দুঃখিত হইয়া বলিল—আমার লেখা না ছাপ্‌লেই হবে। রজতের বন্ধুত্বের চেয়ে আমার যশ ত বেশী লোভনীয় নয়। এতকাল ত ছাপা হয়নি, না হয় কখনোই হবে না।

বিদ্যুৎ শিশিরের স্বার্থশূন্য বন্ধুবাৎসল্য দেখিয়া তার প্রতি দ্বিগুণ শ্রদ্ধায় অন্তর ভরিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ষোলো

পরদিন বিকাল-বেলা ভূধর গিয়া শিশিরের বাসায় উপস্থিত। সংগ্রহের সম্পাদক নিজে যাচিয়া বাড়ী বহিয়া শিশিরের লেখা লইতে আসিয়াছে এই অভাবনীয় ঘটনায় মেসের ছেলেদের যেমন বিস্ময় বোধ হইল তেমনি ঐ দরিদ্র কুণো মুখচোরা শিশিরটার প্রতি অবহেলা ঘুচিয়া শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল—লোকটা তবে নেহাৎ অবহেলার পাত্র নয়।

শিশির বলিল—দেখুন ভূধর-বাবু, আমার লেখা ছাপ্‌তে দেবার ইচ্ছে নেই; আমি রজতকেও বলেছিলাম, আপনাকেও বল্‌ছি, মাপ করুন।

ভূধর বলিল—এ সঙ্কোচ আপনার মিথ্যা। আজ আপনার 'ফুলের পাথা'র প্রুফ পড়্‌ছিলাম, সে ফুলের পাথারই মতন কারুকার্য্যে সুন্দর, কোমল ফুলকলিকার মতনই তার বচনবিন্যাস; ফুলের সৌরভের মতনই তার অন্তরের ভাবপ্রবাহ! এ একেবারে ওস্তাদের পাকা হাত!

শিশির ম্লান গম্ভীর মুখে বলিল—রজত যে অবুঝের কাজ করেছে তার জন্যেই আমার বড় ভয় হয়েছে, আর আমাকে বিব্রত কর্‌বেন না আমার লেখাপড়ার সময়।

আপনার প্রবল প্রশংসাই আমাকে বেশী করে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

ভূধর তার দরাজ গলায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘরের সমস্ত সমবেত ছেলেরাও হাসিয়া উঠিল। ভূধর বলিল—সমস্ত খাতাগুলি আমার জিম্মা করে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া করুন—বি-এ পাশ করার পর আবার নতুন লিখ্‌বেন।

শিশির তথাপি বিনীত ভাবে বলিল—আমায় মাপ কর্‌বেন ভূধর-বাবু। আপনি প্রশংসা করে নিজে লেখা চাইছেন এমন সৌভাগ্য বাংলা দেশের কটা লেখকের আছে; তাতেও আমার আপত্তি দেখে বুঝ্‌তে পার্‌ছেন আমার আপত্তির কারণ কত গুরুতর।

কালিদাস শিশিরের প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সে শিশিরের এই সঙ্কোচ কিশোরী মাতার প্রথম সন্তান-লাভের সুখকর লজ্জার মতন লেখকের রচনার প্রথম পরিচয়ের শঙ্কা মনে করিল। শিশিরের অলক্ষ্যে তার কতকগুলি রচনার খাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একেবারে ভূধরের হাতে দিয়া সে বলিল—এই নিন ভূধর-বাবু শিশিরের লেখার খাতা। আরো আছে বোধ হয়......

ভূধর খাতাগুলি হস্তগত করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান। এখন আপাতত এতেই চল্‌বে। অতএব বিদায়, পুনর্দর্শনায় চ।

ভূধর শিশিরের ভয়বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। মেসের ছেলেরা আসিয়া কেহ তার কাঁধে হাত রাখিয়া, কেহ পিঠ চাপড়াইয়া, কেহ হাত ধরিয়া নাড়িয়া শিশিরকে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল।

নিরুৎসাহিত ভাবে কালিদাসের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি ভাই কাজটা ভালো করলে না—এর জন্যে আমাকে হয়ত অনেক দুঃখ পেতে হবে।

কালিদাস মনে করিল শিশির বোধহয় কঠোর সমালোচনার নিন্দার ভয় করিতেছে। তাই সে হাসিয়া বলিল—সমুদ্রে পাতিতা শয্যা, শিশিরে কিং করিষ্যতি? সংগ্রহ যার লেখা আগ্রহ করে ছাপাচ্ছে, তার আবার চুনোপুটিকে কিসের ভয়।

শিশির গম্ভীর হইয়া রহিল।

এমন সময় নীচে হইতে কে একজন জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মশায়, এই মেসে কি শিশির-চক্রবর্ত্তী থাকেন?

কালিদাস বলিল—হ্যাঁ। আপনি ওপরে আসুন।

শিশির আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমাকে আবার কার দরকার হল?

উপরে উঠিয়া আসিল দুজন ভদ্রলোক—একজন খুব মোটা বেঁটে, যুবা বয়সেই অথর্ব্ব, গায়ে মটকার পাঞ্জাবী, গরদের চাদর, কিন্তু ঘামে ময়লায় অপরিষ্কার; অপর জন

পাত্লা ছেঁড়া সুশ্রী, তার রং ফর্সা, চোখে চশ্মা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া বড় চুল, ফিটফাট বাবুটি।

মোটা লোকটি বলিলেন—আমার নাম শৈলেন্দ্রনাথ [illegible], আমি মন্দিরের সম্পাদক। আর ইনি শিরীষচন্দ্র মৈত্র, মুদ্রিকার সহকারী সম্পাদক। আমরা কাণ্ডারীতে শিশির-বাবুর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি; ভূধর-বাবুর কাছেও খুব প্রশংসা শুন্লাম। আমরা শিশির-বাবুর কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি—তিনি যদি আমাদের কাগজে দয়া করে লেখা দ্যান। আপনাদের মধ্যে কাঁর নাম শিশির-বাবু?

কালিদাস হাসিয়া বলিল—যে এমন উঁচুদরের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে তার মুখে নিশ্চয় তার ছাপ আছে; আপনারা মুখ দেখে সনাক্ত করুন দেখি।

শৈলেন্দ্র ভদ্রলোক শৈলেন্দ্র-তুল্য দেহ লইয়া হাঁসফাঁস করিতেছিল, সে এই প্রশ্নে ফাঁফরে পড়িয়া গেল। সে ফ্যালফ্যাল করিয়া সকলের মুখের দিকে বারবার করিয়া তাকাইয়াও কাকে যে বিজয়মাল্য দিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শিরীষ কালিদাসকে বলিল—আপনি নিজের মুখে যে-রকম ভাবে প্রশ্ন কর্লেন তাতে আপনি শিশির-বাবু নন, এটা ঠিক। এঁদের মধ্যে ওঁর চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যে লজ্জার সঙ্কোচ দেখে মনে হচ্ছে উনিই শিশির-বাবু।

বলিয়া সে শিশিরকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। সকলে উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিল।

কালিদাস বলিল—আপনারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এসে ঘরে বসুন। কিন্তু এই মাত্র ভূধর-বাবু সব লুটে পুটে নিয়ে গেছেন।

শৈলেন্দ্র হতাশ হইয়া বলিল—অ্যাঁ, সব নিয়ে গেছেন!

শিরীষ হাসিয়া বলিল—লেখকেরা কল্পবৃক্ষ, পুঁজি আজাড় করে নিঃশেষ করবার সাধ্য কারো নেই। থলি ঝাড়্লেই মণি পড়্বে—নিত্য নবনব-উন্মেষশালিনী যে বুদ্ধি তারই নাম ত প্রতিভা।

শিশির শিরীষের বাক্‌পটুতা ও তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া প্রীত হইয়া বলিল—আমার সৌভাগ্য যে আপনারা আমার লেখা ছাপ্তে চাচ্ছেন। কিছু লুকোনো আছে, এনে দিচ্ছি।

মুদ্রিকার মতন প্রথম শ্রেণীর উচ্চ আদর্শের মাসিক পত্রের তরফ হইতেও তার কাছে প্রার্থী আসিয়াছে, এই গৌরব শিশিরের সকল ভয়ের বাধা দূর করিয়া দিল। সে দুটি লেখা লইয়া আসিয়া উৎকৃষ্টতরটি শিরীষের হাতে ও নিকৃষ্টটি শৈলেন্দ্রের হাতে দিল।

শৈলেন্দ্র তাহাই পাইয়া আনন্দিত হইয়া বলিল—আপনার সৌজন্যে আপ্যায়িত হলাম। আপনি মাঝে মাঝে আমাদের আপিসে পদার্পণ করলে আমরা সুখী

হব। আমরা কাজকর্ম্মে বড় ব্যস্ত থাকি, সদাসর্ব্বদা আস্‌বার অবসর পাব না।

শিরীষ হাসিয়া বলিল—আমাদের একটি Wiseacres' Club আছে শিশির-বাবু, আপনাকে আমি মেম্বর করে নেবো—কি বলেন? সোমবার সোমবার সন্ধ্যার পর আমরা মিলি; ক্লাব by rotation প্রত্যেক মেম্বরের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে বেড়ায়, তার স্থায়ী আড্ডা নেই, পাছে স্থগিত হয়ে স্থবির হয়ে পড়ে। আমরা সবাই wiseacre, হেন বিষয় নেই যার আলোচনা কর্‌তে আমরা ভয় পাই—নাস্তিকতা, এনার্কিজ্‌ম্, abolition of marriage and property পর্য্যন্ত সমর্থন কর্‌বার লোকের অভাব আমাদের ক্লাবে নেই। সুতরাং এইটুকু বল্‌তে পারি আমাদের এই জঙ্গম ক্লাবটি মোটেই বাঁধি-বুলি কপ্‌চায় না, সুতরাং একঘেয়ে নয়।

শিশির শিরীষের কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে তার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বলিল—বেশ ত! আমাকেও যে আপনি wiseacre বলে এত শিগ্‌গির ধর্‌তে পেরেছেন এতে আমি খুব খুসী হয়েছি। সবাই প্রশংসা করে করে ধারণা জন্মে দিচ্ছিল আমি বুঝি শুধুই wise। আপনিই ধর্‌তে পেরেছেন যে আমি acre-জোড়া wise!

শিরীষ হাসিয়া বলিল—তা হলে শুভস্য শীঘ্রম্! কাল থেকেই আপনি যাবেন।

শিশির জিজ্ঞাসা করিল—কাল ক্লাব কোথায় জুটবে?

শিরীষ বলিল—কাল আমার বাড়ীতে। আপনি কাল আমার ফ্রেণ্ড হয়ে যাবেন। ক্লাবে আপনার formal introduction হয়ে গেলে পরের হপ্তা থেকে আপনি নেমন্তন্ন-চিঠি পাবেন। মাসে চার আনা চাঁদা দিতে হবে, আর declare করতে হবে I am a free-lance, a free-liver and a free-thinker.

শিশির হাসিয়া বলিল—And why not a free-booter?

শিরীষ বলিল—Yes, we stand for freedom in everything and everywhere! Freedom in thought, speech and action! There's nothing like freedom! We hate forms and formalities, creeds and conventions.

শিশির এই নবাগত সদ্যপরিচিত লোকটির খোলাখুলি ধরণ আর জোরালো আমুদে স্বভাবের পরিচয় পাইয়া মনে করিতে লাগিল সে যেন তার কতকালকার প্রিয় বন্ধু! শিরীষ উঠিয়া শিশিরের হাত ধরিয়া বলিল—Au revoir!

শিশির নীরব হাসিমুখে নমস্কার করিয়া তাদের বিদায় দিল। যাইবার সময় শৈলেন্দ্র ও শিরীষ শিশিরকে সেই বছরের এক এক সেট মন্দির ও মুদ্রিকা উপহার দিয়া গেল।

শিশির জামা-কাপড় বদ্‌লাইয়া বিদ্যুতের বাড়ীতে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময় কাণ্ডারীর সম্পাদক দক্ষিণা-বাবু একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। শিশির কোন্ জন তাহা জানিয়া লইয়া সে বলিল—আপনি আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনি না। কিন্তু আমরা পরস্পরের কাছে একেবারে অপরিচিত নই! আমি কাণ্ডারীর সম্পাদক।

শিশির বলিল—ও!

দক্ষিণা বলিতে লাগিল—আপনার লেখা পেয়ে কাণ্ডারীর শ্রী ফিরে গেছে; অনেক লোকে আগ্রহ করে গ্রাহক হচ্ছে। এ মাসের মুদ্রিকা দেখেছেন কি? তাতে আপনার লেখার খুব প্রশংসা বেরিয়েছে—শিরীষ-মৈত্র মুদ্রিকার সহকারী সম্পাদক, তিনিই সমালোচনা করেছেন। সেই সমালোচনা পড়েই গ্রাহক ঝুঁকেছে।

শিশির বলিল—ও! শিরীষ-বাবু এইমাত্র এখানে এসেছিলেন, সে কথা ত কিছু বল্‌লেন না। মুদ্রিকা দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু আমি এখনো দেখিনি।

শিশির সেই মাসের মুদ্রিকাখানা তুলিয়া লইয়া তার সমালোচনার পৃষ্ঠা খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল—আপনারা সকলেই আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করছেন।

দক্ষিণা বলিল—আমরা আপনার কাছে একটি অনুগ্রহের প্রার্থী হয়েই এসেছি। ইনি আমার বন্ধু—

শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়; মুখার্জ্জি ব্যানার্জ্জি চ্যাটার্জ্জি কোম্পানির বইএর দোকান এঁদেরই। এঁরা আপনার ভুঁইচাঁপার পাব্‌লিশার হতে চান; যদি আপনি অনুমতি ত্যান তা হলে কাণ্ডারীতে যেমন যেমন ছাপা হচ্ছে অম্‌নি অম্‌নি ছেপে যাবেন, কাণ্ডারীতে শেষ দফা ছাপা হবার সঙ্গে-সঙ্গে বইও বেরিয়ে যাবে। আপনাকে ওঁরা শতকরা পঁচিশ টাকা রয়াল্‌টি দিতে রাজি আছেন; কপি-রাইট কিন্‌তেও পারেন; পার্টি খুব honest and reliable, এঁদের সঙ্গে কার্‌বার কর্‌লে আপনাকে ঠকৃতে হবে না।

শিশির বলিল—বেশ, আমি ত এ ক্ষেত্রে এই সগু আর হঠাৎ এসে পড়েছি। যা হয় আপনি রজত-বাবুর সঙ্গে ঠিক কর্‌বেন।

—রজত-বাবুকে বলেছিলাম। তিনি বল্‌লেন পরের টাকাকড়ির বিষয়ে তিনি কোনো কথা কইবেন না; আপনার কাছেই আস্‌তে বলেছিলেন, তাই এসেছি।

শিশির রজতের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। কিন্তু অপরের কাছে নিজের দুঃখ পাছে প্রকাশ পায় এই জন্য সে বলিল—বেশ। আপনারা যে সর্ত্ত বল্‌ছেন তাই ঠিক রইল, আমার কোনো আপত্তি নেই।

শ্যাম বলিল—আপনাকে ক কপি বই দিতে হবে?

শিশির একটু ভাবিয়া বলিল—এই ধরুন খান

পাঁচিশেক—আমার ত বন্ধুবান্ধব কি চেনাশোনা লোক বেশী নেই। সমালোচনার বই ত আপনারাই পাঠাবেন?

শ্যাম বলিল—হ্যাঁ। তা হলে নমস্কার। আজ আসি।

শিশির তাহাদিগকে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিল।

শিশির উপরে আসিতেই কালিদাস তার হাত ধরিয়া বলিল—আমার ভাই আনন্দে নাচ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। The capture of the whole field is so sudden and complete! আমাদের ভাই খাইয়ে দিতে হবে একদিন।

শিশির হাসিয়া বলিল—বেশ্‌! আজই রাত্রে জোগাড় কর—তোমার ওপরেই কিন্তু সে জোগাড়ের ভার। আমাকে এখন একবার বেরুতেই হবে।

কালিদাস হাসিয়া বলিল—শিশিরের স্বচ্ছ বুকে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে! তা আজ থাক; বইএর যেদিন রয়াল্‌টি পাবে সেইদিন ভূরি ভোজ হবে!

একজন লুঙ্গি-পরা লোক আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

শিশির জিজ্ঞাসা করিল—কি চাই?

—আজ্ঞে আমি দপ্তরী। আমি রজতবাবুর সব কাম করি। শুন্‌লাম কাণ্ডারী-প্রেসে আপনার বই ছাপা হবে, যদি আমাকে সেই বই বাঁধ্‌তে দ্যান।

শিশির হাসিয়া বলিল—সে ত আমি কিছু জানিনে। মুখার্জ্জি ব্যানার্জ্জি চ্যাটার্জ্জি কোম্পানি পাব্‌লিশ্‌ করছে, তারা জানে আর দক্ষিণাবাবু জানে।

—আপনি যদি আমাকে দিতে বলেন তা হলেই আমি পাই।

—আচ্ছা, আমি ত তোমায় চিনিনে। রজত-বাবুকে জিজ্ঞাসা করি।

—আমি তাঁর কাছে গিছ্‌লাম। তিনিই আমাকে আপনার কাছে আস্‌তে বল্‌লেন, তিনি বল্‌লেন আমি ও-সবের কিছু জানিনে।

—আচ্ছা, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে যা হয় পরে বল্‌ব।

—সেলাম।

দপ্তরী চলিয়া গেলে শিশির হাসিয়া বলিল—Notorious হবার দায় পোয়াতে হয় ত কম নয়!

কালিদাস বলিল—You must pay the penalty of being great!

শিশির গম্ভীর হইয়া বলিল—আমার বড় ভয় হচ্ছে ভাই, যে, আমার লাভের চেয়ে লোক্‌সান বেশী হবে।

কালিদাস উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

শিশির বলিল—রজত যেন jealous হয়ে দূরে চলে যাচ্ছে।

কালিদাস শিশিরের সন্দেহ ও শঙ্কা হাসির ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া বলিল—পাগল! রজত তোমার এই সফলতায় সবচেয়ে বেশী সুখী, তুমি বুঝতে পারছ না। তুমি নিজেকে এতবড় এখনি ভেবো না যে রজতের মতন established reputationএর লেখক jealous হবে?

কালিদাস শিশিরকে ছোট করিয়া দেওয়াতে শিশির ক্ষুণ্ণ হওয়া দূরে থাক খুশী হইয়া উঠিল; যাক্, তাহা হইলে রজতের সম্বন্ধে তার ধারণা অমূলক! এ ধারণা হইয়াছিল বিদ্যুতের কথায়। এখনি গিয়া বিদ্যুতের সঙ্গে ঝগড়া করিতে হইবে।

শিশির বিদ্যুতের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

সতেরো

ক্রমাগত আগন্তুকদের আক্রমণে শিশিরের অনেক দেরি হইয়া গিয়াছিল। সে যখন বিদ্যুতের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সে উপরে উঠিয়া ক্ষণপ্রভার ঘরে ঢুকিতে গিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, তখন ক্ষণপ্রভা একখানা বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের রূপের প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে হাসিতেছিলেন —সে হাসিতে আর চোখ-মুখের ভঙ্গীতে একটা উগ্র লালসা ও বিলাসিতা জ্বলজ্বল করিতেছিল। মুকুরে

শিশিরের লজ্জিত বিরক্ত মুখের ছায়া পড়িতেই ক্ষণপ্রভা তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোম্‌টা তুলিয়া দিয়া অপ্রতিভ মুখে ফিরিয়া বলিলেন—এস শিশির। বিদ্যুৎ এইমাত্র বেরিয়ে গেল। তোমার আস্‌তে দেরি হল দেখে বল্‌লে —'শিশির-বাবু নিশ্চয় রজতবাবুর বাড়ীতে আট্‌কে গেছেন। আমি সেখানেই যাই।' তোমার এত দেরী হল যে?

শিশির বলিল—কতকগুলি লোক এসেছিল তাই আট্‌কে পড়েছিলাম। আমি তবে এখন যাই।

ক্ষণপ্রভা বলিলেন—তুমি রজতের বাড়ীতে যাও, সেইখানেই বিদ্যুৎকে পাবে।

মার মুখে এইরকম কথা শিশিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

রাস্তায় গিয়া ঠিক করিল সে আজ আর রজতের বাড়ী যাইবে না। কিন্তু শ্যামবাজার হইতে চলিতে চলিতে বিডনষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিতেই তার মনটা বাঁয়ে টানিতে লাগিল এবং শেষ পর্য্যন্ত সে হরিতকীবাগানে রজতের বাড়ীতে গিয়াই উপনীত হইল। সেও গেটের মধ্যে ঢুকিয়াছে আর বিদ্যুতেরও গাড়ী আসিয়া ঢুকিল। গাড়ী হইতে নামিয়া বিদ্যুৎ হাসিয়া বলিল—আমি ত আপনাকেই খুঁজ্‌তে এখানে এলাম।

শিশিরও হাসিয়া বলিল—আমিও ত আপনার বাড়ী থেকে এই আস্‌ছি।

বিদ্যুৎ আগ্রহভরে বলিল—তবে চলুন ফিরে; এই গাড়ীতে।

শিশির হাসিয়া বলিল—একজনের বাড়ীর দরজা থেকে ফিরে যাওয়া কি ভালো?

বিদ্যুৎ সে কথা একটুও ভাবে নাই, শিশিরকে একলা পাইবার আগ্রহেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। এখন শিশিরের কথায় চেতনা পাইয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। আর কথাটি না কহিয়া সে বাড়ীর মধ্যে চলিল; শিশিরও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ঘরে সুনয়নী রজত ও সন্ধ্যা বসিয়া ছিল।

তাদের দুজনকে একসঙ্গে আসিতে দেখিয়াই সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—একেবারে একসঙ্গে জোড়ে যে।

বিদ্যুৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া সন্ধ্যাকে আদরের চড় মারিল। সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—ঠাকুরপো, এ মাসের মুদ্রিকা দেখেছেন? আচ্ছা লোককে ঠকাচ্ছেন কিন্তু! আমাদের কাছে কিন্তু আপনাদের সব জোচ্চুরি ফাঁস হয়ে গেছে।

শিশির সন্ধ্যার কথার অর্থ না বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল—কি রকম?

সন্ধ্যা হাসিতে হাসিতে বলিল—কাণ্ডারীর লেখাটা

ত ঠিক আপনার নয়, অথচ প্রশংসা পাচ্ছেন আপনি!

শিশির আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কে বললে আপনাকে সে লেখা আমার নয়?

সন্ধ্যা চোখে মুখে তেমনি কৌতুকভরা হাসি ছড়াইয়া বলিল—যিনি আপনার co-labourer, যিনি আপনার গণেশ, যিনি প্রুফে আপনার লেখার খোল নল্‌চে বদল করেছেন, সেই আপনার বন্ধু।

সন্ধ্যা অপাঙ্গে রজতের দিকে চাহিল।

শিশির ক্ষণমাত্র অবাক হইয়া রজতের অন্ধকার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়াই সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল—অ্যাঃ! রজত সব ফাঁস করে দিয়েছে বুঝি! এত করে বারণ কর্‌লাম, মন্ত্রগুপ্তির উপদেশ দিলাম, সব মাটি! যখন আপনি শুনেই ফেলেছেন তখন আর বল্‌তে কি—জানেন বৌদিদি—ঐ ভুঁইচাঁপার শিরোনাম আর আমার নামটা ছাড়া ভেতরের পনেরো আনা রজতেরই লেখা। আমি বল্‌লাম ওতে আমার যখন কিছু নেই তখন তোমার নামেই ছাপ্‌তে দাও। শুন্‌লে না কিছুতে, বল্‌লে কাঠামো ত তোমার। তারপর দুজনেরই নাম দিতে সাধ্‌লাম, তাও ধম্‌কে উড়িয়ে দিলে, বল্‌লে তোমার আসরটা জম্‌কে দিতে দাও আমায়। কিন্তু দেখুন, চুরি কতদিন চাপা থাকে, আপনার কাছে

ধরা পড়ে গেছি, বিদ্যুৎও শুন্‌লেন, ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ,—কাল সবাই শুন্‌বে। তখন লজ্জায় মুখ দেখানো ভার হবে।

সন্ধ্যা গম্ভীর হইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—না, না, আমরা ঘরের লোক জানি বলে বাইরের লোক জান্‌বে কি করে?

রজত আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুনয়নী পুত্রের বন্ধুবাৎসল্য দেখিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন—তাতে কি হয়েছে রে শিশির—তুই কি রজতের পর?

শিশির ম্লান মুখে তাঁর দিকে চাহিয়া শুধু বলিল—তা ত আমি জানি মা।

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—আরো মজা হয়েছে জানেন?—উনি সংগ্রহের মাসিক সাহিত্য-সমালোচনায় কাণ্ডারীর সমালোচনা কর্‌তে গিয়ে নিজের নামের আর আপনার নামের নিজের দুটো লেখারই কি প্রচণ্ড কড়া সমালোচনা করেছেন তা যদি দেখেন! পড়বা মাত্রই পাঠকের মনে হবে সমালোচক হিংসে করে কোমর বেঁধে নিন্দে কর্‌ছে, আর অম্‌নি তার মন লেখকের দিকে সহানুভূতিতে ঝুঁকবে। লোককে ফাঁকি দেবার কি রকম ফন্দি!

শিশির অন্তরের তীব্র বেদনা গোপন করিয়া হাসিয়া

বলিল—রজতটা এত ফন্দিও জানে! আমাকে ও বিখ্যাত না করে ছাড়্‌বেই না দেখ্‌ছি।

সুনয়নী বলিলেন—এ ত ওর কর্ত্তব্যই বাবা। ও নিজে বিখ্যাত হয়েছে, ওর ভাইকেও বিখ্যাত দেখ্‌তে চায়।

বিদ্যুৎ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভয়ে লজ্জায় বেদনায় বিরক্তিতে আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। শিশির যে আগাগোড়া বানাইয়া মিথ্যা বলিতেছে এ সে স্পষ্ট বুঝিতেছিল; পাছে এই মিথ্যার প্রলেপ ভেদ করিয়া রজতের হিংসা সত্যমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে সন্ধ্যা ও সুনয়নীর মনে যে কতখানি ক্লেশ বাজিবে, রজত যে নিজের বাড়ীতে মা ও স্ত্রীর কাছে কতখানি হেয় হইয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়াই বিদ্যুতের অসোয়াস্তির অন্ত ছিল না। সে চট করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমার বড় অসুখ করছে, আমি বাড়ী যাই।

সুনয়নী ব্যস্ত হইয়া তার অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কি অসুখ কর্‌ছে রে?

বিদ্যুৎ বলিল—বড় মাথা ঘুর্‌ছে, বুকের মধ্যে কেমন কর্‌ছে। এমন আমার প্রায়ই হয়।

সন্ধ্যা সস্নেহে তার গায়ে হাত রাখিয়া কোমল স্বরে বলিল—এইখানে একটু শুয়ে থাক্; একটু সাম্‌লে তার পর বাড়ী যাস্।

—না, আমি যাই।—বলিয়া বিদ্যুৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।'

শিশির বিদ্যুতের অসুখের সংবাদে মনে মনে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেও এখানে ব্যস্ততা প্রকাশ অশোভন বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিদ্যুৎকে একলা যাইতে দেখিয়া তার আকুলতা আরো বেশী হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে লজ্জাতে বিদ্যুতের সঙ্গ লইতেও পারিতেছিল না। তাকে বাঁচাইলেন সুনয়নী। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—ওরে শিশির, তুই বিদ্যুতের সঙ্গে যা; বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয়; অসুখ কর্‌ছে, একলা যাওয়া ঠিক নয়।

আদেশ মাত্র শিশির ছুটিল।

সুনয়নী সন্ধ্যাকে বলিলেন—মেয়েটা বোধ হয় মায়ের রোগ পেয়েছে—হার্ট-ডিজিজ ত সোজা নয়।

সন্ধ্যা বন্ধুর এই সাংঘাতিক রোগের সম্ভাবনায় ব্যথিত দৃষ্টিতে শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—'তা নয় বোধ হয় মা, গরমেও হতে পারে।' তখনি হাসিয়া বলিল—শিশির-ঠাকুরপোকে নিয়ে ভাগ্‌বার ফন্দিও হতে পারে।

সুনয়নী বধূর কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়াই বিদ্যুৎ শিশিরকে বলিল—এমন মিথ্যে দিয়ে ঢেকে বন্ধুকে কতদিন রক্ষা কর্‌বেন?

শিশির বিদ্যুতের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দেখিয়া মনে মনে খুসী হইয়া বলিল—মিথ্যা কি বল্লাম?

বিদ্যুৎ কথায় জোর দিয়া বলিল—আমার কাছেও আপনি লুকোবেন? আমি কি রজত-বাবুর লেখার ষ্টাইল চিনি না? ভুঁইচাঁপার মধ্যে একটা কথাও রজত-বাবুর নেই, এমন লিখ্তে পার্লে ত তিনি বর্ত্তে যেতেন; পারেন না বলেই ত হিংসে হচ্ছে।

শিশির মাথা নীচু করিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কি কুক্ষণেই রজত আমার খাতাগুলো টেনে বার কর্লে। এখন ত আর নিবারণের কিছুমাত্র উপায় নেই—আজকে আবার সংগ্রহ মুদ্রিকা আর মন্দিরের জন্যেও লেখা নিয়ে গেছে।

বিদ্যুৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—মুদ্রিকা নিয়ে গেছে? বেশ হয়েছে! ওর সঙ্গে ত রজত-বাবুর বিবাদের সম্পর্ক ছাড়া অন্য সম্পর্ক নেই; এবারে কি করে বল্বেন যে মুদ্রিকার প্রুফ তিনি দেখে দিয়েছেন?

শিশির একটু ভাবিয়া বলিল—প্রুফ আমি চেয়ে পাঠাব; আমি ত প্রুফ দেখ্তে জানিনে, রজতকে দেখ্তে দেবো।

বিদ্যুৎ শিশিরের মহত্ত্ব দেখিয়া অবাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী শব্দ করিয়া ছুটিতেছিল, কিন্তু আরোহী দুজন নীরব।

আঠারো

পরদিন কলেজে যাইতেই খগেন তার ময়লা কাঁচি ধুতি আর ঘেমো আদ্দির জামা লইয়া আসিয়া শিশিরের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তার স্বাভাবিক চীৎকারের স্বরে বলিল—রজত-বাবু ত রাতারাতি আপনার খুব নাম করে দিলেন!

শিশির হাসিয়া বলিল—রজত যে খুব বড় kingmaker তা ত আমি প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই জানি।

খগেন খুব মুরুব্বিয়ানা চালে বলিল—রজত-বাবুর কি রকম শক্তি দেখেছেন—নিজের ষ্টাইলটা একেবারে লুকিয়ে ঠিক আপনার ষ্টাইলের সঙ্গে থাপ খাইয়ে আপনার লেখায় গোঁজামিল দিয়েছেন।

শিশির হাসিয়া বলিল—সেইজন্যেই ত রজতের এত খ্যাতি। ওর আশ্চর্য্য বাহাদুরী!

রজত সেখান হইতে দূরে সরিয়া গেল। খগেন গদ্‌গদ হইয়া বলিল—রজত-বাবু আত্মপ্রশংসা শুনে পালালেন।

কালিদাস অবাক্ হইয়া এতক্ষণ খগেন ও শিশিরের কথা শুনিতেছিল। সে বলিল—কে বল্‌লে তোমাকে যে রজতের লেখা ভুঁইচাঁপায় আছে? সত্যি শিশির?

শিশিরের মুখ হইতে কথা বাহির হইবার আগেই খগেন তাড়াতাড়ি বলিল—শিশির-বাবু ঋণ স্বীকার করবেন এমন মনে করবেন না। রজত-বাবুই দুঃখ করে বলছিলেন—'আমি শিশিরকে খেতে দি পরতে দি, মেসের বাড়ীওলা ভাড়া কমিয়েছে বলে ভাঁড়িয়ে মেসের ভাড়া দি, ওর নাম হবে বলে নিজে উপন্যাস লিখে ওর নামে ছাপাই, তা শিশির এমনি নিমকহারাম যে একবার স্বীকার পর্য্যন্ত করে না।' তাই শুনেই ত আমরা জেনেছি।

শিশির বজ্রাহতের মতন স্তম্ভিত হইয়া কালিদাসের মুখের দিকে চাহিল। কালিদাস শিশিরের মনে আঘাতের উপর সান্ত্বনার প্রলেপ দিবার জন্য বলিল—যতসব বাজে কথা! এত খাতা রজত বদলে লেখবার সময় পেলে কবে? ভূধর-বাবু নিজে আমাদের মেসে গিয়ে যে প্রশংসা করেছেন তা ত আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

খগেন বলিল—আরে ভূধর-ফুধর রেখে দিন। সম্পাদকেরা ত যেন রথের ধ্বজা—একেবারে নিষ্কর্ম্মা, কিন্তু তাঁরাই সবার উপরে বসে বাহার মারেন আর সবার আগে লোকের চোখে পড়েন! ভূধর-বাবু দেখছেন শিশির-চক্রবর্ত্তীর নাম হয়েছে, অমনি প্রশংসা করা হচ্ছে প্রসাদ পাবার জন্যে। নিজের কাগজে যার লেখা বেরোয় সে-ই ভালো লেখক!

কালিদাস বলিল—কেন, আগে ত কাণ্ডারীতে বেরিয়েছে; আর তায় প্রশংসা করেই ত তিনি নিজের কাগজে ছাপ্‌ছেন, নইলে ত অবজ্ঞা করে পড়েনই নি আগে।

খগেন উচ্চরবে হাসিয়া বলিল—কাণ্ডারীতে যা বেরিয়েছে তার যে কি রকম প্রশংসা হবে তা এই মাসের সংগ্রহ বেরুলেই দেখ্‌তে পাবেন।

শিশিরের মনে পড়িল সন্ধ্যার কথা। এই যে কটু সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণ আসন্ন হইয়া আসিতেছে তার আঘাত শিখণ্ডীর অন্তরালবর্ত্তী অর্জ্জুনের বাণে ভীষ্মের মতন, সুগ্রীবের অন্তরালে লুক্কায়িত রামচন্দ্রের বাণে বালির মতন, সংগ্রহের আড়ালে রজতের সন্ধান বলিয়া শিশিরের মনে অধিক তীব্র হইয়া বাজিবে বোধ হইতেছিল। আরো কি অপ্রিয় কথা শুনিতে হইবে এই ভয়ে সেখান হইতে সে চলিয়া গেল। কালিদাসও খগেনের বিদ্রূপহাস্য দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বনমালী হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা করিয়া খগেনের সঙ্গে হাসিতে লাগিল। রজত বনমালীকে রাজসাহী কলেজ হইতে ট্রান্সফার লওয়াইয়া কলিকাতায় আনিয়া পড়ার খরচ দিতেছে।

কলেজ হইতে মেসে গিয়াই শিশির প্রায় কান্নার মতন স্বরে কালিদাসকে বলিল—রজত আমায় নানা

রকমে সাহায্য করছে জানি—কিন্তু আমি কি তার কাছে কোনো দিন প্রার্থী হয়ে গিয়েছিলাম? সে স্নেহের ছলনায় ভুলিয়ে আমাকে দান গ্রহণ করাচ্ছে জেনেই আমি গ্রহণ করতে দ্বিধা করিনি। কিন্তু তাও কি আমি অমনি গ্রহণ করেছি, তার বদলে আমি কি কিছুই দিই নি।

কালিদাস বলিল—রজত এমন কথা কখনো বলেনি। ও ঐ খগেনটার মুড়লি। তুমি ওসব কথা কানে তুলো না।

শিশির ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—যেই বলুক ভাই, কথা যখন উঠেছে, আমি আর কারো কিছু বলবার পথ খোলা রাখব না।

শিশির নিজের বিছানায় বসিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। যেসব মাসিকপত্র তার লেখা লইয়া গিয়াছে একে একে তাদের সকলকে চিঠি লিখিল অতঃপর তারা কেউ যেন আর তার লেখা না ছাপে এই তার সনির্বন্ধ অনুরোধ। মুখার্জ্জি ব্যানার্জ্জি চ্যাটার্জ্জি কোম্পানিকেও লিখিল বই যেন না ছাপা হয়। তার পর সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

প্রথমেই সে বিদ্যুৎদের বাড়ীতে গেল। আজ বিদ্যুৎ বাড়ীতে নাই জানা কথা, তবু যদি সে থাকে তবে তাকে বলিয়া আসিবে—সে যে তার জামার মাপ লইয়াছে

তা যেন আর না করে। যদি তার দেখা না পায়, তার মাকে বলিয়া আসিবে। আর কারো কাছে সে হাত পাতিবে না।

বিদ্যুৎদের বাড়ীতে গিয়া দেখিল বিদ্যুৎ নাই; ক্ষণপ্রভাও নাই; শুধু তাদের চাকরটা বাড়ীতে আছে। ক্ষণপ্রভা কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—দুস্‌রা জায়গামে গিয়েসে, শনিচর্‌কো সবেরে আস্‌বে।

শিশির সেখান থেকে ফিরিল। পথে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিল যে রজতদের বাড়ী সে যাইবে কি না। শেষে অন্যমনস্কভাবে দ্বিধার মীমাংসা না করিতে পারিয়াই অভ্যাস-বশতঃ রজতের বাড়ীর দিকেই চলিল।

রজতের বাড়ীতে গিয়াই সে বরাবর সন্ধ্যা বা সুনয়নীর কাছে চলিয়া যাইত। আজ সে রজতের বৈঠকখানায় গিয়া ঢুকিল। সেখানে খগেন বনমালী পূর্ণ আর হেম বসিয়া কি কথা লইয়া খুব হাসিতেছিল; শিশিরকে আসিতে দেখিয়াই সকলে হঠাৎ চুপ করিয়া গেল, কিন্তু তাদের চোখের মুখের হাসির আভা মিলাইল না। শিশির ঘরে ঢুকিয়াই বিনা ভূমিকাতেই বলিল—ভাই রজত, তুমি মাসে মাসে আমার মেসের ভাড়া দাও আমি জান্‌তাম না......

খগেন জনান্তিকে পূর্ণকে বলিল—জান্‌তেন না? ন্যাকা!

কথাটা শিশিরের কানে গেল। সে তাদের লক্ষ্য না করিয়া রজতকে বলিয়া যাইতে লাগিল—আর বাড়ীওলাকে ঘুষ দিও না, কারণ আমি ও-মেস ছেড়ে যাচ্ছি...

খগেন চোখ মটকাইয়া আবার অন্য দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে অথচ শিশিরের শ্রুতিগম্য ভাবে বলিল—বিদ্যুৎ-সুন্দরীর বাড়ীতে নাকি?

শিশির উহাদের অগ্রাহ্য করিয়াই বলিয়া চলিল—আর বনমালীকেও তুমি টাকা দিও না......

বনমালী আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল—অ্যাঁ! আমার কি অপরাধ হল?

শিশির দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বলিল—অপরাধ তোমার কিছু হয়নি; হয়েছে আমার; আমার জন্যেই রজত তোমাকে টাকা দিচ্ছেন; আমি তাঁর কাছ থেকে আর কত নেব, ঢের নিয়েছি। তুমি রাজসাহীতে ফিরে যাবে, সেখানে আমি তোমায় যেমন মাসে দশ টাকা পাঠাতাম তাই পাবে।

বনমালী এতদিন ঐ দশ টাকাই পরম সাহায্য মনে করিয়া শিশিরের অনুগ্রহে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিত; কিন্তু এই এক মাস মাত্র কলিকাতায় আসিয়া রজতের দরাজ হাতের প্রচুর সাহায্য পাইয়া তার মনের খাঁই বাড়িয়া গিয়াছিল, তার স্বভাব বদল হইয়া উঠিয়াছিল। সে শিশিরের কথায় ভয় পাইয়া একবার রজতের মুখের

দিকে চাহিল, দেখিল রজত শিশিরের কথায় বিরক্ত না হইয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে। তাইতেই কি জানি কেন সাহস পাইয়া বনমালী বলিয়া বসিল—আপনার অনুগ্রহ আমি আর চাইনে। আপনাকে দশ টাকাও আর দিতে হবে না। ভারি ত দিতেন তার আবার খোঁটা!

শিশির বনমালীর কথায় স্তম্ভিত হইয়া তার মুখের দিকে অবাক হইয়া এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—বেশ! একটা ঋণ থেকে তুমি আমায় মুক্তি দিলে।......দেখ ভাই রজত, যে-সব কাগজ আমার লেখা ছাপ্‌তে নিয়েছে তাদের সবাইকে আমি ছাপ্‌তে নিষেধ করে চিঠি দিয়েছি। আমি সকলের আপিসে আপিসেও যাব। তুমিও একটু চেষ্টা কোরো যাতে ওরা সেগুলো না ছাপে......

এতক্ষণে রজত কথা বলিল। হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা হলে লোকের ধারণা হবে যে রজত-রায় শিশির-চক্রবর্ত্তীর খ্যাতির ভয়ে সম্পাদকদের ভাঙিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা যাতে তোমার লেখা ফেরত না ছায় এই চেষ্টাই আমি করব।

শিশির হতাশার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল–তুমি আমার ঋণের বোঝা বাড়িয়েই চল্‌বে!

শিশির আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া দালানে

দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল সে অন্দরে যাইবে কি না। একবার মনে করিল এদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া এখনই বাহির হইয়া যায়; কিন্তু সুনয়নী ও সন্ধ্যাকে এমন হঠাৎ ছাড়িয়া যাইতেও তার মন কাঁদিয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে অন্দরের মধ্যেই গেল।

তার ম্লান বিষণ্ণ মুখ দেখিয়াই সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল—ঠাকুরপো, আপনার অসুখ করেছে নাকি?

শিশির বিষণ্ণ হাসিতে তাকে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—না বৌদিদি।

সুনয়নী বলিলেন—বোকা মেয়ে কোথাকার! কলেজ থেকে এসেছে, খিদেয় মুখ শুকিয়ে গেছে। আয় বাবা, খাবি আয়।

শিশিরের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—আমি আর খাব না মা। চলুন বৌদিদি, পড়্‌বেন চলুন।

শিশিরের ভাব দেখিয়াই সুনয়নী বুঝিলেন একটা কিছু কাণ্ড হইয়াছে। তিনি কাছে আসিয়া শিশিরের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—কি হয়েছে রে শিশির?

এমন সময় রজতও বাড়ীর ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। তাকে দেখিয়াই সুনয়নী জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে রজত, কি হয়েছে যে শিশির খেতে চাচ্ছে না?

রজত বলিল—কি জানি, কিছু ত জানি নে।

সুনয়নী আবার শিশিরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কি হয়েছে আমায় বল্‌বিনে বাবা ?

শিশির ম্লান মুখ তুলিয়া একবার রজতের দিকে চাহিল ; তারপর মুখ নত করিয়া বলিল—ক্লাশের ছেলেরা আমায় বিদ্রূপ করে বল্‌ছিল—রজত আমায় খেতে পর্‌তে দ্যায়, বাড়ীর ভাড়া দ্যায়......

সুনয়নী ক্রুদ্ধ হইয়া দৃপ্ত চোখে রজতের দিকে চাহিয়া রূঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—রজত, তারা এমন কথা কেন বলে ?

রজত হাসিয়া বলিল—তোমার যে মিছে রাগ মা, লোকে যদি বলে ত আমরা কি কর্‌তে পারি ?

সুনয়নী তেমনি তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—মেসের ভাড়ার কথা তারা কি করে টের পেলে ?

রজত নিরীহ ভাবে বলিল—মেসের ছেলেরাই কেউ বলে থাক্‌বে।

সুনয়নী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে ছেলের দিকে চাহিয়া শিশিরের দুখানি হাত দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—বাবা শিশির, তোমার তেজস্বী ত্যাগ আর যেচে-নেওয়া দারিদ্রতাকে আমরা ধনের গর্ব্বে স্নেহের ছলনায় অপমান করেছি। তুমি আমাদের ক্ষমা কর।......

শিশির তাঁর পায়ে পড়িয়া বলিল—ওকি মা, ওকি ! আমি যে আপনার ছেলে।

রজত বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল।

সুনয়নী নত হইয়া শিশিরকে পায়ের উপর হইতে তুলিয়া বলিল—তোর আমি মা, সেই ত আমার গর্ব্ব। তোকে খর্ব্ব করে আমিও খর্ব্ব হব না। কিন্তু তুই আমাদের সম্পর্ক একেবারে ছেড়ে দিস নে।

শিশির বলিল—না মা, আমি রোজ বৌদিদিকে পড়াতে আস্‌ব।

সুনয়নী বলিলেন—তোর কাছে আমরা কেবলই নেব, তোকে দেবো না কিছু; আমরা যে বড়লোক, আমরা শুধু নিতেই জানি।

শিশির হাসিয়া বলিল—আপনাদের কাছে যা পেয়েছি মা তা আজীবন চেষ্টা কর্‌লেও শোধ কর্‌তে পার্‌ব না।

সুনয়নী দারুণ গম্ভীর হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, বোধ হইল যেন তাঁর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার মতন হইয়াছিল।

সুনয়নীর এই ন্যায়পরায়ণতা ও দারিদ্র্যের প্রতি সম্মান শিশিরকে ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া দিল; সে সকল ক্ষোভ ভুলিয়া গিয়া প্রসন্ন হাস্যে সন্ধ্যাকে বলিল—চলুন বৌদিদি পড়িগে।

সন্ধ্যা লজ্জায় ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছিল; সে আস্তে আস্তে আপনার ঘরে গিয়া বই লইয়া

বসিল; কিন্তু অন্য দিনের মতন হাসি-তামাসায় গল্পে কথায় তাদের পড়া তেমন জমিল না—আজ যেন শিশির মাষ্টার সন্ধ্যা ছাত্রী, শিশির বক্তা সন্ধ্যা শ্রোত্রী, তাদের মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক নাই।

উনিশ

শিশির নিয়মিত রোজই সন্ধ্যাকে পড়াইতে আসে, কিন্তু সুনয়নী বা সন্ধ্যা কেউই তাকে আর খাইতে অনুরোধ করেন না। রজত চোরের মতন আসিয়া একলাটি খাইয়া হয় বাহির-বাড়ীতে পালায় নয় বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও বেড়াইতে যায়। তার মা যে-রকম গম্ভীর ও স্ত্রী যে-রকম বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাতে তার বাড়ীতে তিষ্ঠানো দায় হইয়াছিল; শিশিরের কাছে মুখ দেখানো আরো মুস্কিল।

রজতের কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া সুনয়নী ও সন্ধ্যা দুজনেরই কেমন ধারণা হইয়াছিল যে শিশিরকে অপমান করার মধ্যে রজতেরও অপরাধ আছে; তাই তাঁরা রজতের কাছে শিশিরের কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই সঙ্কোচ বোধ করেন এবং রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিতে হয় বলিয়া রজতের সঙ্গেও তাঁরা আর মন খুলিয়া কথা বলিতে পারেন না।

এইরূপে রজত নিজের বাড়ীতে নিজের মা ও স্ত্রীর কাছেও কেমন পর হইয়া উঠিতেছিল। এবং ইহা শিশিরের জন্যই ঘটিতেছে বলিয়া রজতের মন শিশিরের উপর অধিকতর অপ্রসন্ন ও প্রতিকূল হইয়া উঠিতে লাগিল।

শিশিরও আর এ বাড়ীতে তেমন স্বচ্ছন্দ মনে করে না; সে আগের মতন সরাসর বাড়ীর মধ্যে চলিয়া আসে না, বাহির হইতে খবর পাঠাইয়া দ্যায় এবং কেহ ডাকিয়া লইয়া গেলে তবে সে অন্দরে সন্ধ্যাকে পড়াইতে যায়। সন্ধ্যাও আগের মতন আর তাকে হাসিয়া তামাসা করিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারে না, সে ছাত্রীর মতন শুধু পড়া করিতেই শিশিরের কাছে যায়। এইরকম অবস্থা শিশিরের ক্লেশকর বোধ হইলেও সে নিয়মিত রোজই আসিত—সে যে ঋণী, ঋণ যতখানি পারে তাকে শোধ করিয়া যাইতেই ত হইবে; এবং এই ঋণ শোধ করিতে তার যত বেশী ক্লেশ হইতেছিল তত তার ঋণের বোঝা হাল্কা হইয়া যাইতেছে মনে করিয়া তার আনন্দই হইতেছিল।

সেদিন শনিবার। শিশির খবর দিয়া বাড়ীর ভিতর আসিতেই সন্ধ্যা আগের মতন উৎফুল্ল হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—ঠাকুরপো, এ মাসের সংগ্রহ দেখেছেন! এইমাত্র আমি পেলাম।

সন্ধ্যার এই আনন্দিত হাসিতে এই সাত দিনের দারুণ গাম্ভীর্য্যের গুমোট, দক্ষিণা বাতাসে বাদল-দিনের অন্ধকার বিষণ্ণতার মতন, দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া গেল; সকল দিক হাসির আলোকে প্রসন্ন পরিষ্কার হইয়া উঠিল; শিশিরের বুক হইতে একটা জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল। সেও হাসিমুখে বলিল—আমি ত এখনো পাইনি বৌদিদি। আমার লেখার সেই সমালোচনাটা বেরিয়েছে বুঝি?

সন্ধ্যা হাসিতে হাসিতে বলিল—হ্যাঁ, একবার পড়ে দেখুন সমালোচনাটা! আপনার ফুলের পাখা উপন্যাসটাও এই মাসে আরম্ভ হয়েছে।

সন্ধ্যা শিশিরের হাতে সংগ্রহখানা দিল। শিশির সমালোচনীর পাতা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তার মুখ চোখ বিস্ময়ে আনন্দে যত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, সন্ধ্যার চোখ মুখও তত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। শিশির দেখিল কাণ্ডারীর সমালোচনায় রজতের লেখাটির নিন্দা ও তার উপন্যাসের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করা হইয়াছে। তার বন্ধু রজত যে নিজেকে খাটো করিয়া বন্ধুকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য কি অপূর্ব্ব স্বার্থশূন্য কঠোর কাজ করিতেছে তাহা ভাবিতে ভাবিতে শিশিরের মন রজতের প্রতি শ্রদ্ধায় প্রীতিতে ভরিয়া উঠিল, তার মন রজতের প্রতি যে একটুও

বিমুখ হইয়াছিল সেই কঠিন অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া উঠিল।

শিশিরের ও সন্ধ্যার মুখের ভাব দেখিয়া অজ্ঞাত আনন্দের ভাগ পাইবার আগ্রহে সুনয়নী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে রে শিশির ?

সুনয়নীর মুখে সেই আগেকার মতন আদরের সম্বোধন শুনিয়া অপরিসীম পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া শিশির বলিয়া উঠিল—দেখুন দেখুন মা, রজতের কীর্ত্তি ! নিজের লেখাটার অকারণ অতিরিক্ত নিন্দা করে আমার তুচ্ছ লেখাটাকে প্রশংসার ঠেলায় স্বর্গে তুলে ধরেছে ! আমি সব কাগজের কাছ থেকে আমার লেখা ফেরত চেয়েছিলাম, সবাইকে গিয়ে বারণ করে এসেছে কেউ যেন আমার কথা না শোনে। ক্রমাগত সব কাগজে লেখা বেরুবে আর ও এইরকম প্রশংসা করবে ঠিক করেছে বোধ হয়।

সুনয়নী পুত্রের অপরাধ ভুলিয়া তার এই প্রায়শ্চিত্তে প্রীত হইয়া বাৎসল্যে অভিষিক্ত স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন—রজত যে তোকে ভাইএর মতন ভালো বাসে। যে যাকে ভালো বাসে সে তাকে যে নিজের চেয়েও শ্রেষ্ঠ উন্নত দেখতে ইচ্ছে করে।

এমন সময় রজত সেখানে আসিয়াই সকলকে উৎফুল্ল দেখিয়া গম্ভীর হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। শিশির তাড়াতাড়ি

আগাইয়া আসিয়া বলিল—এ কি অন্যায় করেছ ভাই রজত!

রজত গম্ভীর হইয়া বলিল—যা সত্য তা বন্ধু হলেও বল্‌তে হবে, নিজের হলেও বল্‌তে হবে—সমালোচকের কর্ত্তব্য যে কঠিন।

শিশির হাসিয়া বলিল—তা বলে কি এম্‌নি পক্ষপাতই কর্‌তে হয়? নিজের লেখা বলে যতদূর সম্ভব নিন্দা আর বন্ধুর লেখার অসম্ভব প্রশংসা! তোমার মতন কি আমার লেখা?

রজত আশ্চর্য্য হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল—কই দেখি?

রজতের এই আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া সকলের মনেই একটু খট্‌কা লাগিল। সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বলিল—আগে ত দুটোরই নিন্দে করেছিলে, এটা আবার বদ্‌লালে কখন্?

রজত সংগ্রহের সমালোচনা পড়িতে পড়িতে গম্ভীর হইয়া বলিল—পরে বদ্‌লে দিয়েছিলাম।

রজত সন্ধ্যার হাতে সংগ্রহ ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—কেমন ঠকিয়েছি তোমাদের!

রজতের বিস্ময় ও গাম্ভীর্য্য যেটুকু খট্‌কা তুলিয়াছিল তাহা রজতের এই হাসি নির্ম্মূল করিয়া অপসারিত করিয়া দিয়া গেল।

এমন সময় বিদ্যুৎ আসিয়া উপস্থিত। সে আসিতেই সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—বিদ্যুৎ, এ মাসের সংগ্রহ দেখেছিস? তাতে ঠাকুরপোর ফুলের পাথা আরম্ভ হয়েছে, আর ভুঁইচাঁপার খুব বেশী-রকম প্রশংসা বেরিয়েছে।

বিদ্যুৎ চোখ মুখ খুসীতে উজ্জ্বল করিয়া একবার শিশিরের মুখের দিকে চাহিয়া সন্ধ্যার হাত হইতে সংগ্রহখানা লইল। সমালোচনা পড়িয়া বলিল—একটুও বাড়িয়ে বলা হয়নি।

শিশির সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিল—ওর আগাগোড়াই বন্ধুপ্রীতির আতিশয্যের অত্যুক্তি।

সন্ধ্যা শিশিরের কথায় মনে মনে খুসী হইয়া স্বামী-সৌভাগ্যের লজ্জা ঢাকিবার জন্য বিদ্যুতের দিকে ফিরিয়া বলিল—তোর হাতে ও কি রে?

বিদ্যুৎ শিশিরের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া বলিল—জামা সেলাই করে এনেছি। তোর সেলাই হয়েছে?

সন্ধ্যা মুস্কিলে পড়িয়া গেল। সে শিশিরের জন্য জামা সেলাই করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু মধ্যে অপ্রীতিকর কথা উঠায় সে আর তাহা শিশিরকে দিতে সাহস করে নাই। সেই অপ্রীতিকর ব্যাপারের স্মৃতিই সে এতক্ষণ হাসি আনন্দ চাপা দিয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ না জানিয়া অনিচ্ছায় সেই স্মৃতিকে আবার জাগরূক স্পষ্ট করিয়া তুলিল।

ইহাতে সন্ধ্যা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া তাড়াতাড়ি বিদ্যুতের গা টিপিল। সন্ধ্যা গা টিপিতেই বিদ্যুৎও থতমত খাইয়া বিব্রত হইয়া একবার সন্ধ্যার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়াই শিশিরের মুখের পানে চাহিল।

শিশির হাসিয়া সন্ধ্যাকে বলিল—আপনার কাজ বার করুন বৌদিদি, এইবার বিস্তের পরীক্ষা হবে।

শিশিরের মুখে সহজ হাসি ও কথা দেখিয়া ও শুনিয়া সন্ধ্যার ভয় দূর হইল, সে তাড়াতাড়ি জামা আনিতে গেল।

বিদ্যুৎ দুটি তসরের পাঞ্জাবী সেলাই করিয়া আনিয়াছে; সন্ধ্যা করিয়াছে দুটি লাল টকটকে রেশমের।

তাহা দেখিয়াই শিশির বলিয়া উঠিল—বৌদিদিরই জিত! অনুরাগের রঙে একেবারে রাঙিয়ে দিয়েছেন! যান ত বৌদি রজতটাকে ধরে আনুন ত, দেখাই তাকে আমার ওপর আপনার অনুরাগ।

তিন জনে খুসী হইয়া হাসিতে লাগিল। সন্ধ্যা উঠিয়া রজতকে খুঁজিতে গেল।

শিশির বিদ্যুৎকে একলা পাইয়া বলিল—আপনাকে আমার একটা অনুরোধ আছে।

বিদ্যুৎ শিশিরের দিকে কোমল দৃষ্টিতে চাহিল।

শিশির কাতর মুখে বলিল—আমি যতদিন না অর্থ উপার্জ্জন করতে পারছি ততদিন আমি আপনাদের বাড়ীতে যাব না, আপনারাও অনুরোধ করবেন না। এ বাড়ীতেও

আমি আসতাম না, শুধু মা বৌদিদি আর আপনাকে এক-সঙ্গে দেখতে পাব বলেই আসব।

শিশির রজতের নাম উল্লেখ না করাতে বিদ্যুৎ বুঝিল যে রজত তাকে কিছু পীড়া দিয়াছে; সেই বেদনা এই অভিমানীকে কাতর করিতেছে। বিদ্যুৎই একদিন শিশিরের দৃষ্টি তার বন্ধুর অপ্রীতির প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই মনে করিয়া বিদ্যুৎ যেমন আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিল তেমনি শিশিরের মনোবেদনার সহানুভূতিতে ও শিশিরকে রবিবারে রবিবারে আর কাছে পাইবে না বলিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ম্লান দৃষ্টিতে শিশিরের দিকে চাহিয়াই সে মুখ নত করিল।

সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল—আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দুজনের কি পরামর্শ হচ্ছে? উনি কোথায় বেরিয়ে গেছেন ঠাকুরপো। ফিরে আসুন তখন আমার অনুরাগের খবর তাঁকে দেবেন, এখন নিজেদের অনুরাগের খবরদারী করুন। আমি কি চলে যাব?......

সন্ধ্যা ছল করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বিদ্যুৎ তার হাত চাপিয়া ধরিল। সে বিদ্যুতের মুখের দিকে ফিরিতেই তার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; বিদ্যুতের একি বিষণ্ণ ম্লান মুখ, দৃষ্টিতে যেন বেদনা ঝরিয়া পড়িতেছে! সে শিশিরের দিকে ফিরিয়া দেখিল শিশির হাসিতেছে বটে, কিন্তু সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ। সন্ধ্যারও মুখ

নিষ্প্রভ মলিন হইয়া গেল; তার মনে হইতে লাগিল এ কি অমঙ্গলময় দুর্য্যোগের অন্ধকার তাদের চারিদিকে ঘনাইয়া উঠিতেছে, যে এত চেষ্টা করিয়াও প্রসন্ন হাস্যের জ্যোতিতে সেই অন্ধকার দূর করিয়া দুর্য্যোগের মেঘ অপসারিত করিতে পারা যাইতেছে না। সে কেমন ভয়ার্ত্ত স্বরে বিদ্যুৎকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে রে?

বিদ্যুৎ হাসি দিয়া বেদনা চাপা দিবার মিথ্যা প্রয়াস করিয়া বলিল—কি আবার হবে? কিছু না।

এমন সময় রজতের চাকর আসিয়া শিশিরকে বলিল—কোচমান লৌট আকে বল্‌লে বাবু থ্যাটর্‌মে গিয়া। বাহারমে যতীন-বাবু আউর কালিদাস-বাবু আসিয়েসেন। বাবু-লোগ আপ্‌নেকে বোলাচ্ছেন।

শিশির উঠিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—উনি থিয়েটারে গেছেন! উনি ত কখনো থিয়েটারে যান না। আজকে সঙ্গে ফেলে উনি থিয়েটারে গেলেন!

বিদ্যুৎ নির্ব্বাক মুখ তুলিয়া একবার সন্ধ্যার দিকে তাকাইল। সন্ধ্যার মুখে একটা কেমন অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কা ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে দুই হাতে সন্ধ্যাকে টানিয়া নিজের পাশে বসাইল। দুইজনেরই অন্তর বিবিধ ভাবসংঘাতে এমন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে কেহই একটিও কথা বলিতে পারিল না।

কুড়ি

রজত সংগ্রহে শিশিরের প্রশংসা পড়িয়াই তখনি গাড়ী জোতাইয়া সংগ্রহ-আপিসে গিয়া হাজির। ঘরে ঢুকিয়াই সে ভূধর-বাবুকে বলিল—আপনি আমার লেখাকে অমন করে বদ্‌লেছেন কেন?

ভূধর বলিল—যা অপ্রকৃত তা আমি ছাপি কেমন করে, সমালোচনাটা সম্পাদকের নামেই যখন বেরোয়?

—তবে আমার নিজের গল্পটার নিন্দাটা রাখ্‌লেন কেন?

—তাতে অযথার্থ কিছু ছিল না বলে।

রজত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া ফেলিল—শিশিরের লেখা পাবার আগে আপনি কখনো এরকম কর্‌তে সাহস করতেন না।

ভূধর এই কথায় অপমানিত বোধ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেও স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই বলিল—দেখুন রজত-বাবু, সংগ্রহের সম্পাদক ভূধর-চট্টরাজের সাহস নেই এ কথা বল্‌বার স্পর্দ্ধা বাংলাদেশের কারো নেই এক আপনার মতন অর্ব্বাচীন বালক ছাড়া। আপনার মধ্যে promise দেখে আপনার লেখা ছাপ্‌তে আরম্ভ করি, তাতে আপনার দম্ভ এতই বেড়ে গেছে, যে, আপনি নিজেকে একটা মস্ত

ক্ষণজন্মা লেখক মনে কর্‌ছেন। শিশির-বাবু এখন যা লিখ্‌ছেন তেমন লেখা আপনার বুড়ো বয়সে লিখ্‌তে লিখ্‌তে কলম ভোঁতা হয়ে গেলেও হবে না।

রজত অপমানিত হইয়া বলিল—তবে থাকুন আপনি আপনার অসাধারণ লেখক শিশিরকে নিয়ে, আপনার সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখ্‌তে চাইনে। জানেন আপনি আমি বেনামী কত গ্রাহকের নামে কত টাকা সংগ্রহকে এতদিন দিয়ে আস্‌ছি?

ভূধর বলিল—এর পর আপনি সম্পর্ক রাখ্‌তে চাইলেও আমার পক্ষে রাখা অসম্ভব হত। আপনার অনুগ্রহের দান না পেলেও সংগ্রহ চল্‌বে, যদি তার নিজের কোনো গুণ থাকে।

রজত রাগে গটগট করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সেখান হইতে খগেন পূর্ণ হেম বনমালী প্রভৃতি তার মোসাহেব স্তাবকদের একে একে সংগ্রহ করিয়া ভূধরের স্পর্দ্ধার বর্ণনা করিতে করিতে তাদের সকলকে শিশির ও ভূধরের বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তার পর বিক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত করিবার জন্য পথে এক হোটেলে ভর পেট খাইয়া রাগটাকে আপাতত চাপা দিল। তখন রজতের বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, বাড়ীতে ঐ যত নষ্টের মূল শিশিরটা আছে, সন্ধ্যাও হয়ত এখনি শিশিরের স্তুতি করিয়া চটা মেজাজ আরো চটাইয়া

তুলিবে। সে জিজ্ঞাসা করিল—বাড়ীতে ত যেতে ইচ্ছে করছে না, কোথায় যাওয়া যায় ?

সবাই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—আজ শনিবার আছে, চলুন থিয়েটারে যাওয়া যাক।

রজত একটু ভাবিয়া বলিল—চলুন।

রজত বন্ধুদের লইয়া থিয়েটারে; ভূধর ত সম্পর্ক চুকাইয়া বসিয়াছে; সঙ্গতে আজ পঙ্গতের নিতান্তই অভাব। মাত্র যতীন ও কালিদাস আসিয়াছে।

কালিদাস শিশিরকে ডাকিয়া বলিল—ব্যাপার কি হে —host থিয়েটারে, guestরা গা-ঢাকা, তার মানে কি ? একি সঙ্গতভঙ্গের নোটিশ ?

শিশির হাসিয়া বলিল—আমি কেমন করে জান্‌ব ভাই ?

—জলখাবারটাই খাইয়ে দাও, তার পর বিদায় হই, মেস থেকে খেয়েও ত আসিনি।

শিশির হাসিয়া বলিল—আমি ত এ বাড়ীর কেউ নেই, তোমাদের মতন একজন বাইরের লোক।

—তবে সরে পড়া যাক।—বলিয়া কালিদাস ও যতীন প্রস্থান করিল।

সুনয়নী চাকরকে বলিলেন বাহিরে বাবুদের খাবার দিয়া আসিতে। চাকর খবর দিল মাত্র দুজন বাবু আসিয়াছিল, তারাও চলিয়া গিয়াছে।

সুনয়নী গম্ভীর হইয়া গেলেন; থালায় থালায় খাবার সাজানো পড়িয়া রহিল।

শিশির বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল চারি-দিকে খাবার-সাজানো থালার মাঝখানে সুনয়নী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, সন্ধ্যা তাঁর পাশে দুঃখের পাষাণ-প্রতিমার মতন দাঁড়াইয়া আছে, বিদ্যুৎ ঘরের মধ্যে একলাটি আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে।

শিশিরের কেমন মনে হইল তার জন্যই এই সুখের সংসারের আনন্দ-মেলা ভাঙিয়া যাইতেছে। সে বলিল—শনির দৃষ্টির মতন আমি যেখানে যাই সেখানকারই সমস্ত সুখ আনন্দ শৃঙ্খলা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। আমি বিদায় চাচ্ছি মা, আমি না এলে সব আবার ঠিক আগের মতন হয়ে যাবে।

সুনয়নী ম্লান মুখে শুধু শিশিরের দিকে চাহিয়াই রহিলেন, কোনো কথা বলিলেন না, তখন কান্না তাঁর বুকের মধ্যে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

শিশির সুনয়নীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। তারপর সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া বলিল—বৌদিদি, আপনাদের ভালোবাসা আমার জীবনের মহৎ সঞ্চয় হয়ে থাকল। আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ আপনারা মনে রাখবেন না।

শিশির মুখ তুলিয়া দেখিল সন্ধ্যার চোখে জল ছলছল

করিতেছে। শিশির নিজের চোখের উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য ফিরিয়া চলিয়া গেল। নীচে গিয়া দেখিল বিদ্যুৎ কাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সে গাড়ীতে উঠিতেছে। শিশির গাড়ীর দরজাটা নিজে বন্ধ করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি একলা যাবেন ?

বিদ্যুৎ বিষণ্ণ স্বরে বলিল—আগেও একলা যেতাম, এখনও একলা যাব।

শিশির নিজের অজ্ঞাতসারে গাড়ীর জান্‌লার ভিতর দিয়া হাত বাড়াইয়া বিদ্যুতের সাম্‌নে পাতিয়া ধরিল। বিদ্যুৎ নিজের ডান হাত শিশিরের হাতের উপর তুলিয়া দিল। শিশির প্রাণভরা আবেগে সেই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এই শেষ দেখা।

বিদ্যুৎ আস্তে আস্তে হাত সরাইয়া লইয়া কোচমানকে বলিল—যাও।

গাড়ী চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে শিশিরও রজতের বাড়ী হইতে বাহির হইল। তার মনে হইতেছিল তার পরম ও চরম পাওয়া আজ তার পাওয়া হইয়া গেছে—মানুষের জীবনে এর চেয়ে আর কত সুখ কত আনন্দ চাই ? সুনয়নীর স্নেহ, সন্ধ্যার প্রীতি, বিদ্যুতের নীরব ভালোবাসা এই দীর্ঘ এক মাস—ত্রিশ ত্রিশটা দিন সে প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিয়াছে, সেই সুদুর্লভ সৌভাগ্য বজায় রাখিয়াই

সে জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইতেছে, এর পরে সকল দুঃখই সে ঐ অনুপম সুখের স্মৃতি দিয়া তুচ্ছ করিয়া তুলিতে সহজেই পারিবে। রজতের যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সে লাভ করিয়াছিল তাহা ক্ষুণ্ণ হইবার আগেই সে যদি সরিয়া পড়িতে পারিত! সে বড় বেশী আশা করিয়াছিল বলিয়া অদৃষ্টদেবতার এই শাস্তি। তবু যে-সম্পদ বাঁচাইয়া রাখিয়া সে সরিয়া পড়িয়াছে তাই তাঁর যথেষ্ট।

পথে বাহির হইয়া মাথার উপর নক্ষত্রপুঞ্জ ও রাস্তার গ্যাসের আলোগুলোকে শিশিরের মনে হইতে লাগিল যেন সন্ধ্যার স্নিগ্ধ প্রীতিতে উজ্জ্বল দৃষ্টি; সন্ধ্যাকালের শীতল বাতাস যেন সুনয়নার হাতবুলানো স্পর্শ; দোকানে দোকানে আগন্তুক পূজার দ্রব্য-আয়োজন যেন বিদ্যুতের নীরব প্রাণের ঐশ্বর্য্য। সে বিশ্বভুবনে ঐ তিনজনের স্নেহছবি পরিব্যাপ্ত দেখিতে দেখিতে ঐ তিনজনের নিকট হইতে ক্রমাগত দূর হইতে দূরেই চলিয়া যাইতে লাগিল। পথের ধারের একটা বাড়ী হইতে হাস্নুহানার তীব্র গন্ধ বাতাসকে যেমন মদির উতলা করিয়া তুলিয়াছিল, শিশিরের মনও তেমনি তীব্র সুখ-দুঃখে উতলা হইয়া উঠিয়াছিল।

একুশ

যে তাদের কেউ নয়, মাসখানেক আগে যাকে চিনিত না, সেই শিশির তাদের যে কত আপনার তাহা সুনয়নী ও সন্ধ্যা আজ স্পষ্ট বুঝিল। শিশিরকে হারানোর বেদনা আরো প্রবল হইয়া উঠিতেছিল এইজন্য যে তার মধ্যে রজতের সঙ্গেও একটা বিচ্ছেদ যেন উঁকি মারিতেছিল। সুনয়নী খাবারের থালার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, সন্ধ্যা তাঁর পিছনে কপাট ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, শিশির যেন তাঁদের প্রাণশক্তি হরণ করিয়া লইয়া গেছে।

এমন সময় কলরব করিতে করিতে রজত তার সহচরদের লইয়া বাড়ীতে ফিরিল। রজতের সাড়া পাইয়াই উচ্চকিত হইয়া সুনয়নী বধূর দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। সন্ধ্যার মুখ হইতে তখন অমূলক আশঙ্কার অন্ধকার দূর হইয়া গিয়া সেই সদাপ্রফুল্ল মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

রজত বন্ধুদের অনুরোধে থিয়েটারে গিয়া স্বস্তি বোধ করিতেছিল না। বাড়ীতে সঙ্গতে সমাগত সাহিত্যিক বন্ধুরা অপেক্ষা করিতেছে, মা ও স্ত্রী উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হইতেছে, শিশির হয়ত মনে করিতেছে তারই ভয়ে সে পলাইয়া বেড়াইতেছে—এইসব চিন্তায় রজতের মন

অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল।- যখন খগেন ও বনমালী ভূধরের আস্পর্দ্ধা ও সংগ্রহের দম্ভ দমন করিবার নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া রজতকে শুনাইতেছিল, তখন রজত বলিয়া উঠিল—আমরা একখানা কাগজ বার করলে কেমন হয়?

খগেন পরম উৎসাহে হাতের উপর হাত পিটিয়া জোরে তালি বাজাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—ঠিক ঠাওরেছেন! A capital idea!

তার চীৎকারে বিরক্ত হইয়া থিয়েটারের অপর দর্শকেরা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—আস্তে মশায় আস্তে!

রজত এই সুযোগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—চলুন বাড়ী যাওয়া যাক; এখনি টাটকা টাটকা প্ল্যানটা ঠিক করে ফেলা যাকগে।

খগেন উৎসাহিত হইয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলুন।

পূর্ণ ও হেম ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—আজ থিয়েটার দেখে কাল প্ল্যান করলে হত না।

খগেন বাধা দিয়া বলিল—না না, শুভস্য শীঘ্রং!

তখন অগত্যা অপ্রসন্ন চিত্তে থিয়েটার ছাড়িয়া তারা রজতের পিছনে পিছনে রওনা হইল।

বাড়ীতে আসিয়াই রজত দেখিল সঙ্গতে আজ কেউ নাই। সে চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যারা আসিয়াছিল তারা না খাইয়াই চলিয়া গিয়াছে, শিশিরও

চলিয়া গিয়াছে, মা তৈরি খাবার সাজাইয়া লইয়া এখনো বসিয়া আছেন।

ভয়ে ও লজ্জায় রজতের মুখ শুকাইয়া গেল। সে অনুচরদের বসিতে বলিয়া শুষ্ক মুখে জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া বাড়ীর ভিতর আসিল। তাকে দেখিয়াই সুনয়না তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিলেন। রজত ভয়ের ভাবটাকে সাহস করিয়া পিছে সরাইয়া সহজ ভাবেই বলিতে চেষ্টা করিল—সঙ্গতের পঙ্গতয়া না খেয়েই চলে গেল মা? শিশির আছে বলে আমি ওদিকে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। আচ্ছা লোক ত শিশির!

সুনয়না তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই নাকি থিয়েটারে গিয়েছিলি, কোচমান বল্‌ছিল।

রজত কুণ্ঠিত হইয়াও সপ্রতিভ ভাবের চেষ্টা করিয়া বলিল—হ্যাঁ মা, অপ্সরা থিয়েটারের ম্যানেজার আমাকে অনেক দিন থেকে একখানা নাটক লিখে দিতে বল্‌ছে, তারি সম্বন্ধে একটু কথা কইতে গিয়েছিলুম। আমার ফিরতে যদি দেরী হয়ে যায় তাই শিশিরকে খবর পাঠিয়ে দিলুম কোচম্যানের হাতে।

সমস্ত রাতের গুমোটের পর ভোরের দিকে বাতাস দিলে যেমন আরাম হয়, রজতের কথায় তেম্‌নি আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া সুনয়নী হাসিয়া বলিলেন—তাই বল!

আমার অভিমানী শিশির ভুল বুঝে কেঁদে কাঁদিয়ে বিদায় নিয়ে গেল!

রজত মিথ্যার দ্বারা মা ও স্ত্রীকে ভুলাইয়া খুসী হইয়া উঠিতে না উঠিতে আবার ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

শিশির চলিয়া গিয়াছে শুনিয়াই রজতের মুখ যে ম্লান হইয়া উঠিল ইহাতে সুখী হইয়া সুনয়নী বলিলেন—তার কথা বলিস্ কেন? আমার পাগ্‌লা ছেলের একটুতেই অভিমান। সে মনে কর্‌লে তুই বুঝি তারই ওপর রাগ করে বাড়ী এলি নে। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে, নইলে তাকে ধরে আন্‌লে হত।

রজত গম্ভীর তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল—কাল আপনিই আস্‌বে সে। আর না আসে ত আমাদের বয়েই গেল।

রজতের এই কথা বন্ধুত্বের অভিমান মনে করিয়া সুনয়নী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তা ত হল। এখন এই তোয়েরি খাবারগুলো তোর সাঙ্গোপাঙ্গদের গেলা।

রজত বাহিরে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও বাইরে, আমার সুদ্ধ পাঁচজনের।

মাছের কচুরি গোটা একখানা মুখে ভরিয়া ভরা গালে খগেন বলিল—আমাদের কাগজের এডিটার ত হবেন রজত-বাবু ঠিকই আছে। কিন্তু কাগজের নাম কি হবে?

রজত হাসিয়া বলিল—আগে আপনারা বলুন।

খগেন একটা গোটা আলুর দমের উপর একখানা গাটা লুচি মুড়িয়া মুখের মধ্যে চালান করিয়া দিয়া হাঁউ হাঁউ করিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল—কাগজের নাম থাক সঞ্জয়।

রজত হাসিয়া বলিল—তার চেয়ে ধনঞ্জয় ঢের ভালো, তার সঙ্গে প্রহারের এসোসিয়েশান আছে।

পূর্ণ বলিল—নাম থাক নারদ।

হেম বলিল—না না, সূত্রপাতেই ঝগ্‌ড়াটেকে ডেকে কাজ নেই।

রজত হাসিয়া বলিল—ঝগ্‌ড়াতেই ত সূত্রপাত।

তখন সকলে উৎসাহিত হইয়া বলিল—ঠিক নাম হয়েছে, নারদই থাক।

রজত বলিল—আমি একটা নাম ঠাউরে রেখেছিলাম —জাহান্নম। তা কাগজের নামটা নারদই থাক; সমালোচনার বিভাগটার নাম জাহান্নম রাখ্‌লেই হবে।

সকলে এই কথায় এমন প্রীত হইয়া অট্টহাস্যে কোলাহল করিয়া উঠিল যে কারণ না জানিয়াও বাড়ীর ভিতরে সন্ধ্যা আনন্দিত হইয়া হাসিয়া সুনন্দাকে বলিল— কটা গুণ্ডাতে মিলে করছে কি!

ক ফর্ম্মার কাগজ হইবে, কাকে কাকে লেখক সংগ্রহ করিতে হইবে, ছবি থাকিবে কি না, মলাটের

চেহারা কি রকম হইবে, কোন্ প্রেসে ছাপা হইবে, কি আকার হইবে, কত পাউণ্ড ওজনের কাগজ দেওয়া হইবে এবং সে কাগজ এন্টিক না আইভরি-ফিনিশ হইবে, ইত্যাদি সমস্যার মীমাংসা করিতে করিতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। তবু কিছুই মীমাংসা হইল না। অবশেষে স্থির হইল কাল বিকেলে কলেজের পর শেষ মীমাংসা করিয়া এই মাসেই কাগজ বাহির করিতে হইবে।

রজত অনুচরদের বিদায় দিয়া অন্দরে শুইতে আসিতেই সন্ধ্যা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—এত রাত পর্য্যন্ত তোমাদের কিসের হট্টগোল হচ্ছিল?

রজত হাসিয়া বলিল—আমরা একখানা কাগজ বার করব ঠিক করেছি।

সন্ধ্যা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল—কবে থেকে বেরুবে? কি নাম রাখ্‌বে?

রজত কৌতুকভরা হাস্যে বলিল—এই মাসেই বেরুবে। নাম রাখ্‌ব মনে করছি সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা খুসী হইয়া স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া আদুরে স্বরে বলিল—না, লক্ষ্মীটি, সবাই কি ভাব্‌বে?

রজত পত্নীকে চুম্বন করিয়া হাসিয়া বলিল—ভাব্‌বে সন্ধ্যার স্বত্বাধিকারী আর সম্পাদক রজতচন্দ্র রায়!

সন্ধ্যা সুখে গদ্‌গদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি

একলা সম্পাদক হবে, না শিশির-ঠাকুরপোরও নাম দেবে?

রজত গম্ভীর হইয়া বলিল—সন্ধ্যার কি এক সম্পাদক রজত-রায় হলেই হবে না, আবার শিশির-চক্রবর্ত্তীকে টানতে হবে?

সন্ধ্যা রজতের গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য না করিয়া তার কথা ঠাট্টা মনে করিয়া তার গলায় হাতখানি জড়াইয়া দিয়া বলিল—না লক্ষ্মীটি ঠাট্টা নয়, সত্যি বল না, শিশির-ঠাকুরপোর নাম কাগজের সম্পাদক বলে দেবে কি না। তোমাদের দুজনের নাম থাকলেই বেশ হবে।

রজত গম্ভীর হইয়া বলিল—ও নতুন লেখক, ওকে কজন লোকেই বা চেনে?

সন্ধ্যা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—তোমার চেয়ে ত আজকাল তার নামই বেশী হয়েছে! যার-তার মুখে এখন তার নাম! আর বাস্তবিকও শিশির-ঠাকুরপোর লেখা তোমার চেয়ে ঢের ভালো।

রজত ঈর্ষায় দগ্ধ হইয়াও কোমল স্বরে বলিল—কিন্তু আমার লেখাই একদিন তোমার কাছে সবার সেরা ছিল সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা স্বামীর মনের ভাব না বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—তোমার কবিতার দুটো লাইনেই তোমার কথার জবাব আছে—

এত যে জ্বলিতেছিল জোনাকি ও তারা,

তপন উদয়ে হায় কোথায় তাহারা ?

রজত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—অন্যে বলে সহ্য হয়, তুমিও সন্ধ্যা শিশিরের হয়ে আমাকে ছোট করবে ? আমি তোমার স্বামী, শিশির তোমার কে ?

সন্ধ্যা স্বামীর কাতর স্বর দুঃখের কৌতুককর ভান মনে করিয়া বলিল—মনে নেই ? যেদিন শিশির-ঠাকুরপোকে তুমি প্রথম এনেছিলে সেদিন তাকে পরিচয় করে দিয়েছিলে সন্ধ্যার শিশির বলে ! আজই ত আমি শিশির-ঠাকুরপোকে লাল জামা দিয়েছি বলে ঠাকুরপো বল্‌লে জামা বৌদিদির অনুরাগের রঙে রঙিয়ে উঠেছে। তুমি আমার স্বামী, সে আমার ঠাকুরপো—দুজনেই যখন আপনার, তখন হক্‌ কথা বল্‌তে হবে ত।

রজত চুপ করিয়া পিছন ফিরিয়া আন্‌লায় জামা খুলিয়া রাখিতে লাগিল।

সন্ধ্যা রজতের মুখে প্রলয়ের অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে না দেখিয়াই আপন মনের আনন্দে অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল আহা, এই কাগজ যদি এক মাস আগে বার করতে তা হলে শিশির-ঠাকুরপোর এতগুলো লেখা বেহাত হয়ে যেত না। গোড়া থেকেই আমাদের কাগজ আসর জম্‌কে বস্‌ত ?

রজত হঠাৎ ফিরিয়া রুষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল—শিশিরের

লেখার স্তাবকদের দেখিয়ে দেবো তার লেখা বাদ দিয়েও আসর জমকানো যায়! বাংলা দেশে একমাত্র তোমাদের শিশিরই লিখতে জানে, আর ত কেউ জানে না! তার লেখা যে কিছু নয় তা মূর্খদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবো।

রজতের রাগ দেখিয়া সন্ধ্যা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া গেল। সে এতক্ষণ বন্ধুর কাছে বন্ধুর প্রশংসা করিয়া কৌতুক করিতেছিল, কিন্তু রজত যে শিশিরের প্রশংসায় এমন অসহিষ্ণু ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ইহাতে সন্ধ্যার লজ্জার ও ক্ষোভের অন্ত থাকিল না। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল রজত শিশিরের শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকার করিতে চায় না, অপরে করিলে সে কষ্ট পায়। সন্ধ্যা সত্য বলিয়া নিজের স্বামীর বিরাগভাজন ত হইলই, কিন্তু তার চেয়েও তার বেশী দুঃখ যে সে শিশিরের প্রতি রজতের মনকে বিমুখ ও প্রতিকূল করিয়া তুলিবার কারণ হইল! সে অনুতপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল সে আর কখনো রজতের কাছে শিশিরের প্রশংসা করিবে না—মিথ্যা বলিয়া নিন্দাও করিবে না, সত্য গোপন করিবে মাত্র।

সন্ধ্যা রজতকে আর-একটি সান্ত্বনার কথাও বলিবার খুঁজিয়া পাইল না। সে অবাক আড়ষ্ট হইয়া লজ্জিতা ব্যথার প্রতিমার মতন দাঁড়াইয়া রহিল।

রজতও আর কিছু না বলিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া

পড়িল। সন্ধ্যাকে একবার ডাকিল না। সন্ধ্যা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোরের মতন বিদ্যুৎ-আলোর চাবি টিপিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া আস্তে আস্তে গিয়া শয্যার একধারে সন্তর্পণে শুইল।

বাইশ

অবস্থায় হীন শিশিরকে সাহায্য করিয়া রজত যে-পরিমাণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল, নির্বান্ধব আত্মীয়হীন একাকীকে মা ও স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়া সে যে-পরিমাণ অহঙ্কার অনুভব করিয়াছিল, এখন নিজের প্রতিষ্ঠিত গৌরবের খর্ব্বতায় ও ভুঁইফোঁড় হঠাৎ-যশস্বীর নিকট পরাজয়ে সেই পরিমাণ ঈর্ষা ও আক্রোশ তার মনের মধ্যে ফুঁশিয়া ফুঁশিয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যার মুখে শিশিরের প্রশংসায় রজত অধিকতর আহত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়া হোক শিশিরের এই উদ্ধত যশের ধ্বজা ধূলায় লুটাইয়া দিতেই হইবে।

পরদিন তার প্রধান স্তাবক খগেনের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য সকাল-সকাল খাইয়া রজত বাহিরে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে। সুনয়নী বলিলেন—ওরে রজত, তুই একবার শিশিরকে পাঠিয়ে দিয়ে তারপর তোর কাগজের আয়োজন করতে যাস্।

রজত গম্ভীর হইয়া বলিল—দেখি, পারি ত যাব।

রজত ঘরে আসিয়া জামা পরিতেছে। সন্ধ্যা ম্লান মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা বলছেন শিশির-ঠাকুর-পোকে চিঠি লিখতে। লিখব কি ?

রজত সন্ধ্যার দিকে না ফিরিয়াই জামার মধ্যে মাথা গলাইতে গলাইতে বলিল—লিখবে কি না তা তুমিই জানো। এর আগে ত অনেকবার লিখেছ, কিন্তু অনুমতি ত নাও নি।

সন্ধ্যা বলিল—তখন তুমি তাঁর ওপর প্রসন্ন ছিলে।

রজত অপ্রতিভ হইয়া বলিল—একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি! কারো লেখা ভালো না লাগলেই লোকটার ওপরও অপ্রসন্ন হওয়া হল ? যেমন শিশিরটা ছিঁচকাঁদুনে, তেমনি হয়েছ তোমরাও!

সন্ধ্যা রজতের এই কথাতেই খুসী হইয়া গিয়া চিঠি লিখিতে বসিল—

ঠাকুরপো,

আপনি যা মনে করে গেছেন তার সব ভুল, সব মিথ্যে! মা বলছেন আসতে, আমি বলছি আসতে, আর উনি স্বয়ং যাচ্ছেন ডাকতে! দোহাই আপনার, আসবেন। নইলে মার কষ্ট হবে, আমি রাগ করব,—এ বলাই বাহুল্য।

আপনার প্রীতিমুগ্ধ বৌদিদি।

সন্ধ্যা চিঠি লিখিয়া রজতের হাতে দিল। রজত বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

রজত শিশিরের বাসায় গিয়া তাকে সন্ধ্যার চিঠি দিয়া তার আশঙ্কা অমূলক করিয়া তার সব অভিমান ভুলাইয়া দিল। শিশির আবার সরল বিশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া রজতের মুখের দিকে চাহিল। রজত বলিল—শুনেছ, আমরা একটা ফন্দি করেছি।

শিশির উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ?

রজত বলিল—আমরা একখানা কাগজ বার কর্‌ছি ; এই মাস থেকেই কাগজ বেরুবে। নাম রাখ্‌ব নারদ, তার কাজ হবে ঝগ্‌ড়া—যার যেখানে অন্যায় বা ত্রুটি দেখ্‌বে তা রেয়াত করে চল্‌বে না। তোমাকেও বন্ধু বলে বাদ দেবে না, জেনে রেখো।

শিশির হাসিয়া বলিল—বেশ্‌ ত! চট্‌পট নামজাদা হয়ে ওঠ্‌বার সুবিধেই হবে।

রজত গম্ভীর হইয়া মুরুব্বির চালে বলিল—আমাদের সমালোচনার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুব হাই হবে।

শিশির তেম্‌নি হাসিমুখে বলিল—ভালোই ত। তাই হওয়াই ত উচিত।

রজত বলিল—তখন কিন্তু রাগ কর্‌তে পার্‌বে না, এ আমি বলে রাখ্‌ছি। আমি নারদ নিয়ে ব্যস্ত, এখন চল্লুম।

শিশির রজতকে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে চলিল।

রজতকে বিদায় দিয়াই শিশির সন্ধ্যার আহ্বানে সহর্ষ মনে তাড়াতাড়ি রওনা হইল।

শিশির বাড়ীর মধ্যে যাইতেই সন্ধ্যা হাসিমুখে আগাইয়া আসিয়া তার সাম্‌নে হাত পাতিয়া বলিল—বক্‌শিশ।

শিশির কৌতুক-হাস্যে বলিল—কিসের?

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল—আপনি যা পেলে সব চেয়ে খুসী হন তাই যদি আপনাকে দিতে পারি?

শিশির উৎসুক হইয়া সন্ধ্যার ঘরের দিকে একবার তাকাইয়া সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিল।

সন্ধ্যা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—ঘরে বিদ্যুৎ আছে কি না তাই উঁকি মেরে দেখ্‌ছেন? আপনার জন্যে তাকে আগে থেকেই আনিয়ে রেখেছি। এরই বক্‌শিশ আমি চাই।

শিশির কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র স্বরে বলিল—নিত্য যে আনন্দ আপনার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত অযাচিত পাচ্ছি বৌদিদি তার জন্যে ত আমি সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ সাঙ্গ করে বসে আছি। এর পরেও দিতে হলে হরিশ্চন্দ্র রাজার মতন নিজেকে বিক্রী করে যে দেবো তারও জো নেই, নিজেকেও আপনাদের কাছে ঢের আগে বিকিয়ে দিয়েছি।

সন্ধ্যার চোখে দুষ্টামির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে কৌতুকভরা হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া বলিল—আপনি আমার কেনা তা হলে। আপনাকে দান-বিক্রয়ের অধিকার আমার। আসুন তবে।

সন্ধ্যা শিশিরের হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া আনিয়া বিদ্যুতের হাতে তার হাত দিয়া বলিল—নে ভাই বিদ্যুৎ, তোকে আমি দিয়ে দিলাম, যত্ন করে রাখিস, এমন রত্ন সচরাচর পাবিনে!

সন্ধ্যার এই ভূমিকায় যে সুখের বান ডাকিল তার প্লাবন শেষ হইল হাসি গল্প গান বাজনার প্রবল প্রবাহে।

মনের সকল গ্লানি নিঃশেষে দূর করিয়া সন্ধ্যার পর যখন শিশির বিদায় লইয়া যাইতেছে তখন সুনয়নী ডাকিলেন—শিশির, শোন্ একবার।

শিশিরকে ডাকিয়া লইয়া পাশের ঘরে গিয়া সুনয়নী জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে, তুই যখন চাকরি করবি তখন মাইনে নিবি, না বেগার খাট্‌বি?

সুনয়নীর প্রশ্নের অর্থ বুঝিয়া শিশির শুধু একটু হাসিল।

সুনয়নী বলিতে লাগিলেন—মাইনে যদি নিস তোকে কি লোকে নিন্দে করবে তখন?

শিশির সুনয়নীর স্নেহের ব্যাকুলতায় প্রীত হইয়া বলিল—মা, আমার ত এখন আর কোনো অভাব নেই।

যা স্কলার্‌শিপ পাই তাতেই চলে ; তা ছাড়া কাগজে লেখার দরুন পাচ্ছি, বইওয়ালারা আগাম টাকা গছিয়ে যাচ্ছে। বনমালীকেও আর কিছু দিতে হয় না।

সুনয়নী এ সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—কিন্তু কালিদাসের কাছে শুন্‌ছিলাম তুই এক বনমালীর বদলে দশটা জুটিয়েছিস— কোন্ গরিব ছেলের বই নেই, কাপড় নেই, স্কুলের মাইনে জুটছে না, কোন্ বিধবার অন্ন জুটছে না, তুই নাকি তাই খুঁজে বেড়াস্।

শিশির হাসিয়া বলিল—আমি নিজে অভাবের দুঃখ জানি যে মা!

সুনয়নী বলিলেন—তাই বল্‌ছিলাম, তোর পুষ্যিদের দিতে তোর পুঁজিতে যদি না কুলোয় ত আমায় বলিস্।

শিশির প্রণাম করিয়া বলিল—অন্নপূর্ণার প্রসাদ পেতে আমার মতন ঢের কাঙাল আমি জুটিয়ে আন্‌ব মা।

শিশির ও বিদ্যুৎ চলিয়া যাওয়ার খানিক পরে রজত বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। আগে রজত বাহির হইতে বাড়ীতে আসিয়াই একেবারে বাড়ীর মধ্যে আসিত, মা ও পত্নীর সঙ্গে প্রথম দুটা কথা না বলিয়া সে অন্য কাজে নিবিষ্ট হইত না। এখন আর সে তেমন করিয়া মা ও স্ত্রীর কাছে ছুটিয়া আসে না—সে বাহিরের ঘরেই বসিয়া থাকে, খাওয়া-শোওয়ার সময় ছাড়া সে বাড়ীর মধ্যে আসে না,

তখনও তাকে আনিতে হয় বারবার ডাকিয়া ডাকিয়া। আজ সে যখন বাড়ীতে ফিরিল তখন সন্ধ্যা মনে করিল আজ সে যখন শিশিরের বাসায় নিজে গিয়া তাকে এই বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছে, তখন সে শিশিরের খোঁজে একবার বাড়ীর মধ্যে এখনি আসিবে; শিশির চলিয়া গিয়াছে জানিতে পারিলেও বাহিরে লুকাইয়া থাকিবার মতন কোনোরকম সঙ্কোচ তার মনের মধ্যে জমা হইয়া থাকিবার কারণ ত আর নাই। সন্ধ্যা উৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু রজত আর বাড়ীর ভিতর আসিল না। সে দেখিতে পাইতেছিল বাহিরে রজতের লেখাপড়া করিবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বাহিরের ঘরেই চলিল।

রজত একলা সেই ঘরে চেয়ারের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। ভূতের ভয়ে মানুষ যেমন করিয়া চমকাইয়া উঠে তেমনি ভাবে রজত ম্লানমুখী সন্ধ্যাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—তুমি এখানে কেন?

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বলিল—তুমিই ত আমাকে ডেকে আনলে। এখানে না এলে ত তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।

রজত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আঃ সন্ধ্যা, এইসব sentimental rubbish নিয়ে মেতে থাকবার বয়স আর

সময় কি আর আছে? কাগজ বার করতে হবে, সেই ধান্দাই এখন মাথায় ঘুরছে।

সন্ধ্যা স্বামীর কথায় ব্যথিত হইয়া বলিল—তুমি ত কিছু করছ না, চুপ করেই ত বসে আছ, এই সময়টুকুও ত বাড়ীর ভেতর থাকতে পারতে।

রজত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল সাধে কি মেয়েমানুষকে লোকে নির্ব্বোধ বলে! চিন্তা না করলে কাজ হবে কেমন করে? চিন্তাটাই যে কাজের গোড়া!

কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যার নজর পড়িয়াছিল টেবিলের উপর একখানা চিঠির উপর। সেই চিঠিতে শিশিরের নাম দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া সন্ধ্যা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল—

"শিশির-বাবুর লেখার নিছক নিন্দা সংগ্রহে ছাপিতে না পারিয়া আমি আপনার ঈর্ষাদিগ্ধ কটু সমালোচনার পরিবর্ত্তে আমার নিজের অভিমত ছাপিয়াছিলাম। তাহার জন্য আপনি আমার আপিসে আসিয়া অর্ব্বাচীনের মতন আমাকে অপমানসূচক কথা বলিয়া ঝগড়া করিয়া গেলেন······

এইটুকু পড়িয়াই আরো কৌতূহলী হইয়া অত্যন্ত আগ্রহে সমস্ত চিঠিখানা পড়িবার জন্য সন্ধ্যা হাত বাড়াইল। সন্ধ্যাকে অন্যমনস্ক দেখিয়াই রজত তার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল কোথায় তার দৃষ্টি পড়িয়াছে, আর সেই

সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত প্রসারিত হইয়া কি ধরিতে যাইতেছে। রজত চট করিয়া ভূধরের চিঠিখানা সরাইয়া লইয়া বলিল —সব জিনিস তুমি ত্যাখো কেন?

সন্ধ্যা বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিষাদিত স্বরে বলিল—আমার কাছ থেকে গোপন কর্‌বার মতন জিনিসও তোমার আছে তা ত এতদিন জান্‌তাম না।

রজত চুপ করিয়া রহিল। সন্ধ্যা টেবিলের উপর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার সমস্ত অন্তর ব্যথিত অভিমানে কান্নায় ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে রজত বলিল—বাড়ীর ভেতর যাও, এখনি কেউ এসে পড়্‌বে।

সন্ধ্যা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল। তার স্বামীর তাকে ঘর হইতে বিদায় করিবার আগ্রহ সন্ধ্যাকে বড় নিষ্ঠুর আঘাত করিল। দু বৎসর তাদের বিবাহ হইয়াছে, এতদিন সন্ধ্যাকেই যে স্বামীর হাতের মুঠি হইতে আঁচল ছাড়াইয়া অনেক সাধ্য-সাধনায় ছুটি লইয়া ঘরকন্নার কাজে শাশুড়াকে সাহায্য করিতে যাইতে হইত; আর আজ তার কাছে যাচিয়া গিয়াও তার বিদায় করিবার জন্যই যত আগ্রহ! সন্ধ্যার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, তার মন মাথা কুটিয়া প্রশ্ন করিতেছিল—

কেন এমন হইল? কিসে এমন হইল? সন্ধ্যা ক্রমে বুঝিতে লাগিল সংগ্রহে শিশিরের প্রশংসা আছে জানিয়াই রজত কেন চমকাইয়া উঠিয়া তখনই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল; কেন ভূধর আর তাদের বাড়ীতে আসে না, কেন রজতের সঙ্গত ভাঙিয়া গেল, কেন সে নিজে নূতন কাগজ বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। এর সকলের মূলে যে নিরীহ নির্দ্দোষ শিশিরের উপর রজতের হিংসা তাহাও বুঝিতে সন্ধ্যার বাকী থাকিল না। শিশিরের লেখা যতই পড়িতেছে ততই সে বুঝিতে পারিতেছে তার স্বামী কত বড় মিথ্যা কথা বলিয়াছিল যখন সে বলিয়াছিল কাণ্ডারীতে শিশিরের যে লেখা বাহির হইয়াছে তা সে লিখিয়া দিয়াছে। সন্ধ্যা আবার এই কথা লইয়া শিশিরকে লজ্জা দিতে গিয়াছিল! শিশির তার স্বামীর মিথ্যা অপমান কি প্রসন্ন মুখে সহ্য করিয়াছিল—সন্ধ্যাকে তবু জানিতে দেয় নাই! সন্ধ্যা শিশিরের মহত্বের পার্শ্বে স্বামীর এই ক্ষুদ্রতার পরিচয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়া শিশিরের প্রতি করুণায় ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিশিরের কাছে তার স্বামীর অপরাধে সে নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। শিশির যে এই কতকক্ষণ আগে তাদেরই বাড়ীতে আসিয়া হাসিয়া বকিয়া গান করিয়া গেল, হয়ত রজতের সমস্ত আচরণ জানিয়া শুনিয়াই। তার এই সহৃদয় মহত্ত্ব ও আনন্দময় ক্ষমা সন্ধ্যার চক্ষে

পরম সুন্দর হইয়া দেখা দিয়া তার মনকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল; নিজের স্বামীর সঙ্গে তুলনায় শিশিরকে অনেক শ্রেষ্ঠ অনেক উচ্চ মনে হইতে লাগিল বলিয়াই তার সম্বন্ধে সন্ধ্যার মনে একটি সঙ্কোচ ও লজ্জা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

শিশির তখন সন্ধ্যা ও সুনয়নীর নিকট হইতে মেসে ফিরিতেছিল, পথে ভূধরের সঙ্গে দেখা। ভূধর হাসিয়া বলিল—নমস্কার শিশির-বাবু, আপনার বন্ধুকে যে আপনি ক্ষেপিয়ে তুল্লেন।

শিশির হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম?

—আপনার লেখার নিন্দেভরা সমালোচনা সংগ্রহে ছাপ্‌তে দিয়েছিল; আমি তা ছাপিনি, আর নিজের মত ছেপেছি বলে আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে গেছে। এখন শুন্‌ছি আপনাকে গাল দেবার সুবিধা হবে বলে নিজে এক কাগজ বার কর্‌বে।

ভূধরের কাছে রজতের এই নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রতার পরিচয় পাইয়া শিশির অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তবু তাহা গোপন করিয়া বলিল—মানুষে মানুষে মতের পার্থক্য ত থাক্‌বেই।......আজ আসি ভূধর-বাবু, আমার একটু তাড়াতাড়ি যাবার দর্‌কার আছে।

ভূধরের কাছ হইতে পলায়ন করিয়াও শিশির রজতের ব্যবহারে কেমন একটা লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল।

রজতকে লোকে যে নিন্দা করে, তা যে তাকেও পীড়া দ্যায়, সেই নিন্দার লজ্জা যে তার মনেও আসিয়া বিঁধে— এই নিন্দার পরোক্ষ কারণ সে বলিয়াই কেবল নহে, রজত যে তার হিতকারী বন্ধু, রজতের মা ও স্ত্রী যে তারও আত্মীয়। শিশিরের মনে কেবল প্রশ্ন হইতে লাগিল— কেন রজত এমন করিতেছে? এর কি দরকার ছিল?

তেইশ

সমস্ত বঙ্গদেশ আড়ম্বরপূর্ণ পোষ্টার প্লাকার্ডে ছাইয়া মুড়িয়া, প্রত্যেক কাগজে কাগজে 'তম'-প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণের মালায় বিজ্ঞাপন সাজাইয়া, অনুচরদের কণ্ঠে কণ্ঠে শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া মহা সমারোহে নারদের আবির্ভাব হইল। বাংলা দেশের সকল কাগজের চেয়ে বড়, সকল কাগজের চেয়ে এতে ছবি বেশী, সকল পত্রিকার চেয়ে এর ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, লেখার মধ্যে শুধু গল্প উপন্যাস চুটকি, লোকের ধারণা ও মতের বিরুদ্ধে একটি কথা নাই, চিরকেলে সংস্কার সমর্থন করিবার পক্ষে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়ঘোষণা ও সস্তা উচ্ছ্বাস যথেষ্ট আছে, আর আছে অন্য সব কাগজের অতি উগ্র কড়া সমালোচনা! সুতরাং নারদ আবির্ভূত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে ইহা সমাদৃত হইতে লাগিল—একসঙ্গে এত গল্প

পাড়বার লোভে মেয়েমহলে এর পসার, হিন্দুয়ানির পৃষ্ঠপোষক বলিয়া পুরাতনপন্থীদের কাছেও এর সমাদর, সকল কাগজের কড়া বিচারক বলিয়া নবীন মহলেও এর খাতির, ছবিতে ছবিতে ছাওয়া বলিয়া শিশু ও নিরক্ষরদের কাছেও এর প্রতিপত্তি। সকল শ্রেণীর ও সকল অবস্থার লোক আগ্রহ করিয়া নারদ লইতে লাগিল—কেউ বা নগদ কিনিয়া কেউ বা বছরকি চাঁদা দিয়া। ক্রমাগত প্রশংসার ঢাক পিটিয়া পিটিয়া সারা বাংলার ঘরে ঘরে সকল লোকের মনে যে কৌতূহল ও আগ্রহ উদ্রেক করিয়া তোলা হইয়াছিল, তাতে চার ফেলিয়া মাছ ধরার মতন বহু লোক সহজেই নারদের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। বাংলাজোড়া নারদের জয়জয়কার। ঘরে ঘরে নারদ, লোকের হাতে হাতে নারদ! পত্রিকার কথা উঠিলেই লোকে আগে নারদের কথা পাড়ে—সকলের বিশ্বাস এমন কাগজ ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি!

এতে সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ হইয়াছিল সন্ধ্যার। কিন্তু তার সে আনন্দ অনাবিল অবিচ্ছিন্ন হইতে পায় নাই। প্রথম সংখ্যা হইতেই সমালোচনার পৃষ্ঠায় পদে পদে শিশিরের লেখা লইয়া তার প্রতি শ্লেষ ব্যঙ্গ কটূক্তির প্রয়োগ থাকাতে, স্বামীর এই কৃতিত্বের গর্ব্বেও সে প্রাণ খুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। নারদ হাতে করিয়া শিশির যখন

হাসিমুখে আসিয়া বলিল—'বৌদিদি, তোমার কর্ত্তার কীর্ত্তি দেখেছ !' তখন সন্ধ্যার মুখে আনন্দের চেয়ে লজ্জার আভাই বেশী ফুটিয়া উঠিল, তার মনে হইল রজত যে শিশিরকে ক্রমাগত গালি দিয়াছে সেইটাকেই শিশির কীর্ত্তি বলিয়া উপহাস করিতেছে। রজত সাহিত্যের বিচারের মানদণ্ডের উচ্চতার যতই বড়াই করুক, সন্ধ্যাও ত নেহাৎ মূর্খ নয়, সেও ত সাহিত্যরসের ভালো মন্দ বোঝে, সে ত শিশিরের লেখাকে এমন নগণ্য তুচ্ছ অপদার্থ মনে করিতে কিছুতেই পারে না। সে কোমল-প্রাণ নারী ও শিশিরের প্রতি মমতাময়ী বলিয়া পক্ষপাতের আতিশয্য খানিকটা ছাঁটিয়া ফেলিলেও সে ত অমন নির্ম্মম কঠোর ভাবে শিশিরের রচনাকে অবহেলা করিতে পারে না। তার স্বামীর ঐ সমালোচনা ন্যায়পরতার চেয়ে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও হিংসাই বেশী প্রকাশ করিতেছে ইহা অনিচ্ছাতেও সন্ধ্যাকে স্বীকার করিতে হইতেছিল। তার স্বামীর এই ক্ষুদ্রাশয়তার লজ্জা তাকেই শিশিরের কাছে কুণ্ঠিত ও অপরাধী করিয়া তুলিতেছিল।

কিন্তু নারদের কঠোর সমালোচনায় শিশিরের অপকারের পরিবর্ত্তে উপকারই হইয়াছিল। অন্য সকল কাগজে শিশিরের অত্যধিক প্রশংসা আর একা নারদে তার অত্যধিক নিন্দা সকলকে জানাইয়া দিল এই নবীন

লেখকটি নিতান্ত সাধারণ নয়, সামান্য নয়। যে-সব কাগজ অনিয়মিত প্রকাশে দু তিন মাস পিছাইয়া পড়িয়া ছিল, তারাও শিশিরের লেখা পাইয়া সত্বর ও অপরের আগে প্রকাশ করিবার আগ্রহে একেবারে একসঙ্গে দু তিন সংখ্যা বাহির করিয়া হালনাগাদ হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকেরাও একসঙ্গে অনেকগুলি কাগজের অনেকগুলি সংখ্যায় শিশিরের লেখা পাওয়াতে তার শক্তির পরিচয় ভালো করিয়া পাইয়া তার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই শ্রদ্ধার উপর আঘাত করিয়া নারদ যেমন একদিকে সকলকে শিশিরের অধিক অনুরক্ত করিয়া তুলিল, তেমনি শিশির-বাবুকে নারদ কি গালি দিয়াছে দেখিবার আগ্রহে পাঠকমহলে তার প্রচারও অত্যধিক হইয়া উঠিল।

এই অভাবনীয় সফলতায় রজতের গর্ব্ব দম্ভ অহঙ্কার উদ্দীপ্ত ও উদ্ধত হইয়া উঠিল। কিন্তু তার বিজয়গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যাইত শিশিরের সম্মুখে; শিশিরকে দেখিলেই তার কেমন লজ্জা বোধ হইত, যেন নিজেকে অন্যায়-কারী বলিয়া মনে হইত, সে শিশিরের হাসিমুখে নারদের প্রশংসা শুনিতে পারিত না, সহ্য করিতে পারিত না, যেন সে উপহাস করিতেছে মনে হইত। যখন শিশিরকে নারদের প্রশংসা করিতে দেখিয়া খগেন তার এক মুখ দাড়ির মধ্যে এক গাল পান চিবাইতে

চিবাইতে চীৎকার-স্বরে বলিল—'শিশির-বাবু, সমালোচনা-গুলো কেমন লাগ্‌ল?' আর শিশির হাসিয়া বলিল 'মোটের উপর মন্দ নয়, ঝাল তর্‌কারির মতন বেশ মুখরোচক!' তখন রজত শিশিরের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইতে পারিল না।

খগেন বলিল—কাণ্ডারীর সমালোচনা লিখেছে বনমালী, আমি লিখেছি মুদ্রিকার, আর রজত-বাবু লিখেছেন সংগ্রহের।

শিশির রজতের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—সংগ্রহের সমালোচনা যে রজতের তা তার ঝালের উগ্রতা দেখেই আমি বুঝেছিলাম, এমন মশ্‌লা পাকা রাঁধুনি নইলে কেউ দিতে পারে না। বনমালীও বুঝি আমাকে গাল দিয়েই হাত মক্‌স করছে!

বনমালী লজ্জায় রাগে কালো হইয়া মাথা হেঁট করিল। রজত বিনা বাক্যে উঠিয়া চলিয়া গেল।

রজত বাড়ার ভিতর আসিলে সন্ধ্যা সফলতার গৌরবে মহিমান্বিত স্বামীর কাছে ভয়ে ভয়ে গিয়া কুণ্ঠিত মুখে বলিল—শিশির-ঠাকুরপোকে এমন করে গাল দিয়ে অপদস্থ করা তোমার উচিত হয়নি।

রজত তীব্র দৃষ্টিতে একবার সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রজত ঘর হইতে বাহির হইতেই সুনয়নী বলিলেন—

হাঁা রে রজত, তোর কাগজে শিশিরকে অমন করে গাল দিয়েছিস্ কেন রে? এসব তোর কি মতিগতি হচ্ছে?

রজত সেখানেও তাড়া খাইয়া অন্য দিকে পলায়ন করিল।

এইরূপে যত সংখ্যা নারদ বাহির হয় সবগুলিতেই শিশিরের সমালোচনাই প্রধান ও তীব্র হইয়া থাকে; রজত কিছুতেই এই প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারে না—সে চেষ্টা করিতে চাহিলেও বনমালী ও খগেন তাকে উস্কাইয়া তুলিয়া বলে এরই জোরে ত নারদের প্রতিষ্ঠা, এখন ত আমরা শিশিরের মুখ চাহিয়া আত্মহত্যা করিতে পারি না। কিন্তু শিশিরের প্রতি অপমান মাসের পর মাস যতই বর্ধিত হইয়া চলিতেছিল, শিশিরের হাসিমুখ রজতের তত অসহ্য বোধ হইতেছিল। সে শিশিরের সাম্‌নে যাইতে লজ্জা বোধ করে। তার মা আর কিছু বলেন না, কিন্তু তাঁর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া মনে ত্রাস লাগে। সন্ধ্যাও আর কিছু বলে না, কিন্তু সে আর আগের মতন রজতের লেখার খাতা টানিয়া লইয়া আগ্রহ করিয়া পড়ে না, তার লেখার মধ্যে নাজানি কোন্ অপ্রীতিকর কথা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে সেই ভয়ে সে যেন ওদিকে ঘেঁসিতেই সাহস করে না; সে আর তেমন উৎফুল্ল হইয়া উৎসাহের সহিত স্বামীর সঙ্গে সাহিত্যের আলোচনা করে না; সে ম্লান মুখে থাকিয়া রজতকে

সর্ব্বদাই অপরাধী করিয়া রাখে; সে অপর কাগজে শিশিরের লেখা রজতকে লুকাইয়া লুকাইয়া পড়ে, রজত আসিয়া পড়িলে তাড়াতাড়ি কাগজ বন্ধ করিয়া যেন নিষিদ্ধ কর্ম্ম গোপন করে। রজত অনুভব করিতেছিল নারদ বাহির করিয়া সে যতই বাহাদুরী ও বাহবা বাহির হইতে থাক, সে নিজের ঘরে পর হইয়া উঠিতেছিল; তার আপনার জনেদের মনে তার ব্যবহারে একটি গোপন বেদনা তিলে তিলে পলে পলে তার প্রতি বিরাগে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছিল। এইরকম বিরাগ যদি শিশির দেখাইয়া তাকে পরিহার করিত তবে হয়ত সে নিজের আত্মীয়দের কাছে ফিরিয়া আসিতেও পারিত; কিন্তু শিশিরের প্রসন্ন হাসিমুখ দেখিয়া রজত আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছিল না; একবার তার মনে হয় শিশির তার এই ঐকান্তিক চেষ্টার নিষ্ফলতা দেখিয়া উপেক্ষা করিয়া হাসিতেছে,—তখন তাকে দমন করিয়া বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প প্রবলতর হইয়া উঠে; আবার কখনো বা মনে হয় শিশির তার এই অপরাধ প্রশান্ত সদাশয়তায় ক্ষমা করিয়া হাসিমুখে সকল অপমানের আঘাত-বেদনা সহ্য করিতেছে,—আর তখন শিশিরের চরিত্রবলের কাছে নিজেকে খর্ব্ব পরাহত দেখিয়া রজত ক্ষোভে দুঃখে উগ্রতর হইয়া উঠে। তার চেয়ে কেউ যে কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়া বাহাদুরী লইয়া যাইবে

এ তার বরদাস্ত হইবার নয়। সে তার মা ও স্ত্রীর কাছে পর হইয়া উঠিতেছে ঐ শিশিরের জন্য, আর শিশির তাদের প্রিয়তর হইয়া উঠিতেছে, তাদের স্নেহের রাজ্যে মমতায় তার অভিষেক হইতেছে—ইহা উপলব্ধি করিয়াও রজতের চিত্ত তিক্ত ও হিংস্র হইয়া উঠিতেছিল। এখন সে শিশিরকে বিষ দেখে, মাকে ভয় করে, স্ত্রীর কাছে সঙ্কোচ বোধ হয়। তার বাড়ীতে সঙ্গত বন্ধ হইয়া গেছে, গান বাজনা আনন্দ হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। নিজের বাড়ী তার কাছে ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে—সেখানে শিশির আসে, বিদ্যুৎ আসে, মা আছেন, স্ত্রী আছেন, এদের কারো চোখের দিকে চোখ তুলিয়া তাকানো যে যায় না! শিশির হাসে, বিদ্যুৎ গম্ভীর, মা উগ্র, স্ত্রী বিমর্ষ। তারা সব বিষয়ের কথা বলে, বলে না শুধু লেখার কথা, কাগজের কথা, নারদের কথা, সমালোচনার কথা—যে কথাগুলা রজতের মনের মধ্যে প্রধান হইয়া আছে। শিশির যদি সেইসব কথা পাড়িবার কখনো চেষ্টা করে তবে রজতের মনে হয় ওর মনে একটা কিছু কুমৎলব আছে, শিশির হয়ত তাকে উপহাস করিতে চাহিতেছে; সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গেই বিদ্যুৎ গম্ভীর হইয়া পাড়, সন্ধ্যা ম্লান মুখে উঠিয়া চলিয়া যায়, সুনয়নী তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দেন। রজত লজ্জায় রাগে রুদ্ধ আক্রোশে

অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকে। এমন অবস্থায় এদের সঙ্গে চলা তার পক্ষে দুষ্কর কষ্টকর। সে এখন এদের পরিহার করিয়া এড়াইয়া এড়াইয়া দূরে দূরে থাকে। ছাপাখানা, লেখক, আপিস, প্রভৃতির সঙ্গে কারবার করিতেই তার সময় যায়। যখন আর কোথাও যাইবার ঠাঁই খুঁজিয়া না পায় তখন সে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া দেশী বিলাতী থিয়েটারে যায়, বায়স্কোপে যায়, কখনও কখনও বা বাইজীদের বাড়ীতেও নাচগান ফুর্ত্তিতে আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে যায়। রজত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া এখন এইসবেই মাতিয়া উঠিয়াছে।

শিশির মুখে হাসিত বটে, কিন্তু রজতের এই ক্রমিক অধঃপতনে তার অন্তরে অনুশোচনার অন্ত ছিল না। সে নিজেকেই এর জন্য দায়ী করিত। তার উপর হিংসা হইতেই রজতের এই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত, অথচ সে এর নিবারণেরও কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সে বুঝিতে পারিতেছিল তাকে পরিহার করিবার জন্য রজত বাহিরে বাহিরে থাকে, তার প্রতি মমতা হইতেই রজতের মা ও স্ত্রী পর্য্যন্ত রজতের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছেন ও সেইজন্য রজত তাঁহাদিগকেও পরিহার করিয়া চলিতেছে; কিন্তু সন্ধ্যা ও সুনয়নার মনে অধিকতর ক্লেশ দিবার ভয়ে সে একেবারে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়াও ফেলিতে পারিতেছিল না। তবু সে যতটা পারিতেছিল

ক্রমে ক্রমে সহাইয়া সহাইয়া দূরে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিল। এগ্‌জামিন আসন্ন বলিয়া সে এখন আর রোজ আসে না; আবার রজতের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া সে যে এঁদের পরিত্যাগ করিতেছে এই ধারণা যাতে না হয় সেজন্য সে আসা একেবারে বন্ধ করিতেও পারে না। নারদ প্রকাশিত হইলেই শিশির হাসিমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, যেন কলহের অবতার নারদের বাক্যযন্ত্রণা তার কাছে দেবর্ষির বীণাযন্ত্রের মূর্চ্ছনার মতনই মধুর লাগিয়াছে। সন্ধ্যা হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করে, কিন্তু সে হাসিতে ম্লানিমার ছায়া পড়িয়াছে, তার ব্যবহারে সেই আগেকার আনন্দের উচ্ছ্বাস নাই, বাক্যে প্রগল্‌ভতা নাই, যুবতী সন্ধ্যা এই কয়েক মাসে প্রৌঢ়ার মতন গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। আনন্দময়ী সুনয়নী পুত্রবিয়োগের শোকে যেন মুহ্যমান, তাঁর হাসিতেও যেন কষ্ট হয়। এই নিরানন্দ পুরীতে শিশিরের হাসি না আসিলেও সে হাসিয়া বকিয়া গাহিয়া বাজাইয়া ঘণ্টা দুই পুরাতন সুখস্মৃতির মতন আনন্দ দিবার চেষ্টা করিয়া হাসিমুখে বিদায় লইত—যেন অসঙ্গত অপ্রীতিকর কিছু ঘটে নাই। কিন্তু গেট পার হইয়াই শিশির চোখ মুছিত। বাড়ীর ভিতরকার আলো হইতে বাহিরের রাস্তার ধূলিধূমাচ্ছন্ন অন্ধকার তার অন্তরকেও আবৃত করিয়া ফেলিত।

ক্রমে নারদের সাহিত্য-সমালোচনা ব্যক্তিগত সমালোচনায়

পরিণত হইতে লাগিল, বিশেষ করিয়া শিশিরের বেলা। সে শিশির-বিন্দু, তার স্পর্দ্ধা বৃষ্টিধারার সমকক্ষ হইবার; শিশিরের বুকে ধার-করা আলো পড়িলে তবে তার চাক্‌চিক্য, সে এই ঋণ ভুলিয়া রজতের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতাকে অতিক্রম করিবার স্পর্দ্ধা করে; সে শূন্য ফুকো শিশি, তার সাধ বেলোয়ারি কাটাকাঁচের শিশি হইয়া কস্তুরীর আধার হইতে। সে ছেলেমানুষ, এখনো কলেজের ছাত্র, তার অভিলাষ সাহিত্যসৃষ্টি; যার এককড়ার পুঁজি নাই তার মহাজনী কার্‌বার ফাঁদিয়া বসার দুরাশা; এক বিন্দু শিশির তুল্যমূল্য হইতে চায় রজতের সঙ্গে, সাহিত্যের টাঁকশাল হইতে মুদ্রার ছাপ পাইয়া যার মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়া গেছে!

ইহা পড়িয়া শিশির রজতের ঘরে গিয়া বলিল— রজত, তোমার নারদ এসব কি আরম্ভ কর্‌ল। রচনার দোষগুণ বিচারের সঙ্গে রচকেরও সমালোচনা আরম্ভ কর্‌ল! এই রকম personal attack কি ভালো?

রজত বলিল—Libel কি defamation যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ ত দোষ দেখিনে। যদি কেউ মনে করে libel কি defamation হয়েছে, কোর্ট খোলা আছে, সে কোর্টে যেতে পারে।

শিশির হাসিয়া বলিল—আমি তাই যাব; জজ হবে তুমি, মা আর বৌদিদি জুরী!

রজত বিরক্ত হইয়া বলিল—আচ্ছা মেয়েমুখো ছিঁচ্-কাঁদুনে তুমি। পুরুষে পুরুষে শক্তির পরীক্ষা হচ্ছে, ক্রমাগত মেয়েদের কাছে নালিশ করে কেঁদে জেত্‌বার চেষ্টা! এম্‌নি করে লাগিয়ে লাগিয়েই মা আর সন্ধ্যাকে আমার ওপর আগুন করে তুলেছ!

শিশির হাসিয়া বলিল—এটা তুমি ঠিক বল্‌লে না, রজত। জেতা ত বিধাতা আমার কোষ্ঠীতে লেখেন নি, জন্ম থেকে হেরেই আস্‌ছি। যার প্রতি বিধাতাই বাম সে আবার নালিশ করবে কার কাছে কিসের আশায়?

রজত চুপ করিয়া গোঁজ হইয়া রহিল। শিশির বাহির হইয়া আসিল। রজত তার মা ও স্ত্রীর বিরাগ শিশিরের চেষ্টার ফল বলিয়া মনে করিতেছে বুঝিয়া শিশিরের যেমন দুঃখও হইল তেমনি আনন্দও হইল; সুনয়নী ও সন্ধ্যার মন কতদূর অপক্ষপাত ও তার প্রতি মমতাময় যে তাঁরা নিজের পুত্র ও স্বামীর এই সামান্য অপরাধও ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না। শিশির এখন সপ্তাহে বা পক্ষে একদিন তাঁদের কাছে আসে; সে ঠিক করিল আসা আরো কমাইতে হইবে।

নারদে মাসের পর মাস ব্যক্তিগত আক্রমণ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। শিশির যে দরিদ্র, বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো, পোষ্যপুত্র, সেখান হইতেও

বিতাড়িত, পরান্নজীবী, এ বিষয়ে বেশ্ বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইতে লাগিল।

সন্ধ্যা নারদখানি হাতে করিয়া রজতের কাছে গিয়া ম্লান মুখে দাঁড়াইল। রজত লিখিতে লিখিতে একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—তিরস্কার কর্‌তে এসেছ?

সন্ধ্যা ব্যথিত স্বরে বলিল—আমি তোমার কাছে এলেই কি শুধু তিরস্কার কর্‌তেই আসি।

রজত অভিমানে বিরক্ত স্বরে বলিল—আজকাল ত তা ছাড়া তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক দেখ্‌তে পাইনে।

সন্ধ্যা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—তুমিই কি আগেকার সম্বন্ধ রেখেছ?......

রজত কি বলিতে যাইতেছিল। সন্ধ্যা তাকে কথা বলিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—আমি তর্ক কর্‌তে আসিনি, তিরস্কার কর্‌তে আসিনি, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি—নারদ তুলে দাও, এসব রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষী ছেড়ে দাও, আবার আমাদের সেই আগেকার আনন্দ ফিরিয়ে আনো। শিশির-ঠাকুরপো তোমার এমন কি ক্ষতি করেছে যে তার সঙ্গে তুমি এমন আড়ে হাতে লাগ্‌ছ?

রজত ক্রুদ্ধ হইয়া কলম রাখিয়া ফিরিয়া বসিয়া তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল—ক্ষতি করে নি? সে আমার মা আর

স্ত্রীর স্নেহ পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়েছে, আমার যশ খ্যাতি নষ্ট করেছে . . .

Who steals my purse, steals trash ...
But he that filches from me my good name,
Robs me ... and makes me poor indeed !

রজতের উত্তেজিত কথা শুনিতে পাইয়া সুনয়নী ঘরে আসিয়া বলিলেন—এ জন্যে ত তুই নিজেই দায়ী।

মাকে আসিতে দেখিয়াই রজত অন্য দরজা দিয়া পলায়ন করিল।

সন্ধ্যাও স্বামীর দুষ্কৃতির লজ্জায় শাশুড়ীর কাছে কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত, সেও মুখ নত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা নিজের ঘরে গিয়া শিশিরকে চিঠি লিখিতে বসিল—

ঠাকুরপো,

যেসব অক্ষম আপনার উন্নতশির যশের ধ্বজাকে ধূলায় পাড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, তারা নিজেরাই ধূলিমলিন হয়ে নিজেদের অক্ষমতারই পরিচয় দিচ্ছে। আপনি তেজস্বী ভাস্কর, ধূলা উড়িয়ে সেই ভাস্বরতা আবৃত কর্‌বার দুরাশা যাদের, দুর্দ্দশা তাদেরই। আপনি এই অবোধ অক্ষমদের প্রসন্ন মনেই ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ছেন এই ওদের সর্ব্বাধিক পরাজয়।

ব্যথিতা বৌদিদি।

শিশিরকে সুনয়নীও চিঠি লিখিলেন—

বাবা,

আমার গর্ভজাত সন্তানের অপকর্ম্মের লজ্জা আমার স্নেহজাত পুত্রের মহত্ত্বের গৌরবেই আমি এখনো বহন কর্‌তে পার্‌ছি।

তোমার মা।

শিশিরের মনে রজতের কার্য্য আচরণ যে বিরক্তি ও গ্লানি উৎপন্ন করিয়াছিল, সুনয়নী ও সন্ধ্যার এই তুখানি স্নেহার্দ্র ন্যায়পরায়ণ পত্রের ওজস্বী সান্ত্বনাবাক্য সমস্তই নিঃশেষে মুছিয়া দূর করিয়া দিল। শিশির তখনই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তার স্বাভাবিক হাসিমুখে সুনয়নী ও সন্ধ্যার সঙ্গে বকিতে আরম্ভ করিল—কিছু যে ঘটিয়াছে, সে যে তাঁদের চিঠি পাইয়াছে, এ কথার একবার ইঙ্গিতও সে করিল না। তখন সুনয়নী ও সন্ধ্যা মনে করিতেছিল একে চিঠি না লিখিলেই হইত—এই আশুতোষ হাসিমুখেই সমস্ত বিষ পান করিয়া অন্যের জন্য অমৃতই আহরণ করিবে।

এমন অভদ্র আক্রমণের পরও শিশির রজতের বাড়ীতে আসিয়া হাসিমুখে কথা বলিতেছে শুনিয়া রজত বলিল—ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি, এমন বেহায়া কখনো দেখিনি!

বনমালী বলিয়া উঠিল—হবে না, কি-রকম বংশে জন্ম!

বনমালীর মুখে এই কথাটা তোষামোদপ্রিয় রজতের কানেও বিশ্রী শুনাইল। সে চুপ করিয়া রহিল।

এমন সময় কালিদাস সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত। রজত হাসিয়া বলিল—কি হে কালিদাস, তোমার যে আর দেখা পাবারই জো নেই।

কালিদাস রূঢ় স্বরে বলিল—তোমার কাছে কোনো ভদ্রলোকের আস্‌বার পথ ত তুমি ক্রমশই বন্ধ করে তুল্‌ছ। কতকগুলো খোসামুদে স্তাবক জয়কেতে ছোট-লোক তোমার এখন পোঁধরা হয়েছে, তুমি মনে কর্‌ছ মস্ত বাহাদুরী কর্‌ছি। কিন্তু এই কটি লোক ছাড়া সবাই যে তোমায় ছিছি কর্‌ছে তার খবর রাখ কি ?

রজত হাসিয়া বলিল—শিশির-বাবুর ওকালতি নিয়ে বাড়ী বয়ে গালাগাল দিতে এসেছ, তবু ভালো। এতদিন মনে কর্‌ছিলাম আমাদের এই বাক্যবাণগুলো বুঝি গণ্ডারের গায়েই শুধু পড়্‌ছে; দু-এক জায়গায় বিধ্‌ছে দেখেও আনন্দ হচ্ছে। এত চেষ্টা একেবারে পণ্ডশ্রম হয়নি তাহলে।

কালিদাস অগ্নিসমান হইয়া বলিল—পণ্ডশ্রম হবে কেন? নিজের অধঃপাতের গর্ত্ত ভালো করেই খুঁড়্‌ছ! তোমার এই দুর্দ্দশা দেখে বাস্তবিকই কষ্ট হয়।

রজত হাসিয়া বলিল—Much obliged for your kind condolence, my dear self-imposed friend.

কালিদাস রজতের আচরণে স্তম্ভিত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

কালিদাসের চড়া কথা শুনিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে শিশির বাহির হইয়া আসিয়াছিল; সে কালিদাসকে ডাকিতে ডাকিতে পিছনে পিছনে চলিল—ওহে কালিদাস, শোনো শোনো, কি হল যে এত রাগ।

কালিদাস না শুনিয়া চলিয়াই যাইতেছিল, শিশির ছুটিয়া গিয়া তাকে ধরিয়া দাঁড় করাইল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এত রাগ কিসের?

কালিদাস হাসিয়া সমস্ত দুঃখ ক্রোধ গোপন করিয়া বলিল—কিছু না, ও আমাদের একটা প্রাইভেট ব্যাপার।

এমন সময় খগেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া অপ্রতিভ ভাবে বলিতে আরম্ভ করিল—কালিদাস-বাবু, আপনি আমাদের সুদ্ধ গালাগাল দিয়ে এলেন! শিশির-বাবুও আমাদের বন্ধু, রজত-বাবুও বন্ধু—রজতবাবু লিখতে বলেন, কি করি বলুন, বাধ্য হয়ে লিখি, লেখাটা ছাপাও হয় আর তার জন্যে বেশ মোটা-রকম দক্ষিণাও পাওয়া যায়; বিনা পয়সার তোফা খ্যাঁট আর খুব ভালো বিলিতি মদ এরও ত মাহাত্ম্য কম নয়! শিশির-বাবু এইরকম ব্যবস্থা করুন না, আমরা শিশির-বাবুরও হয়ে লড়্‌ব!

কালিদাস ঘৃণাভরে তার দিকে তাকাইয়া হনহন করিয়া

চলিয়া গেল। শিশির খগেনের কাঁধ চাপড়াইয়া হাসিয়া বলিল—বড়লোকেরাই লড়ায়ে মেড়া, লড়ায়ে মোরগ, লড়ায়ে বুলবুল পুষে থাকে। আমরা গরিব লোক খগেন-বাবু, ওঁসব বিলাস আমাদের পোষায় না।

খগেন চট করিয়া কোনো শ্লেষ বুঝিতে পারে না, সে শুধু বলিল—না, আপনারা আমাদের দোষী করছেন কি না, তাই বলছি।

শিশির চলিয়া যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল—আমি কাউকে দোষী করি না।

চব্বিশ

সেদিন বৃহস্পতিবার। বিদ্যুৎদের কলেজ-বোর্ডিঙে একটি মেয়ের বসন্ত হওয়াতে তাদের বোর্ডিং থেকে বাড়ী যাইবার আদেশ হইয়াছে। বিদ্যুৎ বিকাল-বেলা একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া নিজের বাক্স বিছানা লইয়া যখন নিজেদের বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া নামিল, তখন একটা হিন্দুস্থানী চাকর বাড়ীর দরজার সাম্‌নে বসিয়া ছিল—সে কিন্তু তাদের চাকর ধুরি নয়। বিদ্যুৎকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াই সেই লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাকে পাশ কাটাইয়া বিদ্যুৎ বাড়ীতে ঢুকিতে যাইতেছে, সে বাধা দিয়া বলিল—বাড়ীমে কোই না আসে।

বিদ্যুৎ ফিরিয়া বলিল—মাইজী কোথায় গেছে?

—বাঈজী সোনাগাছির বাড়ীমে গেসে।

বাঈজী শুনিয়া বিদ্যুৎ চম্‌কিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। সে বলিতে লাগিল—বাঈজী ত এ বাড়ীমে থাকে না; ওর একটা ছোট বেটী আছে, ওকে ছিপাকে সোনাগাছিমে থাকে; শনিচরকো ওর বেটী এই বাড়ীমে আসে, উয়ভি ওই রোজ সবেরে আসে, ফিন্‌ সোমবারকো চলা যায়। আজ বাঈজীর নাচগান হোবে, এক ভারি বাবু মজুরা করেসে, ভারি মজ্‌লিস জম্‌বে!

বিদ্যুৎ এই আহাম্মক লোকটার প্রলাপ শুনিয়া রাগে লজ্জায় ঘৃণায় ও একটা কেমন অবুঝ ভয়ে একেবারে শাদা হইয়া কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল—ধুরি কোথায়?

—সে হামাকে এই বাড়ীর চৌকিদারীমে রেখে সোনাগাছিমেই গেছে বাঈজীর নাচগান দেখ্‌তে। আপনে ভি ত ঐখানে যাবেন, আপনের ভি ত নাচের বায়না আছে?

বিদ্যুৎ প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি সেখানকার ঠিকানা জানো?

—হাঁ, ধুরি বলিয়ে গেসে, তিন নম্বর থানাদারকে গলি।

বিদ্যুতের চোখ মুখ দিয়া আগুন ছুটিতেছিল। তার সমস্ত দেহের রক্তে যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। তার

জন্মের লজ্জা, তার নিজের অস্তিত্বের লজ্জা তাকে ধিক্কার দিতেছিল।—তার মা বাজারের পেশাদার নর্ত্তকী—এ কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এই কুড়ি বছর তার বয়স হইয়াছে, এতদিন তাকে লুকাইয়া তার মা এই লজ্জাজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আছে? এই জন্যই কি তাকে বোর্ডিঙে আবাল্য নির্ব্বাসিত হইয়া থাকিতে হইয়াছে? স্কুল-কলেজের ছুটি হইলে সে বাড়ীতে আসে, তখন তার মা এই বাড়ীতে আসিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে, আর অন্য দিন সে থাকে বারনারীদের পল্লীতে!

এই কথা মনে হইতেই বিদ্যুতের মন তার মার প্রতি ঘৃণায় ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। তার মা যে এমন হইয়াও তাকে সেই লজ্জার পথে টানিয়া লইয়া গিয়া তার জীবন মনকে পঙ্কিল কলুষিত করিয়া তোলে নাই এর জন্য বিদ্যুতের মন মার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেও সে মায়ের চরিত্রকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না।

বিদ্যুতের গাড়ী যতই সেই সমাজ-গণ্ডীর বাহিরের পল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল ততই সে অনুভব করিতেছিল তার জন্মের লজ্জা, জীবনের কত সাধের সমাধি, কত আশার নির্ব্বাপণ। তার যে মনে ছিল একদিন হয়ত সে শিশিরের সহধর্ম্মিণী হইবার সৌভাগ্যে শিশিরকে সুখী করিতে পারিবে, সে আশা তার এই শীতের সন্ধ্যার

ধূম্রাচ্ছন্ন কোয়াসার মতন আবছায়া হইয়া গেল। এই কলঙ্কিত-জীবন হতভাগিনী এখন জগতের কোন্ কাজে লাগিবে? সে কোন্ মুখে আর সমাজের দ্বারে কোন্ অধিকার দাবি করিতে দাঁড়াইবে?

সোনাগাছির মধ্যে গাড়ী ঢুকিতেই সেখানকার বদ্ধ দূষিত বায়ু যেন বিদ্যুতের দম বন্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল। তবু সে ফিরিতে পারিতেছিল না, তার মা যে কি তা সে একবার নিজের চোখে না দেখিয়া কোথাও গিয়া স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। আর যাইবেই বা কোথায়, কোথায় বা তার আশ্রয়? তার মা যে-দুর্গতি হইতে তাকে বাঁচাইবার এত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, সেই দুর্গতির পঙ্কে তলাইয়া যাওয়াই কি তার নিয়তি!

বিদ্যুৎকে গাড়ীতে যাইতে দেখিয়া একজন বাবু বলিয়া উঠিল---কী খাপসুরৎ!

দুজন ছোক্‌রা ইস্ত্রিকরা শার্টের কফের উপর ফুলের মালা জড়াইয়া লাঠি ঘুরাইয়া চলিতেছিল। একজন বলিয়া উঠিল—ওরে দ্যাখ্ দ্যাখ্! একটা হলদে পাখী! কোন্ বাসায় থাকে রে!

অপর জন টপ করিয়া গাড়ীর পা-দানে উঠিয়া পড়িয়া বলিল—তুমি কোথায় থাকো ভাই?

বিদ্যুতের মুখ ভয়ে লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তবু সে স্থির কণ্ঠে বলিল—আমি এখানকার নই।

সেই লোকটি বলিল—তা ত বুঝ্‌ছি বাবা, এ পাড়ার কাউকে চিন্‌তে ত আর বাকি নেই। এক ক্ষণ প্রভা বাইজী এ পাড়ার মধ্যে সুন্দরী বল্‌তে হয়। কিন্তু সেও ত তোমার মতন নয়!

এই কথাগুলা যেন বিদ্যুতের সর্ব্বাঙ্গে হাজার বিছার হুল বিঁধিয়া দিয়া গেল। সে হঠাৎ উঠিয়া দুই হাতে সেই লোকটাকে ঠেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—কোচ্‌মান জোর্‌সে হাঁকো!

সেই লোকটা চিতপাত হইয়া পথের ধূলার উপর পড়িয়া গেল; পথের লোক তার চারিদিকে ভিড় করিয়া জমা হইতে লাগিল। সবাই মনে করিল নেশায় অবশ পা টলিয়া বাবুটি ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে।

থানাদারের গলিতে তিন নম্বর বাড়ীর সাম্‌নে গিয়া গাড়ী থামিল। কোচ্‌মান নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতেই বিদ্যুৎ এমন হঠাৎ নামিয়া পড়িল, যেন তাকে কে হঠাৎ ধাক্কা দিয়া নামাইয়া দিল। বাড়ীর বাহির হইতেই সে তার মার মধুর গলার গান শুনিতে পাইল—এ ত তার চেনা স্বর, এই মার কাছেই ত তার গান বাজ্‌না নাচ শিক্ষা। এখন বিদ্যুৎ বুঝিতে পারিল তার মা সঙ্গীত ও নৃত্যে এমন নিপুণা হইতে পারিয়াছে কি নিদারুণ ক্ষতি স্বীকার করিয়া। বাড়ীর মধ্যে যাইতে তার পা উঠিতেছিল না, তার মা তখন যে গান গাহিতেছিল তাহা শুনিয়াই

বিদ্যুৎ যে লজ্জায় ঘৃণায় মরিতে পারিলে বাঁচিত! এই গান যে নিঃসম্পর্ক পুরুষের সাম্‌নে তার টাকার বদলে তার মনোরঞ্জনের জন্য বিদ্যুতের মা গাহিতেছে ইহা মনে করিতেও বিদ্যুতের মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হইতেছিল। বাড়ীর ভিতর যাইতে তার পা আর উঠিতেছিল না। এদিকে এই শোভন-মনোহর-বেশা রূপসী যুবতীকে বাড়ীর বাহিরে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পথিক পুরুষদের লোলুপতা তাদের আকর্ষণ করিয়া তারই কাছে আনিতে-ছিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া বিদ্যুৎ বাড়ীর মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। নীচের তলার ঘরে ঘরে বারনারী—কেউ চুল বাঁধিতেছে, কেউ মুখে শাদা রং লেপিতেছে, কেউ হুঁকায় তামাক খাইতেছে। বিদ্যুৎ উপরে যাইবার সিঁড়ি খুঁজিবার জন্য ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছিল, কিন্তু কারো সহিত কথা কহিতেও সে পারিতেছিল না, ঘৃণায় লজ্জায় তার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। একজন পুরুষ এক ঘর হইতে হুঁকা হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া মদিরা-স্খলিত কণ্ঠে বলিল—তুমি কাকে খুঁজ্‌ছ মাইডিয়ার? আমি তোমার শ্রীচরণের ছুঁচো!

সে হাত বাড়াইয়া বিদ্যুতের হাত ধরিতে গেল। বিদ্যুৎ হাত সরাইয়া লইয়া আশ্চর্য্য ধীরতার সহিত সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—ওপরে যাবার সিঁড়ি কোথায় বল্‌তে পারেন?

বিদ্যুৎকে সম্ভ্রম রাখিয়া কথা বলিতে শুনিয়া সে ব্যক্তিও সসম্ভ্রমে বলিল—আসুন আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি আপনার শ্রীচরণের ছুঁচো—যা হুকুম করবেন তাই শুনব।

বিদ্যুৎ ভয়ে ভয়ে সেই লোকটার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সিঁড়ি দেখিতে পাইয়াই ক্ষিপ্রপদে দুতিন সিঁড়ি লাফাইয়া উপরে উঠিয়া গেল।

উপরে উঠিয়াই অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া বিদ্যুৎ দেখিল সামনে একটা ঘরে বিদ্যুতের ঝাড়ের আলোর বন্যার মধ্যে তার মা একগা জড়োয়া গহনা পরিয়া সলমা-চুমকির কাজকরা নীল ওড়নার আঁচল দুপাশে পরীর ডানার মতন লুটাইয়া ভ্রূবিলাসকটাক্ষে শ্রোতাদের দিকে ক্ষণপ্রভার ন্যায় হাসির ঝলক হানিতে হানিতে অপ্সরার ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছে। আর আসরে বসিয়া আছে সামনে তবকমোড়া পানের থালা আর মদের বোতল-গেলাস লইয়া রজত আর তার মোসাহেবদল—খগেন, পূর্ণ, হেম, বনমালী। তারা নাচের তালে তালে নানান অদ্ভুত ভঙ্গীতে গা দোলাইয়া দোলাইয়া মাঝে মাঝে উচ্চরবে বাহবা দিতেছে। বিদ্যুৎ ক্ষণকাল স্তম্ভিত প্রাণহীনের ন্যায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল—দেখিতে দেখিতে দেখিল রজত এক গ্লাস মদ ঢালিয়া হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর ক্ষণপ্রভার কটিদেশে হাত জড়াইয়া দিয়া সেই

সুরাপাত্র তার অধরনিম্নে ধরিল। অসহ্য লজ্জার মর্ম্মান্তিক বেদনায় আকাশ চিরিয়া বিদ্যুৎবিকাশের ন্যায় বিদ্যুতের কণ্ঠ চিরিয়া আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল—মা!

সেই আর্ত্ত আহ্বানে চকিত হইয়া ক্ষণপ্রভা এক ঝটকায় রজতকে সরাইয়া দিয়া অন্ধকারের দিকে চকিত দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া ফিরাইয়া সেও চীৎকার করিয়া উঠিল—বিদ্যুৎ!

বিদ্যুতের যাহা দেখিবার তাহা দেখা হইয়া গেছে। সে নিজের মার কাছেও নিজের মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। সে যেমন ছুটিয়া উপরে উঠিয়াছিল, তেমনি ছুটিয়া নীচে নামিয়া একেবারে গাড়ীতে উঠিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে বলিল—জল্‌দি চালাও।

বিদ্যুৎকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াই ক্ষণপ্রভাও ছুটিতে ছুটিতে ডাকিল—বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ, আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যা।

যখন ক্ষণপ্রভা বাড়ীর দরজায় পৌঁছিল, তখন বিদ্যুতের গাড়ী গলির মোড় ফিরিতেছে। ক্ষণপ্রভা শুনিতে পাইল যেন পশ্চাদ্ধাবিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার ব্যাকুলতায় বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বলিতেছে—কোচমান জল্‌দি চালাও।

ক্ষণপ্রভা মর্ম্মাহত মর্ম্মরমূর্ত্তির ন্যায় দরজায় দাঁড়াইয়া বিদ্যুতের পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

একজন স্ত্রীলোক পাশের ঘর হইতে আসিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ রে খনি, ঐ নাকি তোর

মেয়ে? ও কি কোনো বাবুর বাঁধা আছে, না ছুটো? কোন্ পাড়ায় ও থাকে? ওকে কখনো এখানে আনিস্ না ত?

ক্ষণপ্রভা উন্মত্তের মতন চোখ পাকাইয়া তার দিকে ফিরিয়া কর্কশ স্বরে বলিল—আমার সাম্‌নে থেকে পালা বল্‌ছি, নইলে তোর টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌ব।

বলিয়াই ক্ষণপ্রভা তার দুই বাহু তার দিকে বিস্তার করিয়া আঙুল বক্র করিয়া দশ নখের তীক্ষ্ণতার আভাস দেখাইল। সে ভয় পাইয়া—'ওগো মাগো! মাগী খেপ্‌ল নাকি গো!' বলিয়া এক লাফে ঘরে গিয়া দরজায় খিল দিল।

ক্ষণপ্রভা তেম্‌নি ছুটিয়া উপরে উঠিতেই রজত হাসিয়া বলিল—বিদ্যুৎ তোমার মেয়ে বুঝি! আহাহা এতদিন যদি জান্‌তাম মাইরি! তুমি ধর্‌তে পার্‌লে না?

ক্ষণপ্রভা হঠাৎ একটা মদের বোতল তুলিয়া রজতের দিকে ছুড়িয়া মারিল। রজত মাথা সরাইয়া লইয়া আঘাত এড়াইল, কিন্তু বোতল গিয়া লাগিল খগেনের রগে, এবং সেইখানে তাহা চূর্ণ হইয়া কাঁচের টুক্‌রা ছিট্‌কাইয়া গিয়া ক্ষতবিক্ষত করিল বনমালীকে।

তারা সুরা ও রক্তে স্নান করিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া ক্ষণপ্রভা আর দুইটা বোতল দু হাতে ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—পালা তোরা, বেরো তোরা,

নইলে তোদের সকলের দশা অমনি কর্‌ব! ধুরি, ধুরি, এদের গলা ধরে ধরে বার করে দে ত?

ক্ষণপ্রভার সেই উন্মাদিনী রণমূর্ত্তি দেখিয়া রজত প্রভৃতি জুতা চাদর ফেলিয়া প্রাণ লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

ক্ষণপ্রভা সকলকে পলাতক দেখিয়া হাতের বোতল তুটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ফরাশের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

বাড়ীওয়ালী আসিয়া তিরস্কার করিয়া বলিল—তোর হয়েছে কি খনি! শেষকালে থানা ফৌজদারী কর্‌বি?

ক্ষণপ্রভার কোনো সাড়া না পাইয়া তার নিস্পন্দ শরীরের দিকে দেখিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল—ওমা এর যে মূচ্ছো হয়েছে!

সে বাড়ীর সবাই জানিত ক্ষণপ্রভার মূর্চ্ছা রোগ আছে। সুতরাং ডাক্তার ডাকা হইল।

অনেক চেষ্টার পর ভোর রাত্রে জ্ঞান হইতেই ক্ষণপ্রভা পাল্কী আনাইয়া নিজের শ্যামবাজারের বাড়ীতে চলিয়া আসিল। ক্ষণপ্রভা আশা করিয়া আসিয়াছিল এখানে সে বিদ্যুৎকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু সে এ বাড়ীতে আর ফেরে নাই। ধুরির চাকরকে সে কলেজের হোষ্টেলে পাঠাইল। সে খবর আনিল—বিদ্যুৎ হোষ্টেলেও নাই; হোষ্টেলে বসন্ত হইয়াছে বলিয়া কাল বিকালে সে চলিয়া

আসিয়াছে আর ফিরে নাই। রজতের বাড়ীতে বিদ্যুৎ আর যাইবে না জানিয়াও ক্ষণপ্রভা সেখানেও সন্ধান লইল। বিদ্যুৎ সেখানেও নাই। তখন ক্ষণপ্রভার মন ব্যাকুল হইল, কলিকাতার এই জনসমুদ্রের মধ্যে একটি বুদ্‌বুদ্‌ কোথায় হারাইয়াছে তা সে কেমন করিয়া খুঁজিয়া পাইবে? তখন তার মনে হইল শিশিরকে। ক্ষণপ্রভা ক্লান্ত শরীর মন লইয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়াই শিশিরকে চিঠি লিখিল—

কল্যাণনিলয়,

একবার শীঘ্র দয়া করে এস। বড় বিপদ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী ক্ষণপ্রভা।

পঁচিশ

এই টেলিগ্রাফের মতন চিঠি পাইয়া শিশির ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি বিপদ? কাল রাত্রে বিদ্যুৎ হঠাৎ গাড়ী করিয়া তার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যুৎ তাকে গাড়ীর কাছে ডাকিয়া পাঠাইতেই সে চমৎকৃত হইয়াছিল যে সে নিজে তার মেসে ডাকিতে আসিল কেন? পরম বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া গাড়ীর মধ্যে ঝুঁকিয়া শিশির দেখিল গাড়ীর অন্ধকার জঠরের মধ্যে পিছন দিকে ঠেস দিয়া বিদ্যুৎ বড় বেশীরকম গম্ভীর হইয়া

বসিয়া আছে। তার মুখ অন্ধকারে আব্‌ছায়া যা দেখা গেল তাইতেই শিশির চম্‌কিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে? আপনি বিছানা বাক্স নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

বিদ্যুৎ শিশিরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল—আমার একটু উপকার কর্‌তে পারেন? আপনি ছাড়া আমার আর কেউ আত্মীয় নেই যার কাছে আমি সাহায্য চাইব।

কথা বলিতে বলিতে বিদ্যুতের গলা কাঁপিয়া উঠিল, স্বর অশ্রুতে রুদ্ধ হইয়া আসিল, তার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শিশির ব্যথিত হইয়া গাড়ীর মধ্যে হাত দিয়া বিদ্যুতের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—কি কর্‌তে হবে আমায় বলো।

এই দারুণ দুঃখের সময় শিশিরের তুমি সম্বোধন বিদ্যুতের প্রাণে অমৃতের প্রলেপ দিল। বিদ্যুৎ নিজের গলার হার, হাতের চুড়ি, কানের দুল খুলিতে খুলিতে বলিল—এইগুলো বেচে হোক বাঁধা দিয়ে হোক, আমায় কিছু টাকা এনে দেন, আমার বিশেষ দর্‌কার।

শিশির বিদ্যুতের গহনা ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল—ওসব তোমার গায়ে থাক। তোমায় আমি টাকা এনে দিচ্ছি। তুমি বাড়ী যাও, আমি টাকা তোমায় পৌঁছে দেবো।

বিদ্যুৎ চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল—বাড়ী! বাড়ী আমার নেই!

রাস্তায় দাঁড়াইয়া সুন্দরীর সহিত শিশিরকে কথা কহিতে দেখিয়া পথে লোক জমিতেছিল। শিশিরের মেসের ছেলেরা উৎসুক হইয়া উপরের বারান্দায় ঝুঁকিয়া ও নীচের ঘরের জান্‌লার গরাদে ধরিয়া উঁকি মারিতেছিল। তাহা দেখিয়া ও বিদ্যুতের সঙ্গে তাকে অনেকক্ষণ কথা কহিতে হইবে বুঝিয়া শিশির গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া পড়িয়া কোচমানকে বলিল—চলো।

কোচমান সেই বিকাল-বেলা থেকে শহরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই অদ্ভুত আরোহীটিকে লইয়া ঘুরিয়াছে। সে বিরক্ত হইয়া কর্কশস্বরে আপত্তি জানাইল, আর সে যাইতে পারিবে না, তার ঘোড়া থকিয়া গিয়াছে। শিশির বলিল—আচ্ছা চলো, পথে অন্য গাড়ী করে তোমায় ছেড়ে দেবো।

বিছানা বাক্স লইয়া বিদ্যুৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে ও বলিতেছে 'আমার বাড়ী নাই' ইহার অর্থ শিশির বুঝিল সে হয়ত মার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করিয়া আসিয়াছে। শিশির গাড়ীর মধ্যে বিদ্যুতের সাম্‌নের গদিতে বসিয়া দুই হাতে বিদ্যুতের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া পরম স্নেহসিক্ত সান্ত্বনার স্বরে বলিল—কি হয়েছে বিদ্যুৎ আমায় বলো।

বিদ্যুৎ ঝুঁকিয়া শিশিরের হাতের মধ্যে বন্দী নিজের হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—না না, সে আমি বল্‌তে পার্‌ব না। আমি বড় হতভাগিনী। সে কথা শুন্‌লে আপনি সুদ্ধ আমায় ঘৃণা কর্‌বেন।

শিশিরের কাছে রহস্য জটিলতর হইয়া উঠিল। বিদ্যুতের মুখ শিশিরের হাতের মধ্যে লুকাইয়া ছিল, সে টের পাইতেছিল কি অজস্র অশ্রু বিদ্যুতের চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। শিশির ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বাড়ী যদি না যাও ত চল সন্ধ্যা-বৌদিদির কাছে।

বিদ্যুৎ তেম্‌নি ব্যাকুল ও ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, আমার কোথাও যাবার জো নেই।

শিশির চিন্তিত হইয়া বলিল—আমিও ত নিরাশ্রয়, তুমি কোথায় থাক্‌বে তবে ?

বিদ্যুৎ অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া বলিল—আমি এখন আমার কলেজের মেমের কাছে যাব। কিন্তু তার আগে আমার কিছু টাকা পাওয়া চাই।

শিশির পথে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই গাড়ীতে বিদ্যুৎকে ও বিদ্যুতের জিনিসগুলিকে চড়াইয়া বলিল—আমার টাকা রজতের কাছে আছে, চলো তার কাছ থেকে চেয়ে দেবো।

রজতের নামে বিদ্যুতের মুখে এমন একটা কঠোর

ঘৃণার উদয় হইল যে শিশির তাড়াতাড়ি বলিল—ফটকের বাইরে গাড়ীতে তুমি থেকো, আমি গিয়ে টাকা আনব।

বিদ্যুৎ চুপ করিয়া রহিল। শিশির রজতের বাড়ীর দিকে গাড়ী চালাইতে বলিল।

বিদ্যুৎকে গেটের বাহিরে গাড়ীতে রাখিয়া শিশির রজতের কাছে টাকা চাহিতে চলিল। সে বাড়ীতে ঢুকিতেই শুনিল, রজত ও তার সহচরেরা খুব হাসিতে হাসিতে মহাকলরব করিয়া একসঙ্গে সকলেই কথা কহিতেছে। শিশিরের কানে খাপছাড়া এই কথাগুলি গেল—'বিদ্যুৎ ছুঁড়ি গিয়ে পড়ে সব মজা পণ্ড করে দিলে?' 'ও যে ক্ষণপ্রভাবাঈজীর মেয়ে আগে জানলে বেশ হত!' 'আরে এক পৌষে ত শীত পালায় না, বিদ্যুৎ পালাবে কোথায়?'

শিশির দরজার বাহির হইতে ডাকিল—রজত শোনো।

রজত মুচ্‌কি হাসিয়া অনুচরদের দিকে একবার তাকাইয়া বাহিরে আসিল। শিশির নীচু গলায় বলিল—আমার বিশেষ দর্‌কার, শ পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারো? শিগ্‌গির দেবো।

গর্ব্বিত শিশির তার কাছে আসিয়া হাত পাতিয়া টাকার সাহায্য চাহিতেছে! রজতের মন বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল—দিচ্ছি, ওপরে এস।

রজত লোহার আল্‌মারি খুলিয়া পাঁচশত টাকা গণিয়া বাহির করিয়া দিল। শিশির টাকা লইয়া বলিল—একটা কাগজ কলম দাও, হ্যাণ্ডনোট......

রজত বাধা দিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল—হ্যাঃ! তোমার কাছ থেকে আবার হ্যাণ্ডনোট নেব! ভারি ত টাকা, যবে ইচ্ছে হয় দিয়ো, না পারো না দিয়ো।

বহুকাল পরে রজতের মুখে সেই আগেকার মতন আত্মীয়তার কথা শুনিয়া শিশির প্রীত হইয়া হাসিয়া বলিল—তবু একটা স্মারকলিপি থাকা ভালো।

রজত হাসিয়া কাগজ কলম দিয়া বলিল—আচ্ছা উৎপেতে লোক তুমি!

শিশির হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া টাকা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সুনয়নী শিশিরের কথা শুনিয়া তার সঙ্গে দেখা করিতে বাহিরের ঘরে যখন আসিলেন তখন শিশির চলিয়া গেছে, রজত আল্‌মারি বন্ধ করিতেছে। সুনয়নী রজতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ রে, শিশিরের গলা পেলাম যেন?

—হ্যাঁ, শিশির পাঁচ শ টাকা নিয়ে গেল।

—কেন?

—তা ত কিছু বল্‌লে না।

সুনয়নী চিন্তিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন,—এত রাত্রে

শিশিরের পাঁচ শ টাকার কি দর্কার? সে কতদিন পরে বাড়ীতে আসিল অথচ তাঁদের সঙ্গে দেখা করিয়া গেল না, এতই বা তার তাড়াতাড়ি কিসের!

শিশির টাকা আনিয়া বিদ্যুতের হাতে দিয়া বলিল—পাঁচ শ আছে। আরো দর্কার হলে আমায় বোলো।

বিদ্যুৎ ক্রন্দনে আরক্ত সুন্দর চোখ দুটিতে কৃতজ্ঞতা ভরিয়া শিশিরের দিকে চাহিল। শিশির গাড়ীর মধ্যে হাত বাড়াইয়া হাত পাতিল। বিদ্যুৎ আজ দুই হাতে তার হাত চাপিয়া ধরিয়া হৃদয়ের ব্যথাভরা প্রণয়াবেগ জানাইয়া দিয়া গেল।

সেই রহস্যাবৃত রজনীর অন্ধকারে বিদ্যুৎকে বিদায় দিয়া আসিয়া নানা চিন্তায় শিশিরের সমস্ত রাত ঘুম হইল না। সকালেই সে ক্ষণপ্রভার চিঠি পাইয়া তাড়াতাড়ি তার বাড়ীতে গেল, সেখানে গেলে বিদ্যুতের অভিমানের কারণ সে বুঝিতে পারিবে।

শিশির ক্ষণপ্রভার ম্লান রক্তশূন্য মুখচোখ দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—আপনার কি অসুখ করেছে?

ক্ষণপ্রভা সে কথার জবাব না দিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল—বিদ্যুৎ আমায় ছেড়ে গেছে। আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচ্ব না। এই চিঠিটা তুমি নিয়ে রাখ, তুমি পড়ে তাকে দিয়ো।

এই বলিয়া ক্ষণপ্রভা শিশিরের হাতে একখানা খুব

বড় খাম দিল, তার ভিতরে অনেক কিছু কাগজপত্র গালামোহর করিয়া বন্ধ আছে, খামের উপরে বড় বড় অক্ষরে শিশির ও বিদ্যুতের নাম ইংরেজিতে লেখা আছে, আর বাংলায় লেখা আছে, শনিবারের আগে খুলিও না।

শিশির ক্ষণপ্রভাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—মায়ে মেয়ের ঝগ্‌ড়া—এর জন্যে আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন? কাল রাত্রে বিদ্যুৎ আমার কাছে গিয়েছিল, সে কলেজের মেয়ের বাড়ীতে আছে, বলেন ত আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসি।

ক্ষণপ্রভা ক্ষীণ স্বরে বলিল—না, সে আস্‌বে না, এনেও তাকে কাজ নেই। আমি তার কাছে দোষী, আমি তার কাছে মুখ দেখাতে পার্‌ব না। তুমি তাকে দেখো, রক্ষা কোরো। সে বড় ভালো মেয়ে, নিষ্পাপ অকলঙ্ক, সংসারের আবর্ত্তে পড়ে সে যেন তলিয়ে না যায়।

শিশির মনে করিল অসুস্থ শরীরে মানসিক উদ্বেগে ক্ষণপ্রভা ঐরকম অর্থহীন প্রলাপ বকিতেছে। সে বলিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বিদ্যুতের জন্যে আপনার কোনো ভয় নেই।

ক্ষণপ্রভা চুপ করিয়া একদৃষ্টে শিশিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শিশির দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—এখন তবে যাই আমি।

ক্ষণপ্রভা তার উত্তরেও কিছু বলিল না।

ছাব্বিশ

প্রকাণ্ড লেফাফার মধ্যে ক্ষণপ্রভা কি দিয়াছে ইহাই জানিবার উদ্বেগ প্রতি মুহূর্ত্ত সহ্য করিয়া সকাল হইতেই শিশির বিদ্যুতের কাছে সেই লেফাফা লইয়া গেল। বিদ্যুৎ শিশিরের মুখে সব শুনিয়া একেবারে শাদা হইয়া গেল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—আপনি খুলে দেখুন।

শিশির বলিল—না, তুমিই আগে দেখ। আমি না হয় নাই দেখ্‌লাম।

কারো পারিবারিক কথা অপরের জানা অনুচিত মনে করিয়া শিশির কৌতূহল দমন করিল।

বিদ্যুৎ কম্পিত হস্তে লেফাফা খুলিয়া দেখিল, তার মধ্যে একখানা রেজেষ্টারী-করা উইল আর একখানা দীর্ঘ পত্র। তার গোড়াতেই লেখা আছে—এই পত্র যখন তোমরা পড়্‌বে তখন আমি ইহলোকে থাক্‌ব না, সুতরাং আমার লজ্জার কাহিনী তোমাদের বল্‌তে আমার লজ্জা নেই। নিজের কলঙ্ক আমি নিজের হাতেই মরণ দিয়ে ঢেকে যাব।

এইটুকু পড়িয়াই বিদ্যুৎ চোখে আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাল রাত্রের অন্ধকারে যে লজ্জার দুঃখ সে অনেক কষ্টে সহ্য করিয়া ছিল,

দিনের আলোয় তাহা আরো ভীষণ কুশ্রী হইয়া উঠিল, তার সঙ্গে যোগ হইল মার মৃত্যুর আশঙ্কা। সেই মা যেমনই হোক, মা ত! সেই মাকেই ত সে আশৈশব একমাত্র আপনার লোক বলিয়া জানিয়াছে, তার কাছে ভালো-বাসা পাইয়াছে, তাকে ভালো বাসিয়াছে! সেই মা নিজে কলঙ্কিত জীবন যাপন করিয়া সেই জীবনের হীনতা যে নিজে উপলব্ধি করিয়াছিল; সেই কলঙ্কের হীনতায় সে যে তার মেয়ের জীবনকে পঙ্কিল হইয়া উঠিতে দেয় নাই; কুড়ি বৎসর সযত্নে মেয়ের কাছে নিজের আচরণ লজ্জায় গোপন রাখিয়া মেয়েকে সৎপথে রাখিবার জন্য তার চরিত্রকে সে যে ভিন্নভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে; এইসবের জন্য বিদ্যুতের মন মাকে একে-বারে মন্দ ভাবিতেও পারিতেছিল না, মার প্রতি ভক্তি তার নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিলেও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা একেবারে দূর হইয়া যায় নাই।

শিশির কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কি বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ পাশের ঘরে তার আশ্রয়দাত্রী মেয়ের সাড়া পাইয়া বিদ্যুৎ চোখ মুছিয়া মার চিঠি পড়িতে লাগিল।—

এই পত্র যখন তোমরা পড়্‌বে তখন আমি ইহলোকে থাক্‌ব না। সুতরাং আমার লজ্জার কাহিনী তোমাদের

বল্‌তে আমার লজ্জা নেই। নিজের কলঙ্ক আমি নিজের হাতেই মরণ দিয়ে ঢেকে যাব। মনে করেছিলাম, মরণ ত আমার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, হঠাৎ একদিন মরণের যবনিকা ফেলে এই কলঙ্ককালিমা গোপন রেখেই চলে যেতে পার্‌ব—আমি একমাত্র যাকে ভয় আর লজ্জা করি তাকে ফাঁকি দিয়েই যেতে পার্‌ব। এই কুড়ি বচ্ছর পেরেও'ছলাম ত—একটা দিনের একটু অসাবধানে এত কালের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ নষ্ট পণ্ড হয়ে গেল, মেয়ের কাছে মায়ের চরম লজ্জা উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। মেয়েকে যেদিন প্রথম কোলে পেয়েছিলাম সেই দিনই প্রথম নিজের চরিত্রের লজ্জা মনে অনুভব করেছিলাম—মায়ের হীনতা মেয়ের কাছে প্রকাশ হবার আশঙ্কা সেইদিনই মনে জেগেছিল; তখন থেকে বুঝ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম আমি কত অধঃপাতে গেছি, আমি কত কুৎসিত, কত ঘৃণ্য, কত ধিকৃত! সেই থেকে সঙ্কল্প জাগ্‌ল যে-লজ্জা যে-ঘৃণা যে-ধিক্কার নিজে সহ্য কর্‌ছি তার ভাগী আমার মেয়েকে হতে দেবো না; একমাত্র যে একান্তভাবে আমার, একজন মাত্র যাকে আমি ভালো-বাসি, তাকে আমার ভালো ছাড়া আর কিছু দেবো না। মেয়ে যত বড় হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, মনের মধ্যে লজ্জা ও ভয় তত প্রবল হয়ে চল্‌ল, সঙ্কল্প তত দৃঢ়তর হয়ে উঠ্‌ল। সাত বচ্ছর শিশুর অজ্ঞানের আবডালে

নিজের অনাচার কোনো মতে ঢেকেঢুকে চলেছিলাম, কিন্তু মনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। সাত বচ্ছরের ক্রমাগত চিন্তায় স্থির কর্‌লাম মেয়েকে স্কুলের বোর্ডিঙে রেখে আমার ছোঁয়াচ থেকে সরিয়ে দেবো। বাঙালী মেয়ে-স্কুলের বোর্ডিঙে তাঁরা সতীসাধ্বীর মেয়ে নইলে নেন না। যেন তাঁরা সকলকার কোষ্ঠীর খবর রেখে থাকেন বা রাখ্‌তে পারেন। তাঁরা আমার মেয়েকে ভর্ত্তি করলেন না, বল্‌লেন মেয়ের বংশের সাধুতার প্রমাণ চাই। অনেক বড় বড় ধনী নামজাদা লোক আমার প্রসাদপ্রার্থী ছিল, তারা বল্‌লে আমরা সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো। কিন্তু এ রকম মিথ্যাচারে আমার মন সর্‌ল না, মেয়েকে আমি জন্মের দোষেই অপরাধী মনে কর্‌তে পার্‌ছিলাম না। একটি লোক যদি পাপের পথ থেকে উঠে শুচি শুদ্ধ হতে চায় তার সুযোগ সমাজে মিল্‌বে না, তাকে নরকের অতলে তলিয়ে যেতেই হবে? ছেলেদের স্কুলে সাধু অসাধু সবার ছেলে একত্র পড়ে, মেয়ের স্কুলে এত তারতম্য কেন? তারা মেয়ে যে, সমাজে যে তারা পুরুষদের চেয়ে হীন, পুরুষেরা যে কর্ত্তা আর মেয়েরা যে বাঁদি হয়েই রয়েছে! যদি খারাপ আবেষ্টন থেকে ছাত্র-ছাত্রীকে দূরে রাখাই উদ্দেশ্য হয় তবে ছেলেদের বেলাও এই ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। অগত্যা মেয়েকে মেমেদের স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম—সেখানে তারা মানুষকেই বিচার

করে' মেয়েকে ভর্ত্তি করে নিলে, তার জাত বা জন্ম নিয়ে মাথা ঘামালে না।

মেয়েকে কাছ থেকে সরালাম, কিন্তু তবু আমি নিজে লজ্জার পথ থেকে সরলাম না কেন? মেয়ের জন্যে বেশীরকম অর্থ বিত্ত জমিয়ে দিয়ে যাবার লোভেই। সংসারে তাকে ত একলা অসহায় দাঁড়াতে হবে; তার পর যদি কোনো দিন তার জন্মের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে তবে ত তাকে আরো একলা হয়ে পড়তে হবে; তখন যদি অর্থবল না থাকে তবে ত তার অধঃপতন অনিবার্য্য হয়ে উঠবে—মায়ের পথে দাঁড়িয়ে সে যে জননীকে অভিসম্পাত করবে। দারিদ্র্যকষ্ট যে মানুষকে ভালো থাকতে দিতে চায় না। দারিদ্র্য-কষ্টই ত আমাকে এই পথে টেনে এনেছিল।

ভগবান আমায় রূপ দিয়েছিলেন যথেষ্ট, ভাগ্যে সুখ লেখেন নি একটুও। অতি নিঃস্ব গরিবের ঘরে জন্মেছিলাম, তাই শুধু রূপের বরপণে আমি বিকাচ্ছিলাম না। বাপের ভিটে মাটি বেচে আমাকে যিনি নিলেন, তিনিও আমার বাবারই মতন তালেবর যোত্রমন্ত। তাতে আবার আমায় একলা রেখে তিনি পরলোকে যাত্রা করলেন অতি শীঘ্র। যে রূপ বিয়ের বাজারে বর জোটাতে পারছিল না, এখন তার এত স্তাবক জুটল যে আমার ঘরে টেঁকা দায় হল। গাঁয়ের জমিদারের

বড় ছেলে দাসীর হাতে তার বৌয়ের গায়ের হীরেমোতির এক-বাক্‌স গয়না আর এক-তোরঙ্গ জরি-সাটিনের জামা কাপড় বায়না পাঠিয়ে দিলে। আমি ঐ ঝুটোর ঝল্‌কে মেকির মোহে নিজেকে বিকিয়ে দিলাম। গ্রাম ছেড়ে এলাম কল্‌কাতায়। কল্‌কাতায় এসে বাবু ওস্তাদ আর মাষ্টার রেখে গান বাজ্‌না নাচ লেখাপড়া দস্তুর মতন শেখালেন। বছর তিন নেশার ঝোঁকে কেটে গেল। বাবু তখন আমাকে অসহায় ফেলে বিষয়ান্তরে মন দিলেন।

দেখ্‌লাম এতদিনের এত প্রণয়বচন চাটুবাণী সব মিথ্যা—সত্য শুধু দোকানদারি !

দোকানদারিই সুরু হল; পশারও জম্‌ল কম না। এমন সময় সব পণ্ড করে জন্ম নিল আমার মেয়ে !

মিথ্যার গিল্‌টি জলুস চটে গেল। সত্য সত্য যাকে পেলাম সে যে ঐ পণ্যপথের কুড়োনো মাণিক ! সে যে ভালোবাসার সাহারার মাঝখানে একরত্তি ওয়েসিস ! সে যে নুনপাথারের মধ্যখানে একটি বিন্দু বৃষ্টির জল ! তাকে পাবার জন্যে, তাকে বাঁচাবার জন্যে ভরা পসার নষ্ট করে আমাকে সাবধানী হতে হল। ছুটির দিনেই আমাদের পণ্যশালার সমারোহ, কিন্তু সেই দিনই আমার দোকানপাট বন্ধ করে আমাকে মেয়ের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌তে হত। পাছে সেইদিনে কেউ মেয়ের সাম্‌নে এসে পড়ে এই আশঙ্কায় আমাকে দুজায়গায় বাড়ী কর্‌তে হল—

একটা ব্যাপারীটোলায় আর একটা সেখান থেকে অনেক দূরে গৃহস্থপাড়ায়।

এম্‌নি লুকোচুরি কুড়ি বচ্ছর চলেছিল। মনে করেছিলাম শিশিরের হাতে বিদ্যুৎকে গছিয়ে দিয়ে লুকোচুরির চরম করে ফেল্‌ব। তা আর চল্‌ল না। এখন সব লুকোচুরি চুকিয়ে ফেলে মৃত্যুর যবনিকা টেনে দিচ্ছি।

বিদ্যুৎ তার মায়ের অপরাধ ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে; তার সে শিক্ষা হয়েছে।—এই আশ্বাসেই আমি মর্‌ছি। মায়ের লজ্জাই তাকে সকল প্রলোভন আর স্খলন পতন থেকে রক্ষা কর্‌বে।

শিশিরের কাছেও আমি ক্ষমা চাইছি। বিদ্যুৎকে তার মায়ের অপরাধে যেন সে দণ্ড না ছায়।

আমার সোনাগাছির বাড়ী আর শ্যামবাজারের বাড়ী, সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি, আর কোম্পানির কাগজ, সব বিদ্যুতের। এই আমার অর্জ্জন, এর জন্যই আমার এত দুঃখ লজ্জা অপমান স্বীকার।

ভগবানকে কখনো ডাকিনি। মৃত্যুর সম্মুখে তাঁকে প্রণাম কর্‌ছি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব না, সকল দণ্ড মাথা পেতে নিতে পারি এই বল কেবল ভিক্ষা কর্‌ছি। ইতি—

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী।

পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া বিদ্যুৎ চিঠিখানি হাত বাড়াইয়া

শিশিরের সম্মুখে ধরিল। শিশির পত্র লইতে হাত বাড়াইয়া বিদ্যুতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল বিদ্যুতের দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। শিশির আশ্চর্য্য হইয়া চিঠি পড়িতে পড়িতে বজ্রাহতের মতন স্তম্ভিত হইয়া রহিল। শিশির বিদ্যুতের দিকে মুখ তুলিতেও লজ্জা বোধ করিতেছিল; সেই লজ্জার পরিমাণ দিয়াই সে বুঝিতে পারিতেছিল বিদ্যুতের মন কি বিষম ব্যথার তুফানে বিমথিত হইতেছে!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শিশির মৃদু স্বরে নত মুখে বলিল—এখন একবার সেখানে যাওয়া উচিত।

বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—আবার! সকল সম্পর্ক আমি কাল চুকিয়ে এসেছি......

"তবু......" কথা বলিতে গিয়া শিশির থামিয়া গেল; সে বলিতে যাইতেছিল "তবু ত সে মা", কিন্তু তাতে বিদ্যুতের মনে আঘাত লাগিবে বলিয়া সে থামিয়া বলিল "তবু......একবার গিয়ে খোঁজ নেওয়া ভালো। আমি না হয় একলা গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি।"

বিদ্যুৎ চুপ করিয়া রহিল। শিশির আস্তে আস্তে উঠিয়া বিদ্যুতের দিকে না চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাতাশ

ক্ষণপ্রভা আত্মহত্যা করিয়া অসহ্য লজ্জার ধিক্কার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। ক্ষণপ্রভার সমস্ত সম্পত্তি এখন বিদ্যুতের। শিশির যখন বিদ্যুৎকে শ্যামবাজারের বাড়ীতে গিয়া কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি সম্পত্তির অধিকার লইতে অনুরোধ করিল, তখন বিদ্যুৎ ঘৃণার আবেগে বলিয়া উঠিল—ঐসবের আমি এক পয়সাও ছোঁব না। কলেজের মেম আমাকে একটা চাকুরি জোগাড় করে দিয়েছেন, আমি কালই শিলং যাচ্ছি।

শিশির সম্ভ্রম ও ব্যথাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া বলিল—পড়া ছেড়ে দেবে?

বিদ্যুৎ দুঃখের চাপে দমিয়া গিয়া বলিল—কি করব?

—এত সম্পত্তি, তুমি না নিলে ত যে-সে নিয়ে নষ্ট করবে।

—যা আমার নয় তার জন্যে মমতাও নেই, নষ্ট হলে দুঃখও নেই।

শিশির একটু ভাবিয়া বলিল—তার চেয়ে সম্পত্তি তুমি নিয়ে লোকহিতে দান কর না?

বিদ্যুৎ শিশিরের মুখের দিকে চাহিয়া একটুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—ঠিক বলেছেন। ঐসব সম্পত্তি দরিদ্র বিধবাদের

শিক্ষা আর রক্ষার জন্যে নিযুক্ত হোক। এসব ঝঞ্ঝাট ত আমরা পোয়াতে পার্ব না; আপনি এটর্ণিকে দিয়ে দানপত্র তৈরি করুন আর কোনো সমাজ বা সমিতি যারা এই কর্ম্মে ব্রতী আছে তাদের হাতে এই ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হব।

প্রসিদ্ধ বাঈজী ক্ষণপ্রভার আত্মহত্যাতে দেশময় খুব শোর্‌গোল পড়িয়া গিয়াছিল। রজত তার কাগজে লিখিয়া সকলকে জানাইল যে ক্ষণপ্রভা বাঈজীর বাড়ীতে প্রসিদ্ধ লেখক শিশির-চক্রবর্ত্তীর নিয়মিত গতায়াত ছিল।

যখন ক্ষণপ্রভার লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি বিধবাদের সাহায্যে দান করাতে দেশের সমস্ত কাগজে এই বৃহৎ দানের প্রশংসা প্রচারিত হইতে লাগিল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের নামও ঘোষিত হইতে লাগিল, যে, সে নিজের গায়ের গহনা ও নিজের সমস্ত কাপড় জামা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব দান করিয়া দানের মাহাত্ম্য আরো বাড়াইয়াছে, তখন রজত তার নারদকে দিয়া ঘোষণা করিল ঐ বিদ্যুৎ শিশির-চক্রবর্ত্তীর প্রণয়িনী; শিশিরের নিজের ত এক পয়সার মুরোদ নাই অথচ বিদ্যুৎ বাঈজীকে পুষিবার বিলাসিতার সখটুকু পূরামাত্রায় আছে; শিশির রজতের কাছে পাঁচ শত টাকা ধার করিয়া বিদ্যুৎকে দক্ষিণা দিয়াছে—এর প্রমাণ তার কাছে আছে।

যে লোক প্রসিদ্ধ হয় তার নামে কুৎসার আভাস

পাইলেই সাধারণ লোকে উৎসুক ও উৎফুল্ল হইয়া উঠে। পরচর্চ্চাপরায়ণ লোকেদের উত্তম খোরাক জোটাতে শিশিরের কলঙ্কে দেশ ছাইয়া গেল।

সন্ধ্যা ম্লান মুখে রজতকে বলিল—শিশির-ঠাকুরপোর সম্বন্ধে এমন মিথ্যে কথাগুলো কেমন করে লিখ্‌ছ ?

রজত গম্ভীর ভাবে বলিল—শিশিরের সঙ্গে আমার আলাপের আরম্ভ ত মিথ্যে দিয়েই। তখন উঠ্‌তে বস্‌তে মিথ্যে বলেছি, তোমরা জেনেও ত কৈ তিরস্কার করনি, বরং সমর্থন করেছ। আর আজকে হঠাৎ এমন ধর্ম্মভাব জেগে উঠ্‌ল কেন? আচ্ছা শুনি কোন্‌টা মিথ্যে ?

—ঠাকুরপো তোমার কাছে টাকা নিয়ে বিদ্যুৎকে দিয়েছেন।

রজত কথায় উত্তর না দিয়া টেবিলের দেরাজ টানিয়া শিশিরের হ্যাণ্ডনোটখানা বাহির করিয়া সন্ধ্যার সাম্‌নে ফেলিয়া দিল।

সন্ধ্যা তাহা দেখিয়া বলিল—আচ্ছা, টাকা যেন নিয়েছেন, বিদ্যুৎকে যে দিয়েছেন তার প্রমাণ কি ?

—বিদ্যুৎ যে রাত্রে তার মার পরিচয় পেয়ে মাকে ছেড়ে চলে আসে, সেই রাত্রেই শিশির টাকা ধার কর্‌তে আসে। বনমালী বাড়ী যাচ্ছিল, দেখ্‌লে আমাদের বাড়ীর বাইরে বিদ্যুৎ গাড়ীতে বসে শিশিরের জন্যে

অপেক্ষা করছে; শিশির টাকা নিয়ে গিয়ে বিদ্যুতের হাতে দিলে আর বিদ্যুৎ চলে গেল।

সন্ধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সেইদিনই যে বিদ্যুৎ তারমার পরিচয় পেয়েছিল তা তুমি জান্‌লে কি করে?

রজত থতমত খাইয়া বলিল—যেদিন শিশির টাকা ধার করে তার একদিন পরে বিদ্যুতের মা আত্মহত্যা করে তাই মনে আছে। শিশির বিদ্যুতের জন্যেই টাকা ধার করতে এসেছিল। মা জানেন।

—আচ্ছা এসেছিলেনই যেন, তাতে দোষ কি হয়েছে? তুমি ওদের চরিত্রের ওপর দোষারোপ করছ কেন? তুমি বেশ জানো যে শিশির-ঠাকুরপো বিদ্যুৎদের বাড়ী যেতেন বিদ্যুতের মার সমস্ত পরিচয় না জেনেই, আর বিদ্যুতের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তার মধ্যে নিন্দার কিছু নেই।

রজত বলিল—তা তুমিও নিশ্চয় করে বল্‌তে পারো না, আমিও নিশ্চয় বিশ্বাস করতে পারি না। অধিকন্তু আমি ত বিশেষ কিছু লিখিনি, আমি কেবল তার ভক্ত পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছি তোমাদের পেয়ারের লেখকটি প্রসিদ্ধ ক্ষণপ্রভা বাঈজীর বাড়ীতে গতায়াত করতেন এবং এখনো তার মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন, নিজের সঙ্গতি না থাক্‌লেও ধার করে তাকে টাকা জোগান্। এর বেশী আমি কিছু লিখেছি? তার এক বর্ণও কি মিথ্যে?

সন্ধ্যা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মিথ্যে মিথ্যে এর সব মিথ্যে! তুমি আগে যে মিথ্যে বল্‌তে তার অন্তরালে সততা ছিল বলে তা মহিমান্বিত হয়ে উঠ্‌ত, আর এই সত্যের আড়ালে প্রকাণ্ড মিথ্যার ইঙ্গিত থাকাতে একে কুৎসিত ভীষণ করে তুলেছে! যে ধিক্কার লোকে নির্ম্মল নির্দ্দোষী শিশিরকে দিচ্ছে, তার ধাক্কা কি তোমার মনে এসে লাগ্‌ছে না?

রজত তাচ্ছিল্য করিয়া হাসিয়া বলিল—কিচ্ছু না। মনে লাগ্‌ছে শিশিরের জন্যে তোমার এতদূর আগ্রহটা। অচেনা অজানা অসৎ লোককে একেবারে অন্দরে ঢুক্‌তে দিয়ে ভালো করিনি।

সন্ধ্যা যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উগ্র স্বরে বলিয়া গেল—ভালো করনি নিশ্চয়! তোমার অযাচিত দয়া যদি তাঁকে আক্রমণ না কর্‌ত তবে তাঁকে এই অপমান লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হত না!

রজতের মুখে ক্রোধ হিংসা সন্দেহ দুঃখ অন্ধকার হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সুনয়নী ঘরে আসিলেন। মাকে দেখিয়া রজত মাথা নীচু করিল। সুনয়নী বলিলেন—অমন লোককে এমন করে অপমান কর্‌ছিস রজত! কি বন্ধুকে তুই হারালি তা কি তুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ নে?

রজত চুপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। সুনয়নী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘর থেকে বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যা নিজের ঘরে গিয়া শিশিরকে চিঠি লিখিল—

ঠাকুরপো,

লোকে যে যাই বলুক, আমি জানি এইসব অপবাদ কতদূর মিথ্যা। যে যাই লিখুক তার অক্ষমতা এত সুস্পষ্ট যে আপনার শক্তি ও খ্যাতিকে তারা খর্ব্ব কর্‌তে কিছুতেই পার্‌বে না। ব্যথিতা বৌদিদি।

রজতের অকারণ হিংসার দৌরাত্ম্য শিশিরের বুকে শেল সমান বাজিতেছিল। এতদিন রজত তাকে যত কিছু কটু বলিয়াছে সমস্তই সহ্য করিয়া সে সন্ধ্যা ও সুনয়নীর কাছে যাওয়া বন্ধ করে নাই। কিন্তু রজত তার চরিত্রে দোষারোপ করিয়া তাঁদের কাছে শিশিরের যাওয়ার পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। অধিকন্তু রজতের কাছে যে রাত্রে সে বিদ্যুতের জন্য টাকা ধার করিতে যায় সেদিনকার টুক্‌রা-টুক্‌রা কয়েকটা কথা পরবর্ত্তী নানা ঘটনায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়া শিশিরকে জানাইয়া দিয়াছিল যে রজত কি-রকম অধঃপাতে গিয়াছে। সে যে-বিদ্যুৎকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোবাসে তার মনে লজ্জা ও দুঃখ দিবার প্রধান কারণই যে রজত ইহা জানিয়া সে কিছুতেই তাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না; রজতের কাছে শত ঋণের কৃতজ্ঞতা এই বিরাগে ঘৃণায় চাপা পড়িয়া যাইতেছিল। ইহাতে তার প্রাণ যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, সে মুক্তির উপায় খুঁজিয়া

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ অকস্মাৎ শিশির সন্ধ্যার সান্ত্বনাবাণীর সংক্ষিপ্ত চিঠি পাইয়া যেন বোধ করিল তার বদ্ধ বন্দীশালার একটা গবাক্ষ খুলিয়া গিয়া বাহিরের মুক্ত সমীরণের সঞ্চার হইল, সেই বাতাসে ভাসিয়া আসিয়াছে বাহিরের ধরণীর উদার বক্ষের বিশালতার বিস্তার ও সবুজের চুম্বন, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের বিচিত্র আলোকধারার ইঙ্গিত, আর বিহঙ্গসঙ্গীত ও পুষ্পসুগন্ধের অনাবিল আভাস! এই চিঠি পাইয়া শিশির যেন বর্ত্তিয়া গেল। সে সুনয়নী ও সন্ধ্যার কাছে আর যাইতে পারিবে না; কিন্তু তাঁরা যে তাকে মন থেকেও বর্জ্জন করেন নাই, এই যে তার মহৎ সান্ত্বনা, বিশেষ লাভ!

সেই দিন সে বিদ্যুতেরও চিঠি পাইল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—।

আমরা যে আপনার নিন্দা ও অপমানের কারণ—এ দুঃখ মরণাধিক বোধ হচ্ছে। ক্ষমা চাইবারও অধিকার আমার নেই, কারণ এই ঘটনা আমাদের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়নি। আপনি অনেক দুঃখ অক্লেশে সহ্য করেছেন; এতেও আপনার মহত্ত্বকেই উন্নত করবে, কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

আপনি রজতের কাছ থেকে টাকা ধার করে এনে দিচ্ছেন জানলে আমি নিতাম না।

চিরকৃতজ্ঞ বিদ্যুৎ।

বিদ্যুৎ চাকুরি লইয়া চলিয়া যাওয়া অবধি শিশিরকে সে কোনো চিঠি লেখে নাই। আজ তার চিঠি পাইয়া শিশিরের অপার আনন্দ বোধ হইল। এই তার বিদ্যুতের প্রথম চিঠি পাওয়া। শিশির যাদের ভালোবাসে, যারা তাকে ভালোবাসে তাদের দুজনেরই চিঠি পাইল, কিন্তু সে তাদের চিঠি লিখিতে পারিল না—তার মতন কলঙ্কিত চরিত্রের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া তারা নিন্দাভাজন হইবে এ সে সহ্য করিতে পারিবে না। সন্ধ্যা ও বিদ্যুৎ তাকে এখনও ত্যাগ করে নাই, এই জানাটাই শিশিরের মতন সর্ব্বহারার পক্ষে মস্ত পাওয়া, এতেই সে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত।

শিশিরের এখন প্রধান চেষ্টা হইয়া উঠিল রজতের ঋণ শোধ। তার একজামিন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, এখন সে আর বেশী কিছু লিখিবার সময় পায় না; যা আগেকার লেখা এখন ছাপা হইতেছে তার জন্য যা পায় তাতেই তার খরচ চলে। রজতের ঋণ শোধের জন্য থোক পাঁচ শো টাকা সে কোথায় পাইবে?

এদিকে রজত নারদের লেখকদের খুব বেশী বেশী টাকা পারিশ্রমিক দিতেছে; বিশেষ করিয়া বেশী দ্যায় যারা শিশিরকে মন্দ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে; এই উপায়ে খগেন বনমালী পূর্ণ হেম বেশ দুপয়সা

রোজ্‌গার করিয়া নিজেদের বেলেল্লাগিরি বদখেয়ালির খরচ জোগাইতেছে।

একদিন রজত একটা প্রবন্ধ পাইল তাতে শিশিরের লেখার সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচক লেখককে কিছুমাত্র গালি না দিয়া লেখারই ত্রুটি ও অক্ষম প্রয়াস চমৎকার ভাষায় জোরালো যুক্তি নজির দৃষ্টান্ত দিয়া দেশী বিলাতী অপর লেখার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখাইয়া একটি সমালোচনা লিখিয়াছে। সমালোচক উপসংহারে লিখিয়াছে—প্রত্যেক লেখকই স্রষ্টার চেয়ে সমালোচক বড়; তার মনের মধ্যে কল্পনায় যে ছবিটি ফুটিয়া উঠে তাকে লেখায় রূপ দিতে গিয়া সে বুঝিতে পারে মানসীর সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য শতাংশও সে ধরিতে পারে নাই। এই যে আদর্শকে নাগাল না পাওয়ার দুঃখ লেখককে তার অক্ষমতা যেমন করিয়া জানাইয়া ছায় তেমন আর কেউ টের পায় না। সুতরাং লেখক যদি নিজে নিজের সমালোচক হইয়া বসে তবে সে যেমন নিজের গলদ ত্রুটি অসম্পূর্ণতা নির্ম্মম ভাবে উদ্‌ঘাটন করিতে পারে তেমন আর কেউ না। শিশির-বাবু নিজেকে নিজের সমালোচক করিয়া তুলিতে পারিলে আমি যত কিছু তাঁর দোষত্রুটি দেখাইলাম তাহা তাঁকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। আশা করি ইহার জন্য তিনি বা তাঁর প্রতি পক্ষপাতী পাঠকেরা আমার উপর অপ্রসন্ন হইবেন না।

রজত খুসী হইয়া দেখিল প্রবন্ধের নীচে নাম স্বাক্ষর আছে—শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা। ঠিকানা আছে কেয়ার অফ প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টার।

রজত এই প্রবন্ধ পাইয়া লাফাইয়া উঠিল। এতদিন যাকে গালাগালি দিয়া কাবু করা যায় নাই, এইবার তার শক্তিশেল হাতে পাওয়া গিয়াছে। রজত তখনই শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মাকে প্রবন্ধের জন্য পঞ্চাশ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া চিঠি লিখিল আরো প্রবন্ধ, আরো চাই, এম্‌নি শিশিরের লেখার সমালোচনা। শ্রীশ-বাবু রজতের সঙ্গে দেখা করিলে রজত আপ্যায়িত হইবে। আর শ্রীশবাবু স্থান ও কাল স্থির করিয়া জানাইলে রজতও দেখা করিতে যাইতে পারে। চিঠির উত্তরে শ্রীশচন্দ্রের কিন্তু কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মার লেখা নারদে বাহির হইতেই আবার একবার লোকে বিস্ময় মানিল। কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল এমন শক্তিমান লেখক শিশির, যার অকস্মাৎ আবির্ভাব লোককে একবার চমক লাগাইয়া দিয়াছিল; আর কোথায় লুকাইয়া ছিল এমন শক্তিশালী সমালোচক শ্রীশ যার হঠাৎ প্রকাশ লোককে আবার আশ্চর্য্য করিয়া তুলিল। সকলকেই মানিতে হইল—হ্যাঁ, সমালোচনা বটে! যারা শিশিরের লেখার পক্ষপাতী ছিল তারাও বলিল—হ্যাঁ, লিখেছে একরকম মন্দ না। তবে, শুধু

মন্দ দিকটাই দেখেছে, ভালো দিকটা একেবারে দেখেই নি। সুতরাং এ সমালোচনা রজত-বাবুর ফর্‌মাসি।

মুদ্রিকা ও সংগ্রহ এই সমালোচনার পাল্টা জবাব দিয়া সমালোচনার সমালোচনা ও শিশিরের নৈপুণ্য প্রমাণ করিবার জন্য কোমর কষিয়া লাগিয়া গেল। তাহা দেখিয়া শিশির হাসিয়া নিজের মনে বলিল—

"ততদিনে দৈবে যদি
পক্ষপাতী পাঠক থাকে,
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ
এম্‌নি কটু বল্‌ব তাকে!"

রজত সেই মাসে শ্রীশ-শর্ম্মার আবার এক প্রবন্ধ পাইল। ফেরত ডাকে হাতে হাতে পঞ্চাশ টাকা ও সাক্ষাতের জন্য সানুনয় অনুরোধ রজতের কাছ হইতে গেল।

যেসব কাগজ আগে মাসিক ছিল নামে, দেখা দিত অনিয়মে, তারা এখন এই উৎসাহের ঝোঁকে শিশিরের পক্ষ বা প্রতিপক্ষ হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল; এবং সেইজন্য বকেয়া বাকি শোধ করিবার তাগাদায় একই মাসে ঘন ঘন দুতিন সংখ্যা বাহির করিয়া ফেলিল। যুদ্ধটা বেশ জাঁকিয়া উঠিল।

শিশির অনেক দিন পরে আবার সন্ধ্যার চিঠি পাইল—

ঠাকুরপো,

আপনার যশের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে কত পতঙ্গই যে পাখা পোড়াতে ছুটে আস্‌ছে তার ঠিক নেই। একটি নূতন পতঙ্গ জুটেছে—কে একজন শ্রীশ-শর্ম্মা। জোনাকীর মতন তারও একটা নিজস্ব দীপ্তি আছে, কিন্তু তবু সে আপনার উজ্জ্বলতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। যত বেশী লোকে আপনার বিরুদ্ধ হচ্ছে ততই প্রমাণ হচ্ছে আপনি অসাধারণ শক্তিমান, এইসব সামান্তদের চেয়ে ঢের বড়। এতদিন এত লোকের আস্ফালন তাদের আর্ত্তনাদের মতনই মনে হত; এইবার মনে হচ্ছে এক-জন প্রকৃত যোদ্ধা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে—যার হাতে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বেজেছে! কিন্তু তাকে দেখে দুঃখও হচ্ছে আর আশ্চর্য্যও লাগ্‌ছে যে সে আপনারই ভাণ্ডার থেকে অস্ত্র চুরি করে এনে আপনার সঙ্গে লড়্‌ছে!—আপনারই ভাষা, আপনারই যুক্তি, আপনারই বিচক্ষণ পাণ্ডিত্য এ চোর কোথা থেকে কেমন করে আহরণ কর্‌লে! এ অস্ত্র যেন শিখণ্ডীর পশ্চাতে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব থেকে বিমুক্ত হচ্ছে! ভরসা এই যে অপর পক্ষে ভীষ্ম লড়্‌ছেন এবং এইসব ক্লীবকে দেখে তিনি অস্ত্র ত্যাগ কর্‌বেন না।

আপনার বৌদিদি।

শিশির সন্ধ্যার চিঠি পড়িয়া পরম সুখে গভীর আনন্দে হাসিল। এই একটি মেয়ে তাকে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া

সান্ত্বনা দিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া সুযোগ খুঁজিতেছে— এই সৌভাগ্য শিশিরের সকল দুঃখ ভুলাইয়া দিল। শিশিরের বেশী হাসি পাইল সন্ধ্যার চিঠিতে ভীষ্মার্জ্জুনের যুদ্ধের উপমা পড়িয়া। শিশিরের মনে পড়িল, সেও রজতের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনে মনে করিয়াছিল রজত অর্জ্জুনের ন্যায় পাতাল-হৃদয় ভেদ করিয়া ভোগ-বতীর অমৃত-উৎস তার মুখের কাছে আনিয়া দিতেছে— সেই অমৃত-উৎস ত এখনো শুকায় নাই, সন্ধ্যা ও সুনয়নীর স্নেহধারা ত এখনো অনাবিল ও অপ্রতিহত বহিতেছে, তবে যে বাণ একদিন তার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা আজ তার হৃদয় বিদ্ধ করিবার জন্য এত উন্মুখ হইয়া উঠিল কেন? ভাবিতে ভাবিতে শিশিরের মনে পড়িল বিদ্যুৎকে। সে এই শ্রীশ-শর্ম্মার লেখা পড়িয়া কি মনে করিতেছে? কিন্তু বিদ্যুৎ যে শিশিরকে চিঠি লেখে না, শিশিরও যে তাকে চিঠি লিখিতে পারে না।

দশ মাসে শ্রীশ-শর্ম্মার দশটি লেখা নারদে ছাপা হইল। তার পর শ্রীশ-শর্ম্মা একেবারে নিপাত্তা হইয়া ডুব মারিল। রজতের বারংবার তাগাদাতেও আর প্রবন্ধ পাওয়া গেল না, লোকটা যে কে এবং কোথায় থাকে তারও সন্ধান মিলিল না। প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টার তার ঠিকানা জানেন না; সে নিজে মাঝে মাঝে আসিয়া পোষ্ট অফিস হইতে টাকা ও চিঠি লইয়া যায়।

শ্রীশ-শর্ম্মার লেখা যখন পাওয়া গেল না, তখন আবার রজতকে শিশিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্র ধরিতে হইল। সেই মাসের নারদে রজত শিশিরকে অনেক কটু বলিয়া শেষে লিখিল—শিশির যদি সেই মাসের মধ্যে তার ঋণ পাঁচ শত টাকা শোধ না করে, তবে সে নালিশ করিবে এবং শিশিরকে জেল খাটাইয়া ছাড়িবে।

তাহা পড়িয়া শিশির হাসিতে হাসিতে কালিদাসকে নারদখানা দেখাইয়া বলিল—রজত আমায় এটর্নির চিঠিও দিয়েছে, কাল পেয়েছি।

কালিদাস মুখ বিষণ্ণ করিয়া শিশিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং ক্ষণেক পরে জামা চাদর পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেইদিন রজত এই চিঠি পাইল—

শ্রীযুক্ত রজতচন্দ্র রায়,

নারদ-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পৌনঃপুনিক আদেশ-মত কাল বিকাল বেলা আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব এবং শিশিরের সমালোচনা আরো চাই কি না সে বিষয়ে সাক্ষাতে স্থির করা যাইবে।

আপনার নিকট কৃতজ্ঞ শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা।

রজত চিঠি পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে যথা-

সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য খগেন পূর্ণ হেম বনমালীকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল।

কালিদাস ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—রজত, তুমি এতবড় নিষ্ঠুর ছোটলোক তা আমি আগে জান্‌তাম না। শিশিরকে এটর্নির চিঠি দিয়েছ! তাকে জেল খাটাবে তুমি! আমরা কি শিশিরের বন্ধু নই? আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি; তুমি শিশিরের হ্যাণ্ডনোট আমায় ফিরিয়ে দাও।

রজত চিরকাল তার ঠাণ্ডা মেজাজের জন্য প্রসিদ্ধ। সে হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—আমি এমন মিথ্যাচারটা কেমন করে করি? তুমি ত আমার কাছে টাকা ধার নেওনি যে তোমার হ্যাণ্ডনোট নেব আমি।

কালিদাস রজতের শঠতায় বিরক্ত হইয়া বলিল—আচ্ছা বেশ। আমরা শিশিরকে পাঁচ শো টাকা জোগাড় করে ঋণ দিয়ে তোমার ঋণ কালই শোধ কর্‌তে বল্‌ব।

রজত হাসিয়া বলিল—উত্তম। শিশির যার কাছ থেকেই পাক আমার টাকা কটা তার কাছ থেকে পেলেই হল। ...ওহে কালিদাস, কাল শ্রীশ-শর্ম্মা দেখা কর্‌তে আস্‌ছে, তোমারও নিমন্ত্রণ রইল, এসো আলাপ করিয়ে দেবো।

কালিদাস বিরক্ত হইয়া বলিল—এই দেখ অন্যায়ের কি রকম উৎকট আকর্ষণ! এমন একটা শক্তিশালী লেখক, সে সাহিত্যক্ষেত্রে নাম্‌ল কিনা অহীরাবণের মতন

ভূমিষ্ঠ হয়েই অস্ত্র ধরে! তোমরা হিংসা-দ্বেষের যে আবর্ত্ত পাকিয়ে তুলেছ, তার টানে সে পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে এসে মিল্‌ছে! কিন্তু এই নতুন যোদ্ধাকে দলে ভর্ত্তি করে তোমার সুবিধে হবে না রজত। বিয়াল্‌জিবার ভগবানের শ্রেষ্ঠতা সহ্য না কর্‌তে পেরে স্বর্গ ছেড়ে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল নরকে শয়তানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর্‌বার জন্যে! তুমি শিশিরের শ্রেষ্ঠতার হিংসায় যুদ্ধে নেবে শেষকালে এই শ্রীশকে সেনাপতি করে সামান্য পদাতিক হয়েই থাক্‌বে। যে পরাজয় সেই পরাজয়!

কালিদাসের যুক্তির জোরে রজত একেবারে দমিয়া নিরুত্তর হইয়া গেল। সে যে-কথা এতদিন ভাবিয়া দেখে নাই, কালিদাস তাহা বুঝাইয়া দিয়া গেল। বাস্তবিক ত, এই দশ মাস সে শ্রীশের দশটা লেখা ছাপিয়াছে, লোকে শ্রীশকেই ধন্য ধন্য করিয়া প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি তাকেই দিয়াছে; সেই পূজায় রজতের স্থান কোথায়? সে শ্রীশ-শর্ম্মার পূজার পুরোহিত মাত্র। তারই হাতে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রের পুঁথি, তবু সেই প্রতিমা পুরোহিতের চেয়ে বড়! রজতের মন সেই অচেনা শ্রীশ-শর্ম্মার উপরও চটিয়া উঠিল; তাকে অভ্যর্থনা করিবার উৎসাহ আর কিছু মাত্র থাকিল না।

রজতকে নিরুত্তর গম্ভীর বিষণ্ণ দেখিয়া কালিদাস খুসী হইয়া চলিয়া গেল। কালিদাস বাড়ীর দরজার কাছে

যাইতেই একজন চাকর দৌড়িয়া আসিয়া তাকে বলিল—মা একবার আপনাকে ডাকৃছেন।

কালিদাস ফিরিয়া সুনয়নীর কাছে গেল।

কালিদাস ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই ম্রিয়মাণ রজতকে উৎসাহিত করিবার জন্য খগেন তার উচ্চ চীৎকারের স্বরে বলিয়া উঠিল—শিশির-চক্রবর্ত্তীকে যে আমরা নানান-রকমে হারিয়ে দিয়েছি এই আমাদের মস্ত জিত্। তাকে আমরা গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছি; শ্রীশ-শর্ম্মা তার লেখাকে তুলো-ধোনা করে তুয়ো-তাক্তা করে ছেড়েছে; তার প্রেয়সী বিদ্যুৎ গিয়ে দেখ্‌লেন রজত-রায় তার মায়ের কোমর ধরে মদের গেলাস হাতে করে নৃত্য করৃছেন!

রজত খুসী হইয়া বলিল—বড় কষ্টে গেল বিদ্যুৎ ছুঁড়ি। মাগী যে উগ্রচণ্ডা হয়ে বোতল হাঁকৃরাতে সুরু করৃলে, জুতো চাদর ফেলেই ত আমাদের পালাতে হল; নইলে মেয়েটাকে দলে টানৃতে পারৃলে শিশিরকে আরো জব্দ করা যেত।

কালিদাসের ক্রুদ্ধ স্বর শুনিয়াই সন্ধ্যা দৌড়িয়া গিয়া বৈঠকখানার পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে স্বামীর পূর্ণ পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তার স্বামী সামান্য পাঁচ শত টাকার জন্য শিশিরকে এটর্ণির চিঠি দিয়াছে! শিশির টাকা দিতে না পারিলে তাকে জেল খাটাইবে! শিশিরের মতন মহৎ চরিত্রের বন্ধুকে নির্য্যাতন করিয়া

তার স্বামী সুখী হইয়া আছে খগেন ও বনমালীর মতন যত সব ওঁচা ছোটলোকদের সংসর্গে। তাদের সংসর্গে পড়িয়া তার স্বামীর কতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে সে এখন মদ খায়, নর্ত্তকীর বাড়ীতে গিয়া বেলেল্লাপনা করিতেও তার আর লজ্জা নাই! তাই সন্ধ্যা আজকাল আর তার স্বামীকে দেখিতে পায় না; তাই সে আজকাল বাহিরে বাহিরেই থাকে, অনেক রাতে বাড়ীতে আসে, বাহিরের বৈঠকখানাতেই রাত্রিযাপন করে, সন্ধ্যা প্রশ্ন করিলে বলে কাগজ নিয়ে ঝঞ্ঝাট! ঘৃণার ধিক্কারে সন্ধ্যার সমস্ত অন্তর পীড়িত হইয়া উঠিল। সে বাহির-ঘর হইতে ছুটিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল আর বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ মাথায় কার স্নেহস্পর্শ অনুভব করিয়া সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া দেখিল সুনয়নী তার মাথায় হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁর চোখ দিয়াও অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। সুনয়নীর চোখে জল দেখিয়া সন্ধ্যা আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুনয়নী বলিলেন—বৌমা, তুমি দিনকতকের জন্যে না হয় তালতলায় গিয়ে থাকো গে।

সন্ধ্যা অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া বলিল—আজকেই আমি যাব মা।

তালতলায় সন্ধ্যার বাপের বাড়ী।

আটাশ

পরদিন বিকাল যত ঘনাইয়া আসিতেছিল, রজতের বুকের মধ্যে তত আন্দোলন দ্রুত হইতেছিল, এইবার শ্রীশ-শর্ম্মা আসিবে। শ্রীশের আগমন স্পৃহণীয় বোধ হইতেছিল না বলিয়াই রজতের উদ্বেগ অত প্রবল হইতেছিল।

এমন সময় রজতের অন্ধকার মুখ আরো অন্ধকার করিয়া দিয়া হাসিমুখে সেই ঘরে আসিল শিশির। রজত আর তার অনুচরেরা অবাক বিস্ময়ে শিশিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—এতকাল পরে আবার এ লোকটা এ বাড়ীতে কেন? এ লোকটাকে মুখ দেখাইতে যত লজ্জা করে ততই কি এ সামনে না আসিয়া ছাড়িবে না? আর এই বেহায়াকে কি কিছুতেই লজ্জা দেওয়া যাইবে না!

সকলকে নির্ব্বাক দেখিয়া শিশির হাসিমুখে পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া পাঁচ শত টাকা গণিয়া রজতের হাতে দিল। এত সহজে শিশির ঋণ শোধ করিয়া রজতকে একেবারে হতাশ করিয়া দিল। সে এতদিন কত কল্পনা করিতেছিল শিশির টাকা শোধ করিতে পারিবে না, তাকে জেলে দিতে না পারুক আদালতে টানিয়া লইয়া গিয়া অপদস্থ করিবে। রজত

টাকাগুলি লইয়া দেরাজ হইতে শিশিরের হ্যাণ্ডনোটখানি বাহির করিয়া আনিয়া শিশিরের হাতে দিল।

শিশির হ্যাণ্ডনোটখানি ভাঁজিয়া পকেটে ভরিয়া পকেট হইতে একতাড়া চিঠি ও মনিঅর্ডারের কুপন বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তুমি শ্রীশ-শর্ম্মার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্মে বড্ড ব্যস্ত হয়ে ছিলে। আমিই সেই শ্রীশ-শর্ম্মা! প্রমাণ এইসব তোমার চিঠি আর মনিঅর্ডারের কুপন। আমি শ্রীশ-শর্ম্মার বেনামীতে নিজের লেখার সমালোচনা করে আর তারই উপার্জ্জিত টাকা দিয়ে আমি তোমার অশেষ ঋণের কতক শোধ করে গেলাম।

"আমার ভাগ্যে হলাম আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।
আমায় নিজেই কর্‌তে হল
নিজের লেখা সমালোচন!"

বলিয়াই শিশির প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল।

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। শিশিরের কাছে বারংবার এমন পরাজয়! রজতেরই কাছ হইতে পাঁচ শত টাকা আদায় করিয়া রজতের ঋণ শোধ করিয়া গেল!

সকলকে নীরব দেখিয়া শিশির হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

শিশির চলিয়া গেলে খগেন বলিয়া উঠিল—উঃ! বাঙালটা কি ধূর্ত্ত!

রজত কিছুই বলিল না।

শিশির বাসায় ফিরিয়া গিয়াই দেখিল শিরীষ আর কালিদাস বসিয়া আছে। সে যাইতেই কালিদাস আর শিরীষ দুজনেই তার হাতে দুখানা বেশ মোটা মোটা চিঠি দিল। শিশির দেখিল কালিদাসের দেওয়া চিঠিখানি সুনয়নীর আর শিরীষের দেওয়া চিঠিখানি সন্ধ্যার। সন্ধ্যার চিঠি শিরীষ কেমন করিয়া আনিল বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া শিশির চিঠি না খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন?

শিরীষ হাসিয়া বলিল—সন্ধ্যা আমার সম্পর্কে খুড়তুতো বোন্। আমি একটু রচনার চর্চ্চা করি বলে রজতের হিংসে হয়, আর তার ফলে সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। তার পর আর তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি মুদ্রিকার সহকারী সম্পাদক বলে রজত মুদ্রিকারও শত্রু। তাই সে আমাদের Wiseacres' Club ছেড়ে নিজের এক সঙ্গত করে। সেই জন্যে এতদিন রজতের বন্ধু আপনার কাছে আত্মপরিচয় দিইনি, সন্ধ্যাও দ্যায়নি। সন্ধ্যা কাল আমাদের বাড়ীতে গেছে, সে-ই আমাকে দৌত্যে পাঠিয়েছে—এখন তার স্বামীর শত্রুর দলে আমরা সবাই কিনা।

এই বলিয়া শিরীষ হাসিতে লাগিল। শিশির গম্ভীর হইয়া চিঠি খুলিতে লাগিল। সুনয়নীর চিঠির মধ্য হইতে

অনেকগুলি নোট বাহির হইল, তার সঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

বাবা শিশির,

ভাই ভাইএর সঙ্গে বিরোধ করে, কিন্তু মার কাছে তারা দুই ভাইই সমান। বরং বেশী টান হয় তার ওপর যে অধিক সহ্য করে, যে অপর ভাইএর শত অত্যাচার স্নেহের সঙ্গে ক্ষমা করে। স্বার্থের দ্বন্দ্বে ভাই ভাইকে নির্যাতন করে, কিন্তু তার আঘাত লাগে প্রবল হয়ে মায়ের বুকে। তোমার টাকার দরকার হয়েছিল, আমায় কেন বলোনি? বড় ভুল করেছ, বড় অন্যায় করেছ বাবা। এই চিঠির মধ্যে পাঁচ শো টাকা পাঠালাম,—না নিলে আমি দুঃখ পাব। তুমি অঋণী হয়েছ জানতে পারলে সুখী হব।

তোমার মা।

সন্ধ্যার চিঠি খুলিয়াও শিশির দেখিল তার মধ্যেও পাঁচ শত টাকার নোট! সন্ধ্যা লিখিয়াছে—

ঠাকুরপো,

স্বামীর অপরাধে অপরাধী, আপনার কাছে আসতেও লজ্জা হয়। ক্ষমা চেয়ে যে অবনতি প্রকাশ করব তারও অবসর আপনি রাখেন না, দোষ হতে না হতেই ক্ষমা করে বসে থাকেন, অপরাধ জন্মতে পায় না এমনি ত্বরিত মার্জ্জনা! আমার মনের মধ্যে যে নির্ব্বেদ আর শ্রদ্ধা

জম্‌ছে, প্রায়শ্চিত্তে তাকে দূর করবার অবকাশ আপনাকে দিতে হবে। আপনার ঋণ শোধের জন্যে টাকা পাঠাচ্ছি— নিতে হবে। এ টাকা আমার নিজের; আমি বাপের বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে যা পাই তাই জমানো ছিল; অন্যের টাকা দিয়ে আপনাকে অপমান করতে পারি এমন ধৃষ্টতা আমার নেই।

আপনার বৌদিদি।

সন্ধ্যার চিঠিতে ঐ যে 'অন্য', সে যে রজত, তাহা বুঝিতে শিশিরের বাকী থাকিল না। শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণ হাসিমুখে শিরীষ ও কালিদাসকে বলিল—আমি রজতের টাকা এই মাত্র শোধ করে আসছি—এই সেই হ্যাণ্ডনোট।

শিশির হ্যাণ্ডনোট বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিয়া কালিদাস ও শিরীষের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া বলিল—ঐ পাঁচশো টাকাও রজতেরই কাছ থেকে আমি পেয়েছিলাম—শ্রীশ-শর্ম্মার বেনামীতে প্রবন্ধ লিখে।

কালিদাস উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—শ্রীশ-শর্ম্মা বুঝি তুমিই! তাই ত বলি এমন মুন্সী লেখক আর কে?

শিরীষ হাসিতে হাসিতে বলিল—তা হলে রজতকে ত আচ্ছা ঠকিয়েছেন আপনি। মাছের তেলে মাছ ভেজেছেন দেখ্‌ছি।

কালিদাস আর শিরীষের হাতে নোটগুলি ফিরাইয়া দিয়া

শিশির বলিল—আপনারা মাকে আর বৌদিদিকে বল্‌বেন তাঁদের স্নেহের নিদর্শন আমি মাথায় করে নিলাম। কিন্তু টাকার আমার দর্‌কার নেই এখন, আমি বাঁকিপুরের বেহার-পেট্রীয়ট কাগজের সাব-এডিটার নিযুক্ত হয়েছি।

এমন সময় ডাকহর্‌করা আসিয়া বলিল—শিশির-বাবুর একটা মনিঅর্ডার আছে।

শিশির আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমার মনিঅর্ডার? কত টাকার?

—"পাঁচ শো টাকার।" বলিয়া পিয়ন ফর্ম্মখানা সই করিতে শিশিরের হাতে দিল।

শিশির ফর্ম্ম লইয়া উৎসুক কালিদাসের দিকে ফিরিয়া লজ্জিত আনন্দের সহিত বলিল—বিদ্যুৎ পাঠিয়েছে।

শিশির সই করিয়া টাকা লইয়া বিদ্যুতের চিঠি পড়িল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

চাক্‌রী নিয়ে অবধি টাকা জমাচ্ছিলাম কবে আপনাকে ঋণমুক্ত কর্‌তে পার্‌ব। নারদ পড়েই এই টাকা সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছি। তুচ্ছ টাকা কটাই শোধ কর্‌তে পার্‌লাম—কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করি এমন সাধ্য এই অক্ষমার নেই।—

বিদ্যুৎ।

শিশিরের চিঠি পড়া হইলেই কালিদাস ও শিরীষ উঠিয়া হাসিমুখে বলিল—যাই, সবাইকে সুখবর দিইগে।

শিশির হাসিয়া বলিল—তবে আরো একটা সুখবর দিয়ো—আমি বিদ্যুৎকে বিয়ে করছি। আমি পরশু বাঁকিপুর যাচ্ছি; সেখানে বাড়ী ঠিক করে ঘরকন্না পাতবার মতন জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে আমি আসছে মাসের পয়লা বিদ্যুৎকে আনতে শিলং যাব।

কালিদাস ও শিরীষ হাসিতে হাসিতে সুনয়নী ও সন্ধ্যাকে সুখবর দিতে গেল। শিশির চিঠি লিখিতে বসিল—

প্রিয়তমাসু—

তোমার শ্রদ্ধাস্পদেষু টাকা পেলেন, কিন্তু ও ত শুধু সুদ, আসল পাওয়া যে এখনো বাকী আছে। তাই শ্রদ্ধাস্পদেষু আসছে মাসের পয়লা চলেছেন শিলং স্বয়ং আসল আদায় করতে—শ্রদ্ধাস্পদেষুকে এবার প্রিয়তমেষু বলে তমসুক লিখে দিয়ে তোমায় প্রণয় কর্জ্জ নিতে হবে, সে খৎ রেজেষ্টারী হবে পরিণয়কার্য্যের আপিসে। তার পর বাকীর দায়ে দণ্ড হবে ডিপোর্টেশন একেবারে সোজাসুজি বাঁকিপুরে, সেখানে তোমার বন্দীশালায় তোমার সুখস্বচ্ছন্দের পাহারায় থাকব আমি—বেহার পেট্রীয়টের সাব-এডিটার। ওজর আপত্তি শুনব না। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বিছানা তোরঙ্গ বেঁধে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আমি তোমায় ক্রোক করতে যাচ্ছি।

তোমার পাণিপ্রার্থী মহাজন শিশির।

চিঠি পাইয়া বিদ্যুৎ নিজের চোখকে ও বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিতে পারে না। সে যা পড়িতেছে, যে মানে বুঝিতেছে, সত্যই কি শিশির তাই বলিতে চাহিয়াছে। এ যে আশাতীত সুখ! একদিন এইরকম দুরাশা তার মনে সন্ধ্যা জাগাইয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু তার জন্মপরিচয় পাওয়ার পর ত সেসব সে চুকাইয়া বসিয়াছিল। এ আবার অকস্মাৎ কি অভাব্য সুখের মরীচিকা! বিদ্যুতের চারিদিকে আকাশ-পাতাল অসহ্য সুখের নেশায় মাতাল হইয়া টলিতে লাগিল। চাঁদের চুম্বনে রজনীগন্ধা ফুল যেমন সুখের স্বপনে সুরভিপ্রলাপে আকাশ বাতাস ভরিয়া তোলে, এই চিঠি তেমনি বিদ্যুতের মনের মধ্যে কত কি যে বচনাতীত আনন্দ ঘনাইয়া তুলিল। তার হৃদয় তখন ঊষার মতন স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে,—অরুণ-রঞ্জিত আলোক-সাগরে সমস্ত বিষাদ-তিমির অস্ত যাইতেছে, শত বিহঙ্গের সুমধুর কাকলি ও অযুত পুষ্পের প্রাণপুটের সঞ্চিত মধুগন্ধ দিগ্‌বধূর সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে। বিদ্যুতের মনে হইতেছিল তারই মর্ম্মের আনন্দ উচ্ছ্বাস অভিলাষ যেন বিশ্বহৃদয়ে বসিয়া মিলন-রাগিণীর মোহন সুরে বাঁশী বাজাইতেছে; তারই মুখের স্খলিতচরণা মদিরহিল্লোলময়ী হাসির স্পর্শে বাতাস অমন ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছে; তারই হাসির বিভায় প্রভাত আজ এমন উজ্জ্বল; তারই আনন্দময় হৃদয়

আজ মরমের সরমে বিব্রত হইয়া গোলাপ হইয়া ফুলিতেছে। পরিপূর্ণ আনন্দের বসন্ত-সমীরণে তার অন্তরে আজ ফুলের দেয়ালি ফুটিয়াছে। এই উন্মাদ আনন্দ সে যে তার হৃদয়ের কুসুম-কারায় আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। আজ যেন স্বর্গ অমৃতের নেশায় উন্মত্ত হইয়া তারই পায়ের কাছে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে!

উনত্রিংশ

আজ শিশির আসিবে। এই সুখের আঘাতে বিদ্যুতের বুকে ধক্‌ধক্ করিয়া শব্দ হইতেছিল; বুকের মাঝে রক্তের জোয়ার তার মুখ লাল করিয়া তুলিয়াছিল; তার দৃষ্টিতে লজ্জামাখানো সুখের হাসি জলজল্ করিতেছিল।

সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। আজ পূর্ণিমা। পূর্ণিমার চাঁদ একটা ঝাউ-গাছের ঝোপের আড়াল দিয়া গলানো সোনা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতেছিল। বিদ্যুতের বাংলার হাতায় নানান রঙের চন্দ্রমল্লিকা ফুল শোভায় অতুল হইয়া ফুটিয়া রঙের অঞ্জন চোখে বুলাইতেছিল, তার উপর আসিয়া পড়িল তরল সোনার জ্যোৎস্না-প্লাবন—এ যেন বিদ্যুতেরই অন্তরের প্রতিচ্ছবি। বাগানের এক

কোণ হইতে একটা নাগেশ্বর-চাঁপা ফুলের গন্ধে বাতাসকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল।

যত রাত হয় বিদ্যুতের উদ্বেগ তত বাড়ে, শিশিরের আসিবার সময় হয়ত এরই পরের মুহূর্ত্তও হইতে পারে। তার বাংলার সাম্‌নে দিয়া কোনো গাড়ী কি লোক চলিয়া যায় আর বিদ্যুৎ উচ্চকিত হইয়া উঠে—এই বোধ হয় শিশির আসিল। কোনো শব্দ হইলেই বিদ্যুৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখে এইবার বুঝি শিশির আসিল। রাত্রি আটটা বাজিল। জ্যোৎস্নার আলো বারান্দায় আসিয়া পড়িল। একটা পাপিয়া জ্যোৎস্নার আনন্দে মধুর স্বরে ডাকিতেছে। এখনো কই শিশির ত আসিল না। বিদ্যুৎ একখানা ক্যাম্বিশের ইজিচেয়ার বারান্দায় টানিয়া লইয়া গিয়া জ্যোৎস্নায় বসিয়া পড়িল। আনন্দ আর জ্যোৎস্নার প্রলেপ পাইয়া তার বিদ্যুৎবরণ রূপ অপরূপ দেখাইতে লাগিল। বিদ্যুৎ সুখের কল্পনায় চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল—শিশির আসিয়া কি বলিবে। সে যদি এই বলে তবে তার উত্তরে সে কি বলিবে। তার পরেই তার ভয় হইতে লাগিল, শিশির যদি না আসে। চিঠি লেখার পর যদি তার মন বদ্‌লাইয়া গিয়া থাকে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চম্‌কিয়া চাহিয়া দেখিল—শিশির হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া লজ্জিত স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিশির বারান্দায় উঠিয়াই দুই হাত বিদ্যুতের দিকে বাড়াইয়া দিল। সেই দুই হাতের আগ্রহের মধ্যে বিদ্যুতের হাত দুখানি বন্দী হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেও বিদ্যুৎ তাদের নিবারণ করিয়া রাখিল, বলিল—বসুন।

শিশির হাসিয়া বলিল—বসাটসা নয়, লজ্জা বাধা বিনয় মানব না—এত দূর আমি এসেছি আসল আদায় করবার জন্যে। আমি ক্রোক করবই।

বিদ্যুৎ মাথা নত করিয়া মৃদু কম্পিত স্বরে বলিল —আমার সংসর্গে আপনি নির্ম্মল হয়েও কলঙ্কিত হয়েছেন; অপবাদে দেশ ছেড়ে গেছে। আমাকে আপনি ত্যাগ করুন। আমার জন্ম কলঙ্কিত। আমি অপবিত্র।

শিশির দুই হাতে বিদ্যুতের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাকে নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল—তুমি পঙ্কজ, তুমি নির্ম্মল, তুমি সুপবিত্র! আমিও বিশ্ববঞ্চিত বহুলাঞ্ছিত, তুমিও সবার পরিত্যক্ত! তুমি আমার দুঃখ বুঝবে, আমি তোমার বেদনা বুঝব—অতএব আমাদেরই মিলন সুখের হবে।

"সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার।"

এস আর আপত্তি শুনব না। ঐ পথের বাঁকে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।

বিদ্যুৎ কত কি আপত্তি করিবে, কত যুক্তি দিয়া তর্ক করিয়া শিশিরকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, তার কিছুই বলা হইল না। বিদ্যুৎ পরম সুখে শ্রদ্ধা-প্রীতিতে দৃষ্টি ভরিয়া শিশিরের মুখের দিকে চাহিয়া শুধু বলিল—খাবার তৈরি করে রেখেছি খেয়ে নাও।

শিশির বিদ্যুতের মুখে প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া বলিল—খাবার মতন অমৃত এই যে ভগবান আমায় অমর করবার জন্যে সঞ্চিত করে রেখেছেন!

"দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর-শয়ন!"

বিদ্যুৎ পরিপূর্ণ সুখে শিশিরের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল—এত সুখ এত সৌভাগ্য সবার ঘৃণিত তার!

পূর্ণিমার চাঁদ ঝাউ-গাছের আড়াল হইতে নির্লজ্জের মতন উঁকি মারিয়া খুব হাসিতেছিল। আর পাপিয়া পাখীটা সেই হাসিতে খুসী হইয়া ক্রমাগত ডাকিয়া ডাকিয়া আকাশে আনন্দ-সুরের জাল বুনিতেছিল।

এমন সময় বাংলার গেটের বাহির হইতে ডাক শোনা গেল—শিশির আছ কি এখানে?

বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি শিশিরের বুক হইতে মুখ তুলিয়া

সরিয়া দাঁড়াইল। শিশির আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কালি-দাসের মতন গলা বোধ হল!

আবার ডাক আসিল—ওহে শিশির, মুখ কি অন্য কাজে ব্যস্ত যে সাড়া দিতে পারছ না?

শিশির হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল—কে, কালিদাস নাকি? তুমি এখানে কোথা থেকে? এস এস, ভেতরে এস।

কালিদাস শিশিরের সঙ্গে আসিতে আসিতে বলিল—তোমাদের ওপরে আমি শমন জারি করতে কাল থেকে এসে এখানে বসে আছি। চল তোমার বৌএর সঙ্গে আগে পরিচয় করিয়ে দেবে।

শিশির বারান্দায় উঠিয়া বলিল—'ইনিই কালিদাস' বললেই সব পরিচয় দেওয়া হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ, ইনিই আমার বন্ধু কালিদাস। আর ইনি আমার পত্নী ও সহধর্ম্মিণী বিদ্যুৎ।

বিদ্যুৎ লজ্জাভরা আনন্দিত মুখে দুই হাত জোড় করিয়া মাথাটি ঝুঁকাইয়া কালিদাসকে নমস্কার করিল, যেন একটি ফুল ভ্রমর-ভারে নত হইয়া পড়িল।

কালিদাস নিজের চাদরের তল হইতে ছোট বড় দুটি বাক্স বাহির করিয়া বিদ্যুতের দিকে আগাইয়া বলিল—আপনাদের বিয়ের কিছু তত্ত্ব নিয়ে আমি ছি।

বিদ্যুৎ নীরবে হাসিমুখে কালিদাসের হাত হইতে বাক্স তিনটি লইয়া ঘরের মধ্যে আলোর কাছে গিয়া দেখিতে বসিল কে তাকে কি পাঠাইল। শিশির কালিদাসকে ডাকিল—ঘরে এস। কালিদাসকে একটা চেয়ারে বসাইয়া শিশির উৎসুক হইয়া বাক্সগুলির মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য বিদ্যুতের কাঁধের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। তারা দেখিয়া আনন্দিত হইল একটি চন্দনকাঠের বাক্সের উপর প্রেরকের নাম লেখা আছে সুনয়নী দেবী; আর-একটি বড় চামড়ার সুটকেসের উপর লেখা আছে সন্ধ্যা দেবী; একটি ছোট মকমলের বাক্সের উপর লেখা আছে কালিদাস ঘোষ। বিদ্যুৎ আনন্দিত হাসিমুখে বাক্সের বাঁধনগুলি খুলিতে লাগিল। শিশির হাসিয়া বলিল—তুমি ত আমায় বিয়ে করবে না বলছিলে। এসব খুলছ কেন, ফিরিয়ে দাও।

বিদ্যুৎ সুখের লজ্জায় পরিপূর্ণ হইয়া বাক্সগুলি একে-একে খুলিতে লাগিল।

সুনয়নী পাঠাইয়াছেন একটি ঢাকাই-কাজকরা রুপো সিঁদুরচুবড়ীর মধ্যে একটি সোনার সিঁদুরকৌটা, একগা[illegible]য়া সোনা-বাঁধানো লোহা, কিছু আলতা, আর তার স[illegible] সংক্ষিপ্ত আশীর্ব্বাদ-লিপি—

কল্যাণী,

এই স্বামীসৌভাগ্যের চিহ্ন তোমার সৌন্দর্য্যকে সুন্দরতর[illegible]য়া

তোমার চরিত্রকে মধুরতর করুক। এই আনন্দ
মাদের অক্ষয় হোক।

তোমাদের নিরন্তর শুভাকাঙ্ক্ষিণী মা
শ্রীসুনয়নী দেবী।

সন্ধ্যা পাঠাইয়াছে লাল টক্‌টকে জমির উপর জরির
তাফুল-কাটা বেনারসী শাড়ী ও তারই সঙ্গে
লকরা ব্লাউজ, দুগাছি হীরের ব্রেস্‌লেট, একগাছি
ক্তার নেক্‌লেট, দুটি হীরের ইয়ার-রিং, আর দুটি মিনা-
রা পাথর-বসানো ব্রুচ। আর তার সঙ্গে এই চিঠি—
ভাই বিদ্যুৎ,

তোদের কাছে মুখ দেখাতেও আমার লজ্জা করে,
লে তোকে আমি নিজের হাতে বৌ সাজাতাম। তোরা
ভরে যে রত্ন লাভ করলি, তারই আনন্দে আমাদের
কল অপরাধ তোরা ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে পার্‌বি এই
আশ্বাসেই আমার প্রাণের গভীর প্রীতির এই সামান্য
উপহার পাঠাতে সাহস করলাম। ঠাকুরপোকে বলিস্‌,
উনি যেন আমার প্রতিনিধি হয়ে তোকে এইগুলি দিয়ে
সাজিয়ে দ্যান।

তোদের আনন্দে আনন্দিতা
সন্ধ্যা।

কালিদাসের বাক্সর মধ্যে আছে একসেট শিশিরেরই
গ্রন্থাবলী ভালো করিয়া মরক্কো চামড়া ও ভেলভেট দিয়া

...আর তার উপর সোনার জলে বিদ্যুতের ... হইতে ...লেখা।

শিশির আনন্দে হাসিয়া বলিল—মা বৌদিদি আর ...দাসের শুভকামনা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। এই সৌভাগ্যই আমাদের সংসারযাত্রায় পরম পাথেয়!

... উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিশির ও কালিদাসের দিকে ...—তখন ফুলদলে শিশিরবিন্দুর মতন তার চোখের ...অতি আনন্দের লজ্জাভরা হাসি টলটল করিতেছে।

তখন বাহিরে জ্যোৎস্নাস্নাত স্বচ্ছ নীলাম্বর বিধাতার ...বাদে ভরা প্রসারিত পাণিতলের মতন শুধু আনন্দ ও ...র্য্য বিতরণ করিতেছিল।